তিন দিন তিন রাত্রি

তিন দিন তিন রাত্রি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

সন্তোষকুমার ঘোষ

বন্ধুবরেষু

তিন দিন
তিন রাত্রি

এক

মন্থরগতি গাড়িটি প্লাটফর্মে ঢুকে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর এই কামরাখানির যাত্রীরা তার অনেক আগেই অস্থির হয়ে উঠেছেন। গাড়ি যেন হাওড়া স্টেশন ছেড়ে পূব মুখে গঙ্গা পাড়ি দেবে। এই যেন তার শেষ গন্তব্য নয়, আরো আছে। গাড়ির না হোক যাত্রীদের তো আছেই। ব্যস্ত হবার কিছু নেই তা জেনেও অসীম সহযাত্রী পান্থদের মত চঞ্চল হয়ে উঠল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, 'কুলী. কুলী।' সব যাত্রীর মুখে একই রব। কুলী নিয়েও কাড়াকাড়ি। প্রথমে তার দিকে কেউ এল না। অসীম তো নিজের মুখ নিজে দেখতে পায় না। পেলে বুঝতে পারত কেমন অকূলে পড়া ভাব হয়েছে মুখের। কুলী মিলে যাওয়ার পরে বুঝল। এই মুহূর্তের মনের স্থির দর্পণে আগের মুহূর্তের অস্থির মুখের ছায়া দেখে অসীম নিজেই হাসল।

সঙ্গে মালপত্র বেশি আনেনি অসীম। ছোট একটি স্যুটকেশ আর মাঝারি ধরনের হোলড্অলটি। এর জন্যে অত ব্যস্ত হবার দরকার ছিল না। কিন্তু দু'তিনটি কুলী এবার তার ভার বহনের জন্যে মাথা এগিয়ে দিয়েছে। অসীম যেন বেঁচে গেল এবং একটির হাতে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যে কোন রকমের কায়িক পরিশ্রমে অসীম কাতর, অপটু এবং সেইজন্যেই তাতে তার বীতস্পৃহতার সীমা নেই। কিন্তু আশ্চর্য, এমন জায়গায় এমন চাকরিই জুটেছে, যেখানে হাত পা না ছুঁড়লে, জোর গলায় ধমক-টমক ছাড়তে না পারলে টিঁকে থাকাই মুশকিল। যেখানে কায় আর বাক্যটাই সব, মনটা কিছু নয়।

গেটের দিকে খানিকটা এগোবার পর অসীম দেখল লোকটি নেই।

কুলীটা আবার কোথায় গেল। সে কি পিছনে রয়েছে না আগে আগে চলেছে। যত যুক্তিহীন দুশ্চিন্তা। কিন্তু পরক্ষণেই কুলিকে সামনে দেখতে পেয়ে অসীম নিজের মনে হাসল। তার নার্ভাসনেস আর গেল না। সব সময় কেবল হারাই-হারাই ভাব। হারাবার আছে কী। কী এমন সম্পদের মালিক সে যে চোর-ডাকাতে লুটে নেবে। কিন্তু মানুষের মন তা বোঝে না। সে প্রাণপণে নিজের পুরোন স্যুটকেশ আর হোলড্অল পাহারা দেয়।

পিছনের ভিড় ঠেলছে, কিন্তু সামনের ভিড় পথ ছেড়ে দিচ্ছে না। তবু আস্তে আস্তে মহাজনের বদলে জনগণের পায়ে পায়ে অসীম শেষ

পর্যন্ত গেটের কাছে এসে পেঁাছল। টিকেটটা চেকারকে দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হল, খুশীও হল।

'তুমি! তুমি এতদূর আসবে ভাবতেই পারিনি।'

মানসী বলল, 'কেন, না পারার কি হয়েছে। আমি কি হাওড়া স্টেশন চিনি না?'

অসীম একথার কোন জবাব না দিয়ে এগোতে যাবে, হঠাৎ মনে হল, কে যেন তার পায়ে লেজ বুলোচ্ছে। অস্বস্তির একশেষ। লাফ দিয়ে দু' পা পিছিয়ে গেল অসীম। কী ব্যাপার!

তাকে ভয় পেতে দেখে সতের-আঠার বছরের একটি ছেলে মাথা তুলে তার সামনে দাঁড়াল।

'অসীমদা আমি।'

এবার চিনতে পেরেছে অসীম। মানসীর ভাই নন্দু। এতক্ষণ ওর দিদির দিকেই চোখ ছিল তাই ভালো করে দেখতে পায়নি।

'তুমি! এত লোকের মধ্যে অমন করে কেউ প্রণাম করে! বিশেষ করে তোমরা যারা আজকালকার ছেলে।'

মানসী হেসে বলল, 'আর বোলো না। নন্দু এবার আই. এস্‌সি. দিয়েছে তো। ভয়ঙ্কর আস্তিক হয়ে গেছে। পুণ্যের ফলে যদি পরীক্ষার ফলটা ভালো হয়। দেব-দ্বিজ যাকে দেখে তাকেই টিপ টিপ করে প্রণাম করে।'

অসীম বলল, 'কিন্তু মানসী, আমি তো দেবও নই, দ্বিজও নই। একেবারে শূদ্র। সবদিক থেকেই।'

মানসী বলল, 'হয়েছে, হয়েছে। বিনয়ের অবতার, চল এবার। নন্দু তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধর। এরপর আর পাবিনে।'

দিদির আদেশে দু' লাফে নন্দু অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাইরে এসে কুলীকে বিদায় করল অসীম। তারপর মানসীর দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'হাওড়া স্টেশন যদি চেনই ওকে সঙ্গে আনলে কেন। একা আসতে বুঝি ভরসা পেলে না।'

মানসী তার সরু ভ্রূ দু'টি কুঁচকে কোপের ভঙ্গি করে বলল, 'ভারি ইয়ে তো তুমি। অত বড় একটা প্রণাম করেও নন্দু তোমার মন গলাতে পারল না। কেন এনেছি, ওই দেখ।'

সামনের দিকে আঙুল বাড়াল মানসী।

ট্যাক্সির জন্যে তখন ছুটোছুটি, প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যে ক'খানি রথ আছে রথীরা তার পাঁচ গুণ। তাই বাক্‌যুদ্ধ, জনদুয়েকের মধ্যে বাহুযুদ্ধও শুরু হয়ে গেল।

'মশাই, ও ট্যাক্সি আমি ডেকেছি, আপনি কেন উঠে বসলেন।'

'রেখে দিন মশাই, আমি ডেকেছি। ট্যাক্সির গায়ে আপনার নাম লেখা আছে নাকি।'

'নির্লজ্জ বেহায়া।'

'মুখ সামলে কথা বলবেন।'

শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় পুলিস এগিয়ে এল।

মানসী অসীমকে বলল, 'পারতে তুমি ওইভাবে ট্যাক্সি জোগাড় করতে?'

অসীম মানসীর দিকে তাকাল, 'পুরুষের যোগ্য অনেক গুণই যে আমার নেই তা মিনিটে মিনিটে মনে করিয়ে দিচ্ছ কেন। ট্যাক্সিতে কাজ নেই, আমি বাসেই চলে যেতে পারব।'

মানসী হেসে বলল, 'অমনিই রাগ হয়ে গেল। তুমি দেখছি নন্দুর চেয়েও—। না, হার মানলাম। তুমি শুধু পুরুষ নও, মহাপুরুষ। হল তো?'

একটু পরে ফের ঠোঁট টিপে বলল, 'দেখছ বাস-ট্রামগুলির অবস্থা! এই অফিস টাইমে তুমি তাতেও উঠতে পারতে না।'

অসীম মরীয়া হয়ে বলল, 'পায়ে হেঁটে যেতে তো পারতাম। পা দু'খানি তো আছে।'

মানসী বলল, 'তাই-বা কি করে বলি। দু'টি পা শুধু নন্দুদের মত অবোধ ছেলেদের প্রণাম কুড়োবার জন্যে। আর সব ব্যাপারে অচল।'

তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'সেবাদাসীরা পায়ে তেল না মাখলে পুরুষের পা কি চলে?'

এতক্ষণে নন্দু এসে হাজির হয়েছে। হেঁটে নয়, ট্যাক্সিতে উঠে। গাড়ির ভিতর থেকেই বলল, 'সেজদি, নামতে ভরসা পাচ্ছি না। কেউ একজন উড়ে এসে জুড়ে বসলেই হল। তোমরা শিগ্‌গির চলে এসো।'

অসীম এবার সত্যিই তৃপ্তি বোধ করল। শুধু বান্ধবীই যথেষ্ট নয়, তার জোয়ান আর অনুগত অমন দু'একটি ভাইও থাকা দরকার।

স্যুটকেশ আর হোলড্‌অলটা তুলে নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

নন্দুর বুদ্ধি আছে। সে গোড়া থেকেই ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসেছে। পিছনের সীটে মানসী অসীম পাশাপাশিই বসল, কিন্তু একেবারে কাছাকাছি নয়। নন্দু যদি পিছন ফিরে তাকায়। কিন্তু সেই আশঙ্কায় ব্যবধানের মাত্রাটা মানসী অতখানি না বাড়িয়ে দিলেও পারত।

'সর্দারজী, বেলগাছিয়া যানা হোগা।'

মানসীর গলা শুনে অসীম তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'না না না, বেলগাছিয়া নয়, আমি ভবানীপুরে যাব। পরেশের ওখানে উঠব—আমি আগেই সব ব্যবস্থা করে এসেছি।'

মানসী হেসে বলল, 'তুমি কি করে ভাবলে তোমাকে ভবানীপুরে নিয়ে

যাবার জন্যে আমরা তাড়াতাড়ি স্টেশনে এসেছি, ট্যাক্সি ভাড়া করেছি।'

নন্দু মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তাই হয় নাকি অসীমদা? আপনি আগে আমাদের ওখানে উঠবেন, তারপরে যেখানে হয় যাবেন। আমরা কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।'

অসীম আর প্রতিবাদের মধ্যে গেল না। জোর করে কোন কিছু প্রতিরোধ করবার উৎসাহ তার নেই। ইচ্ছারও অভাব আছে। সে বরং নিজের অনিচ্ছায় চলে, কিন্তু অন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিতান্ত বাধ্য না হলে সংগ্রাম করে না।

তবু মানসীর সাহস দেখে অসীম অবাক হল। তার বাবা আছেন, মা আছেন, অনেকগুলি ভাইবোন আছে। বাড়িভরা এত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে মানসী তাকে নিয়ে তুলতে চায় কোন সাহসে? তার বাবা যেমন বোকা নন, তেমনি মেলামেশার ব্যাপারে খুব উদারও নন, একথা অসীম জানে।

একটু বাদে অসীম বলল, 'কিন্তু তোমাদের ওখানে গেলে অসুবিধে তো হবে।'

মানসী বলল, 'তা তো হবেই। আমাদের বাড়িঘর নেই, ভাড়াটে বাসায় জায়গা খুব কম, তোমার থাকতে কষ্ট হবে। পরেশবাবুর মত আমরা বড়লোক নই, তোমাকে হাতি ঘোড়া রেঁধে খাওয়াতে পারব না; তোমার খেতেও কষ্ট হবে। কিন্তু একটা দিন একটু কষ্ট না হয় করলেই।'

অসীম এবার অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'আসল কথাটা তুমি বুঝেও বুঝতে চাইছ না। আমি তোমাদের ওখানে থাকলে তোমার বাবা মা কিছু মনে করবেন না?'

মানসী হেসে বলল, 'চোরের মন বোঁচকার দিকে। মনে করবার আবার কি আছে? আমাদের বাড়িতে আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব কেউ কি কখনো এসে থাকে না? তুমি কি নতুন যাচ্ছ? তাছাড়া, তুমি আমার বন্ধু অনেক পরে, তার ঢের আগে আমার দাদার বন্ধু।'

অসীম বলল, 'কিন্তু সেই দাদার সঙ্গে তো তোমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।'

মানসীর মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ল। তারপর সেই ছায়াকে আরও উজ্জ্বল হাসির আভায় ঢেকে দিয়ে বলল, 'তা নাই-বা থাকল। মা মরলে বাপ হয় তালুই আর বিয়ে করলে দাদা বেয়াই হয়ে যায়। কিন্তু এখন তো শুধু দাদার সম্পর্কেই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক নয়। বাড়ির সকলের সঙ্গেই তোমার সম্পর্ক, তুমি পরিবারের বন্ধু।'

পরিবারের বন্ধু। তবু বিশেষ একজনের সঙ্গে একটু বিশেষ ধরনের সম্পর্কে বন্ধুত্বে আরো মাধুর্যের স্পর্শ লেগেছে। পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে

যেমন বিপুলা পৃথিবী আরো ঘন হয়ে ধরা দেয় তেমনি। কিন্তু তেমনভাবে মানসী কি ধরা দিয়েছে? কাছে এসেছে? তা যদি না এসে থাকে তাহলে অসীমকে একদিনের জন্যে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার এত আগ্রহ কেন? তাতে কী লাভ হবে?

মানসী তাকে চিন্তিত দেখে বলল, 'তুমি ভেব না। আমি যখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি কারো সাধ্য নেই তোমাকে কিছু বলে।'

অসীম ভাবল, বলবার আর কী আছে। একজন আর একজনের সম্বন্ধে যা ভাবে তার কতটুকুই-বা মুখ ফুটে বলতে পারে। যদি পারত তাহলে প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীটা ফেটে ফেটে চৌচির হত। কিন্তু মানসী কি নিজের সাহস আর শৌর্য দেখাবার জন্যেই অসীমকে এমন করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে? পরিবারে মানসীর উপার্জন সবচেয়ে বেশি, প্রভুত্বও বেশি, তাই সে যদি তার কোন পুরুষ বন্ধুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আপ্যায়ন করে কারো কিছু বলবার জো নেই, নিজের সেই প্রতিপত্তির প্রমাণই কি দিতে চায় মানসী? কার কাছে? অসীমের কাছে না নিজের পরিবারের কাছে?

কিন্তু আশ্চর্য, মানসী বলল, 'তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই। বাবা-মার মত নিয়েই আমি তোমাকে এগিয়ে নিতে এসেছি। তুমি গেলে ওঁরা খুব খুশী হবেন। জানো, দাদার দুর্ব্যবহারে ওঁরা ভারি দুঃখ পেয়েছেন। তবু দাদার পুরোন বন্ধুদের মধ্যে যদি কেউ কখনো খোঁজখবর নিতে আসেন বাবা খুব খুশী হন।'

এতক্ষণের কূটচিন্তার জন্যে অসীম ভারি লজ্জিত হল। ছি ছি ছি, সারাটা পথ কী সব সে ভাবতে ভাবতে আসছে। সে যে একটি পরিচিত পরিবারে যাচ্ছে, যে পরিবারের ছেলে তার কলেজের সহপাঠী ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্তত এক সময় ছিল, সেকথা সে ভুলে গেল কি করে। হঠাৎ একটি অন্ধকার ঘরের চারদিকের দরজা জানলা যেন খুলে গেছে। রোদে ভরে গেছে ঘর, সারা শহর, সমগ্র পৃথিবী। আর সেই পৃথিবীর এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে তাদের ট্যাক্সি ছুটে চলেছে।

নন্দু মুখ বাড়িয়ে বলল, 'দেখেছেন অসীমদা, আমাদের এই নর্থ ক্যালকাটাও সাউথের সমান হতে চলেছে। চেহারা একেবারে পাল্‌টে গেছে। এরপর বালীগঞ্জ আর বাগবাজারে কোন তফাৎ থাকবে না। সব এক হয়ে যাবে।'

উত্তর কলকাতার সেই ভবিষ্যৎ ঔজ্জ্বল্যে নন্দুর মুখ এখনই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে অসীম হাসল। মানসীর ভাইরাই দেখতে ভালো, বোনেরা নয়। মানসীও ওই দলে। তবু অসীমের কাছে তার

চেহারার খুঁতটা বড় নয়। সেকথা মনেও পড়ে না, চোখেও পড়ে না। আর কালো রঙও কামনায় রাঙা হয়।

ব্রীজ পেরিয়ে আরো খানিকটা এগোলে তিনতলা ফ্লাট বাড়ি। বড় রাস্তার উপরেই। ট্রাম বাস দুই-ই চলছে, জনাকীর্ণ আর যানাকীর্ণ রাজপথ। এমন হাটের মধ্যেও মানুষ থাকে। মফঃস্বল থেকে এসে গোটা কলকাতা শহরটাকেই বড়বাজার বলে মনে হয়।

ট্যাক্সি থামল, কিন্তু নন্দুর কলরব থামতে চায় না। 'ও মেজদি, মীরাদি, দেখ এসে, অসীমদাকে নিয়ে এসেছি। কিছুতেই আসবেন না, আমরা জোর করে ধরে এনেছি।'

ঘরের বাসিন্দারা একে একে—বলা যায় একসঙ্গে দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। একতলার ফ্লাট। ঘর আর বাইরের ব্যবধান সামান্যই।

মানসীর বাবা মনোমোহন মুখুয্যেই আগে এসে অভ্যর্থনা করলেন, 'এসো, অসীম এসো।'

অসীম নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'ভালো আছেন মেসো-মশাই ?'

মনোমোহন বললেন, 'আর বাবা আমাদের আবার ভালো আর মন্দ। টিঁকে আছি এই পর্যন্ত।'

অসীম লক্ষ্য করল সত্যিই ভদ্রলোক একটু রোগা হয়ে গেছেন। দু'টি গাল তোবড়ানো। দাঁতগুলির বেশির ভাগই নেই। বাঁধিয়েও নেননি। মাথার আধখানা জুড়ে টাক। নাকের নিচে পুরু গোঁফে তা বোধহয় পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সে গোঁফের খানিকটা সাদা, খানিকটা কটা, খানিকটা কালো। একেবারে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। বেঁটে খাটো চেহারায় অত বড় গোঁফ মানায় না। আজকাল বেশি বয়সীদের মধ্যেও গোঁফ দাড়ি রাখার চল উঠে গেছে। পুলিস অফিসাররা পর্যন্ত গোঁফ পোষেন না। কিন্তু এই নিরীহ গৃহস্থ ভদ্রলোক কেন এতবড় গোঁফ রেখেছেন কে জানে। পৌরুষের প্রকৃষ্ট প্রতীক বলে? অসীম নিজের মনে হাসল।

তাঁর পিছনে মাসীমারও দেখা মিলল। রোগা, ছিপছিপে, কিন্তু মেসো-মশাইর চেয়ে মাথায় লম্বা। অসীম শুনেছে, এজন্যে মাসীমার নিজেরই লজ্জার সীমা নেই। যখন বিয়ে হয়, মাথায় ছোটই ছিলেন, তারপর দেখতে দেখতে অসম্ভব রকম বেড়ে গেছেন। বছর-বছর মা হয়েছেন আর লম্বা হয়েছেন। আগে এর জন্যে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই লজ্জা ছিল, এখন চোখে সয়ে গেছে।

সুহাসিনী আধময়লা আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে দিতে একটু হেসে বললেন, 'এসো বাবা, এর আগে তুমি বোধহয় আমাদের এ বাসায় আর আসোনি।'

অসীম বলল, 'না মাসীমা। আমি সেই নেবুতলার বাসায়—'

সুহাসিনী বললেন, 'সে বাসা অনেক ভালো ছিল। এখানে জায়গা কম কিন্তু ভাড়া বেশি।'

অসীমকে আর একবার মাথা নিচু করতে হল। বিনিময়ে প্রণাম কম জুটল না। মানসীর ফ্রকপরা বোনেরা একের পর এক পায়ের কাছে এসে ধনুমুদ্রা ধারণ করল। প্রত্যেকের পিঠে লম্বমান বেণী। দেখতে যেমনই হোক চুল আছে সকলের মাথায়। মানসীরও। অসীম যে তাকে মাঝে মাঝে বলে অরণ্যকুন্তলা, মিথ্যে বলে না।

একজন শুধু খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মানসীর দিদি মাধুরী। বয়সে সে অসীমের ছোট, কিন্তু গুরুত্বে গাম্ভীর্যে যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। তার ছাব্বিশ-সাতাশ বছর হবে বয়স। বি-এ, বি-টি পাশ করে স্কুলে কাজ করছে, এখনো হেডমিস্ট্রেস হতে পারেনি, এমন কি সহকারিণীও নয়। কিন্তু চালচলনে ভারি রাশভারি। গায়ের রঙ মানসীর তুলনায় ফর্সা। মুখের গড়ন সুশ্রী না হলেও মিষ্টি। রূপ না থাকলেও লাবণ্য আছে। কিন্তু তা যেন বিষাদে ঢাকা। দেখলে মায়া হয়।

অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ?'

'ভালো। কিন্তু তোমাকে তো খুব ভালো দেখাচ্ছে না, অসীমদা।' মাধুরী একটু হাসল, 'শুনেছি নাকি দারোগা হয়েছ। কিন্তু এই কি দারোগার মত চেহারা?'

অসীম হেসে বলল, 'চেহারাটা অবশ্য জমাদারেরও যোগ্য নয়। উপায় কি বল।'

মাধুরী বলল, 'বিনয় করা হচ্ছে বুঝি?'

সুহাসিনী এগিয়ে এসে বললেন, 'অসীম আমার রাজপুত্তুর। সেদিক থেকে বরং তোদেরই—।'

মানসী বলল, 'কোন রূপ নেই। তাই না মা?'

সুহাসিনী বললেন, 'নেই-ই তো।'

ছোট একটি নিঃশ্বাস চাপলেন সুহাসিনী। একবার তাকালেন স্বামীর দিকে। মেয়েদের রূপের দীনতার জন্য মায়ের চেয়ে বাপ-ই বেশি দায়ী। চোখের দৃষ্টিতে সেই কথাই যেন বলে নিলেন।

প্রচ্ছন্ন খোঁচাটা মনোমোহনের সহ্য হল না। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'কে বলে নেই? কে বলে রূপ নেই ওদের? তোমরা রূপের কেবল একই ডেফিনেশন জানো। দুধে আলতার রঙ, পটল-চেরা চোখ, বাঁশির মত নাক। ওসব ছাড়া বুঝি রূপ হয় না?'

এই নিয়ে অসীমের সামনেই পাছে দাম্পত্য কলহ শুরু হয়ে যায় তাই

মানসী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'হয় বাবা হয়। তোমার মেয়েরা সবাই রূপবতী। এবার এসো, অসীমদা কোন ঘরে থাকবেন সেইসব ব্যবস্থা করো এসে।'

সেজদির কথার ভঙ্গি শুনে মায়া, মঞ্জু মুখে আঁচল দিল।

হঠাৎ নন্দু পাশের ঘরখানা থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না, আমি সব ঠিক করে দিয়েছি। সেজদি, অসীমদার জিনিসপত্র সব তোমার ঘরে তুলে দিলাম।'

একমুহূর্তে সবাই কেন যেন চুপ করে গেল। যে মাধুরী প্রায় হাসতে জানেই না, তার ঠোঁট দুটিও কি একটু চিক চিক করে উঠল? এই নীরবতা সবচেয়ে অসহ্য হল মানসীর নিজের। সে ছোট ভাইকে ধমকে উঠল, 'তোমার ঘরে তুলে দিয়েছি! ঘরে কি আমি একা থাকি, দেয়ালে আমার নেম-প্লেট লাগানো আছে যে, আমার ঘর বলছিস? ও ঘরে তো আমরা বোনেরা সবাই শুই, মাঝে মাঝে তুইও আসিস। ঘরখানা কি করে শুধু আমার হল?'

নন্দুর পক্ষ নিয়ে মাধুরী এগিয়ে এল, শান্ত ধীর গলায় বলল, 'যদি বলেই থাকে তাতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। বেচারাকে কেন মিছামিছি ধমকাচ্ছিস। ছুটোছুটি টানাটানি তো সারাদিন ওই করে।—নন্দু, জামাটা খুলে ফেল এবার। ঘামে তো একেবারে নেয়ে উঠেছিস।'

ধমক খেয়ে নন্দু যেমন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, আদর পেয়ে তেমনি খুব খুশী হয়ে উঠল। হেসে বলল, 'অসীমদা, অনেকগুলি দিদি থাকলে এই এক সুবিধে। এক দিদি ধমকায় তো আর এক দিদি আদর করে, এক দিদি কান মলে তো আর এক দিদি পিঠে হাত বোলায়। কাউকে না কাউকে সব সময় দলে পাই।'

মনোমোহন মন্তব্য করলেন। 'ছেলেটা বড় পেকে গেছে অসীম। চল ঘরের মধ্যে চল। ঘরে পাখা আছে।'

উত্তরে দক্ষিণে মুখোমুখি দু'খানা ঘর। মাঝখানে প্যাসেজ। তাকে বারান্দা হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। সদর দরজা বন্ধ করলে রাত্রে সেই বারান্দাই আবার একখানা শোয়ার ঘর হয়ে ওঠে। এছাড়া, বাথরুম আছে, কিচেন আছে। গোঁফের নিচে দুটো ঠোঁট কুঁচকে মনোমোহন বললেন, 'ভাড়াটা একটু বেশি। পুরো একশ। কিন্তু এর কমে কোথায়-বা কী পাচ্ছি। মাথা গুঁজতে তো হবে। এক অর্থবলই নেই, কিন্তু ষষ্ঠীর আশীর্বাদে জনবল বেশ আছে। সাত মেয়ে, দুই ছেলে। মায়ের পীড়াপীড়িতে বড়টির মানে মমতার বিয়ে দিয়েছিলাম। ভাগ্যিস দিয়েছিলাম, নইলে বাকি ক'জনের মত সেও আজ সাদা সিঁথি নিয়েই থাকত। তারপর আর ও কম্ম হয়নি। বড়ছেলে নিজেই দেখেশুনে পছন্দ করে বিয়ে করল। আগে থেকেই জানা-

শোনা হয়েছিল। তোমরা যাকে লভ ম্যারেজ বল, ঠিক তাই। তার ফল একেবারে হাতে হাতে। বছর ঘুরতে না ঘুরতে বউ নিয়ে ছেলে পগার পার। তার আর টিকিটিও দেখতে পাইনে।'

অসীমকে নিজের খাটে বসিয়ে পারিবারিক বৃত্তান্ত বলছিলেন মনোমোহন, কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারলেন না—সুহাসিনী এসে বাধা দিলেন। হাসিমুখে নয়, রাগ করে বেশ কড়া এক ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? যা যা বলছ অসীম তার কোন্ কথাটা না জানে? ও কি আমাদের সংসারে এই নতুন এল? বুড়ো হলে যা হয় তাই হয়েছে তোমার। তোতাপাখির মত এক কথা বার বার বলবে, আর মানুষের কান ঝালাপালা করবে।'

তারপর অসীমের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'অমন ভালোমানুষ হয়ে থাকলে চলবে না বাবা, উনি তোমাকে আস্ত একখানা মহাভারত শুনিয়ে ছাড়বেন। সেই সঙ্গে গীতা চণ্ডী আর উপনিষদের শ্লোক। নাও ওঠ, জামা-টামা খুলে চানটা সেরে নাও। ঈস্, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। তুমি নেয়ে এসো, আমার রান্না তৈরি।—মায়া, অসীমকে তেল গামছা-টামছা এনে দে।' বলতে বলতে সুহাসিনী নিজেই ওসব আনতে গেলেন। মেয়েদের ফরমায়েস করলেও খাটেন নিজে। ওদের কারো ওপর তাঁর তেমন ভরসা নেই।

অসীম বলল, 'সত্যি, এসে বোধহয় আপনাদের খুব বিব্রত করলাম।'

মনোমোহন বললেন, 'মোটেই না, মোটেই না। তুমি সেজন্যে ভেব না অসীম। আমাদের জায়গা-টায়গা কম, তোমার থাকতে কষ্ট হবে। কিন্তু একেকখানা ঘরে একেকজন মানুষ হাত পা ছড়িয়ে থাকবে তাই যদি তোমাদের সুখের ডেফিনেশন হয় আমার তাতে সায় নেই। সুখ আসলে খাওয়ার মধ্যে নেই, শোয়ার মধ্যে নেই, সুখ কোথায় জানো? নিজের মনে। মনের সন্তোষে। কিন্তু সন্তোষ অমৃত অতি ঊর্ধ্বে অবস্থিত, লভিতে না পারে কভু উদ্বাহু বামন। ছেলেবেলায় মুখস্থ করেছিলাম। আমিও বামন, বেঁটে। আমি জানি, যতই লাফালাফি করি, বুড়ো আঙুলের ওপর ভর করে যতই প্রাণপণ হাত বাড়াই, সুখের নাগাল আমি পাব না।' তারপর আবার একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন, 'কিন্তু কবি ভুল বলেছেন, সন্তোষরূপ অমৃত ফল উঁচু ডালে ঝুলছে না, তা হৃদয়ের গভীরে ঠিক জায়গাটিতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সেখান থেকে কুড়িয়ে নিতে পারলেই হল। আমার মেয়েরা গজ গজ করে দুখানা ঘরে এতগুলি লোক। আমি বলি, আরে তোদের তো তবু দুখানা ঘর জুটছে। একখানা ঘরও নেই এমন লোক এদেশে হাজার হাজার। যখন নিজের দুঃখে বুক ফেটে যাবে তখন আর একজনের দুঃখের দিকে

তাকিয়ো। যদিও তা খুব কঠিন। দুঃখী মানুষই সবচেয়ে স্বার্থপর হয়। কিন্তু যদি একবার সেই স্বার্থকে ভোলা যায় তাহলে বড় আনন্দ।'

মাধুরী এসে অসীমকে উদ্ধার করল, 'চল এবার বাথরুম খালি হয়েছে।'

কিন্তু মানসী কোথায়! অসীম নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করল। ভাইকে ধমক দিয়ে সেই যে গা ঢাকা দিয়েছে আর তার দেখা নেই। অথচ এই মানসীই সেদিন চিঠিতে লিখেছিল, 'মাঝে মাঝে বড় ইচ্ছা হয়, অন্তত একটি দিন একই বাড়িতে একই ছাদের নিচে আমরা থাকি। তোমার জন্যে নিজের হাতে রাঁধি, কাছে বসে খাওয়াই, নিজের হাতে যত্ন করি।'

এই কি তার সবকিছু নিজের হাতে করবার নমুনা? অসীম নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করল। তারপর মাধুরীর আর একবার তাগিদে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বাথরুম খুবই ছোট। চৌবাচ্চা দেখলেও মনে হয় না যে, জনদশেক লোকের নাইবার মত জল ওতে ধরে। কিন্তু এ অঞ্চলে নাকি জলের অভাব নেই। চৌবাচ্চা খালি হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভরে ওঠে। কিংবা খালি হবার অবকাশ পায় না। না পেলেই ভাল। মেদিনীপুরের পাণ্ডববর্জিত যে জায়গাটায় অসীম এবার বদলী হয়েছে, সে অঞ্চল নদীনালা থেকেও বঞ্চিত। জলের ভারি কষ্ট। সারা গাঁয়ে একটিমাত্র পুকুর। যে জলটুকু থাকে তা নিয়ে মেয়েপুরুষ গরু-মোষের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি লেগে যায়। পাথুরে জায়গা বলে টিউবওয়েল বসাবার জো নেই, কেউ কোনদিন বসাবার চেষ্টা করেছিল কিনা অসীম জানে না। কিন্তু এক ঘটি জলের জন্যে মানুষের সেই মরণ-পণ মল্লযুদ্ধ সে প্রায় রোজ প্রত্যক্ষ করে। জলের আর এক নাম যে জীবন তা এইসব অঞ্চলে না এলে বোঝা যায় না। রসের তৃষ্ণা জ্ঞানের তৃষ্ণা প্রেমের তৃষ্ণা কোন তৃষ্ণার সঙ্গেই যে এক ফোঁটা জলের তৃষ্ণার নিদারুণ তীব্রতার তুলনা হয় না, তা অসীম ওখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখেছে। দেখেছে আর মনে মনে ভেবেছে, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙলাদেশে এমন মরুভূমিও আছে। অবশ্য চেয়ে দেখা ছাড়া সে কিছুই করতে পারে না। সরকার তাকে জলকষ্টের দিকে চোখ রাখতে তো আর পাঠাননি, পাঠিয়েছেন যাতে ধান-চাল নিয়ে চোরাকারবার না হয় সেদিকে তীক্ষ্মদৃষ্টি রাখতে, পাঠিয়েছেন কালোবাজারে টর্চের আলো ফেলতে। সে যথাসাধ্য তাই করে, দুর্নীতি দমন করে।

তার জন্যে প্রায় আধ-চৌবাচ্চা জলই ধরা আছে দেখে খুশী হল

অসীম। তাছাড়া আরো এক বালতি জল কে যেন রেখে দিয়েছে। মানসী কি? না মানসী নিজের হাতে কিছু করতে চায় না। নিজের হাতে শুধু চিঠি লিখে মনের ইচ্ছাটা জানায়। কিন্তু তার যা করবার কথা তা করে তার ভাই-বোনেরা। মানসী বোধহয় যতটুকু দিয়েছে তার চেয়ে বেশি ধরা দিতে চায় না। তা যদি নাই চায় এখানে তাকে ডাকতে বলেছিল কে! সে যদি লুকিয়েই থাকবে তাহলে স্টেশনে গিয়ে কেন অত বাহাদুরী করেছিল।

যেমন ছোট চৌবাচ্চা তেমনি ছোট মগ। এতে ওদের গা ভেজে কি করে। দু-এক মগ করে জল ঢালতে লাগল অসীম। তার নির্জলা থানাতেও জলের বালতি আর মগ এর চেয়ে বড়। সেখানেও তোলা জলে স্নান করবার সৌভাগ্য আছে সাব-ইন্সপেক্টরের। চাকর আছে, সে অনুপস্থিত থাকলে আছে দারোয়ান কনস্টেবলের দল। সবচেয়ে যে অভাজন অসীম তার নিচেও মানুষজন আছে। এইটুকুই সুখ। সুখ নয়, সান্ত্বনা। তুমি যতই ছোট হও না কেন তোমার চেয়েও ক্ষুদ্রতর বঞ্চিততর মানব-সন্তান পৃথিবীতে আছে। শুধু নিচের দিকে একবার তাকাতে পারলেই হল, তোমার সব দুঃখ-শোকের সান্ত্বনা মিলবে, সব হীনমন্যতার অবসান হবে। তুমি দেখবে প্রাণিজগতে পোকামাকড় আর কীটপতঙ্গের অভাব নেই। তুমি তাদের চেয়ে দু-এক ধাপ উচুঁতে আছ। মানসীর বাবা মনোমোহনের কথা মনে পড়ল অসীমের। যাদের দখলে মাত্র দু'খানা ঘর, হাজার হাজার গৃহহীন মানুষ তাদের সান্ত্বনা দেয়, আত্মপ্রত্যয় বাড়ায়, দয়া আর সহানুভূতি জাগিয়ে হৃদয়কে উদার করে। ধনীদের হৃদয়বৃত্তির চর্চার জন্যেই তো গরীবদের রাখতে হয়েছে। অসীম হাসল।

'ভালো করে সাবান মেখে চান করো। ওখানে সব আছে।' উৎকর্ণ হল অসীম। ভিতরের জল ঢালার শব্দ ছাপিয়ে আর একটি কলধ্বনি ভেসে উঠেছে। কিন্তু সত্যিই কি মানসীর গলা? না-ও হতে পারে। ওর দিদি আর ছোটবোনদের গলার স্বরও ওইরকমই। হতে পারে মাধুরীই কথাটা বলেছে।

অসীম আন্দাজেই জবাব দিল, 'সব যে আছে তা জানি।'

বাইরে থেকে পালটা জবাব এল, 'কই আর জানো। বলে না দিলে তোমার কি কিছু আর চোখে পড়ে?'

'কেন, আমি কি এমনই তাল-কানা।'

একথার আর কোন জবাব এল না, শুধু চলে যাওয়ার শব্দটুকু শোনা গেল। হয়তো আর কেউ এসে পড়েছে।

সাবান-মাখা ভিজে তোয়ালে গায়ে মুখে ঘষতে ঘষতে দুধরঙা তোয়ালে, সবুজ সাবানদানি, গন্ধতেলের শিশি তাকের ওপর কে যে গুছিয়ে রেখে গেছে,

তা অনুমান করতে দেরি হয়নি অসীমের। মাইনে-করা চাকরের হাতে যে এমন শ্রী ফোটে না, তা তো সে রোজই দেখে। তবু যেন ওটুকুর দরকার ছিল। হাতের যত্ন ছাড়িয়ে বাড়তি ওই গলার যত্নটুকুর। শুধু প্রাপ্যটুকু পেলেই কি মন খুশী হয়? প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু না পেলে মনে হয় কিছুই পেলাম না। এই উপুরি পাওনার লোভ যেদিন যাবে, সেদিন হয়তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই থাকবে না, সেদিন জল ছাড়াই জীবন বাঁচবে; কিন্তু সে জীবন মানে নিশ্চয়ই এ জীবন নয়। এই মুহূর্তে অসীমের কাছে সেই নিস্পৃহ নিরাসক্তির অর্থ মৃত্যু।

'অসীমদা, হল আপনার? কত আর নাইবেন? ক্ষিদে পায়নি?'

নন্দুর গলা।

অসীম হেসে স্বীকার করে বলল, 'পেয়েছে—আসছি। আর এক মিনিট।'

'ছিঃ, ও কি অসভ্যতা নন্দু। অত যদি গরজ থাকে দোতলার পিলুদের বাথরুম থেকে তুই নেয়ে আয় না। অমনিতে তো মাথা কুটলেও তোকে জলের কাছে নেয়া যায় না; কিন্তু আর কেউ যদি বাথরুমে ঢুকল তুই দু-মিনিট বাদে বাদেই তাড়া দিবি। আচ্ছা ছেলে হয়েছিস একজন।'

অসীম শুনতে পেল মাধুরী ছোট ভাইকে ধমকাচ্ছে।

কাপড় ছেড়ে অসীম এবার বাইরে এল। একবার ভাবল ভিজে কাপড়-খানা নিজেই ধুয়ে আনবে কিনা। এদের তো চাকরবাকর নেই। তাছাড়া মানসীরা ব্রাহ্মণকন্যা, আর সে বৈদ্য। কথাটা মনে হতে অসীমের হাসি পেল। এই ভেদবুদ্ধি আর তাদের মধ্যে নেই। জাতে এক ধাপ নিচু হলেও মানসী অসীমকে জলচল করে নিয়েছে। জল অর্থে এখানে শুধু জীবন নয়, জীবন-রস। যে তা নিতে পারে অসীমের কাপড়খানা ধুয়ে দিলে নিশ্চয়ই তার জাত যাবে না।

অসীম বেরিয়ে আসবার পরেও মাধুরী আর নন্দুর বিতর্ক থামল না। মেজদির ধমকের জবাবে নন্দু বলতে লাগল, 'কেন, তাতে কী দোষ হয়েছে? অসীমদা তো অতিথিও নয় কুটুম্বও নয়, আপন জন। নিজেদের লোক। ওঁর সঙ্গেও কি ভদ্রতা করতে হবে নাকি?—কি বলেন অসীমদা?'

অসীম হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ।'

মাধুরী বলল, 'তোকে ভদ্রতাও করতে হবে না, তর্কও চালাতে হবে না। চট করে নেয়ে আয়। নইলে তোমার কপালে দুঃখ আছে।'

নন্দু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'অমন দুঃখটুকুকের কথা এখন আর বোলো না মেজদি। আমার পরীক্ষার রেজাল্টটা বেরিয়ে যাক তারপরে যত অভিশাপ দিতে হয় দিয়ো।'

মাধুরী হেসে বলল, 'এত কুসংস্কার তোর। তুই না সায়ান্স পড়ছিস? এমন অবৈজ্ঞানিক মন নিয়ে—।'

নন্দু বলল, 'কে যে কত বড় বৈজ্ঞানিক আমার জানা আছে। বিপদে পড়লে মনে মনে সবাই মা কালীর কাছে নাকে খত দেয় আর জোড়া পাঁঠা মানত করে। আমারও এই বিপদের কটা দিন কেটে যাক—।'

ঘরে এসে গেঞ্জির ওপর ফের পাঞ্জাবিটা পরতে যাচ্ছিল অসীম। মনোমোহন বাধা দিলেন, 'এই ভ্যাপসা গরমের মধ্যে আবার জামা গায়ে দিচ্ছ কেন অসীম। খুলে ফেল, খুলে ফেল। দেখ না আমি কেমন খালি গায়ে আছি। তুমিও ঘরের ছেলের মত। লজ্জা কি তোমার। আসল লজ্জাটা কিসের জন্যে হওয়া উচিত জানো? জামা-জুতো না পরতে পারার জন্যে নয়, স্বাস্থ্য ভাল রাখতে না পারাটাই মানুষের আসল লজ্জা। কিন্তু তোমাদের নাগরিক সভ্যতা তো স্বাস্থ্য রক্ষা করতে শেখায় না। শেখায় ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়ের আড়ালে কি করে রোগ-ব্যাধি অস্বাস্থ্যকে চাপা দিতে হয়। কি করে ঈর্ষা-দ্বেষ আর মনের হাজার রকমের কু-অভিসন্ধিকে মিঠে বুলি আর মিষ্টি হাসির পোশাক পরিয়ে—'

সুহাসিনী আবার এসে এক কড়া ধমক লাগালেন, 'আচ্ছা জ্বালা হয়েছে তোমাকে নিয়ে। ছেলেটা আসতে না আসতে তার কান ঝালাপালা করে দিলে। যাও, তেল মেখে দু-মগ জল ঢেলে মাথাটা ঠাণ্ডা করে এসো।'

তারপর অসীমের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'একেবারে স্কুলের ছেলের মতন করছ দেখছি। আর যা একজন মাস্টারমশাই আছেন আমাদের বাড়িতে। সবাই তাঁর ছাত্র-ছাত্রী। শুধু কি তাই? পাড়াপড়শী অতিথি-কুটুম্ব যাকে সামনে পাবেন তাকে ধরে রেখে লেকচার ঝাড়বেন।'

মনোমোহন কি একটু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, সুহাসিনী বললেন, 'আবার কথা বলছ তুমি? যাও, নাইতে যাও। তুমি না হয় পৃথিবী উদ্ধার করতে এসেছ, কোন ক্ষিদে-তেষ্টা নেই, কিন্তু আর মানুষের সেসব আছে। ছেলেটা সেই কাল রাত্রে খেয়ে বেরিয়েছে, আর আজ বেলা দুপুর। গাড়ির ভিড়ে রাত্রে নিশ্চয়ই ঘুমুতে পারেনি। তোমার যদি কোনরকম কোন কাণ্ড-জ্ঞান থাকে।'

মনোমোহন আর দ্বিরুক্তি না করে বাথরুমের দিকে এগোলেন। স্ত্রীকে আর ঘাঁটাতে সাহস পেলেন না।

অসীম হেসে বলল, 'আপনি বুঝি মেসোমশাইকে খুব বকেন?'

সুহাসিনী হাসলেন। 'মাঝে মাঝে ধমক দিতে হয় বাবা। দিনরাত খা বক বক করেন। মাথাটা আঁচড়ে নাও।—ও মঞ্জু, তোর অসীমদাকে আয়না-

চির্ুনি দিয়ে যা।—না হয় ও-ঘরে গেলেও তো পারো। ও-ঘরে বড় আয়না আছে। ড্রেসিং টেবিল। মানসী কোত্থেকে যেন সস্তায় কিনে এনেছে। তা দেখে তোমার মেসোমশাইর কী রাগ। কতগুলি টাকা বিলাসিতার জন্যে নষ্ট হল। শোন কথা। তোমার না হয় মাথাভরা টাক, তোমার কাছে একখানা চিরুনিও বিলাসিতা। কিন্তু আমার মেয়েদের তো তা নয়। চুল বাঁধবার জন্যে তাদের তো ওসব দরকার। গরীবের ঘরে ওদের কতটুকু সাধ-আহ্লাদই বা মেটে।'

অসীমকে ও-ঘরে যেতে হল না, মঞ্জুই আয়না-চিরুনি নিয়ে এ-ঘরে এল। আয়না ছোট হলেও চিরুনিখানা বেশ বড়। বেশ চেনা যায় মেয়েদের মাথার চিরুনি। বড় একগাছা চুল ঘন দাঁতগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এ চুল মানসীরও হতে পারে।

চিরুনির দিকে সুহাসিনীরও চোখ পড়ল। তিনি মেয়েকে বললেন, 'তোদের এ কোন্ দেওয়ার ছিরি রে মঞ্জু। চুলটুল সুদ্ধ চিরুনিটা দিয়ে দিলি? দাও অসীম, আমি পরিষ্কার করে দিই।'

অন্তত এক্ষেত্রে বেশি পরিচ্ছন্নতা অসীমের অভীপ্সিত নয়। সে বলল, 'থাক না মাসীমা।' কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারল না। পাছে তিনি কিছু মনে করেন। পাছে ভাবেন ওই একগাছি চুলের সঙ্গে অসীম নিজের ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে ফেলেছে।

সুহাসিনী অসীমের হাত থেকে চিরুনিখানা প্রায় কেড়ে নিয়ে আঁচল দিয়ে সেটা পরিষ্কার করে দিলেন। অসীম মনে মনে ভাবল, মেয়েদের আঁচল কখনো ঢাকে, কখনো মোছে। আঁচলকে এ ধরনের কাজে লাগাতে মানসীকেও দেখেছে অসীম।

তার হাতে চিরুনি ফিরিয়ে দিয়ে সুহাসিনী উঠে গেলেন। বললেন, 'যাই তোমাদের খাবার জায়গা করে দিই গিয়ে। উনি যদি বেশি দেরি করেন পরে খাবেন। তোমরা আগে বসে যাও।'

মঞ্জু সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে অবশ্য এখনো আঁচলের অধিকারিণী হয়নি। তবে করে দিলেই হয়। বয়স বছর পনের-ষোল হবে, গড়নও বাড়ন্ত। তবু ফ্রক ছাড়েনি। আজকাল নাকি ফ্রক-পরা মেয়েকে কলেজের ফাস্ট-ইয়ার সেকেণ্ড-ইয়ারে দেখা যায়। কেন ফ্রকের ওপর এত মায়া? বয়সটা কম দেখাবে বলে, নাকি নিয়মিত শাড়ির জোগান দেওয়া সহজ নয় বলে? হয়তো শেষ কারণটাই এদের বেলায় সত্য।

অসীম মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোন্ ক্লাসে পড় মঞ্জু? স্কুলে আছ না কলেজে চলে গেছ? আজকাল চেহারা দেখে কিছু আন্দাজ করা শক্ত।'

মঞ্জু হেসে বলল, 'আমি স্কুলেই আছি। ক্লাস টেন। মায়াদি আই-এ দিয়েছে। ও আমার চেয়ে তিন বছরের বড়।'

অসীম বলল, 'তাই নাকি? বেশ বেশ। আচ্ছা তোমাদের প্রত্যেকের নামই বুঝি 'ম' দিয়ে? পঞ্চ ম কার?'

ব'লে অসীম নিজেই অপ্রতিভ হল। কথাটার মানে যদি মঞ্জুর জানা থাকে, তাহলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

মঞ্জু বলল, 'পঞ্চ কেন হব? আমরা ছ' বোন। ষড় ঋতু।'

অসীম হেসে বলল, 'বেশ বেশ। তাদের মধ্যে তুমি কোনটি?'

মঞ্জু লজ্জিত হয়ে বলল, 'কী জানি।'

মানসী এসে ঘরে ঢুকল। এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ শুনছিল, এবার আত্মপ্রকাশ করে বলল, 'চল, মা ডাকছেন। ও-ঘরে জায়গা করা হয়েছে।'

এ ঘরখানা আগের ঘরের চেয়ে যে আকারে বড় তা নয়, তবে জিনিস-পত্র অনেক কম। দক্ষিণ দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটি ড্রেসিং টেবিল, একখানা চেয়ার। ঠেলে একেবারে তলায় সরিয়ে রাখা হয়েছে। তার পাশে একটি সস্তা দামের বইয়ের র‍্যাক। উল্টোদিকের দেয়ালে কয়েকটা বাক্স-স্যুটকেশ ঠেস দেওয়া রয়েছে।

মেঝেয় মুখোমুখি দুটি সারিতে কয়েকখানি আসন পাতা হয়েছে। কাঁচের গ্লাসে টল টল করছে জল। মনোমোহন এরই মধ্যে স্নানটান সেরে তৈরি হয়ে নিয়েছেন। কালো রঙের ওপর সাদা পৈতেটা আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তিনি সবচেয়ে বড় আসনখানা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো বাবা বোসো।'

মাধুরী মানসী আর তাদের মা বাদে সবাই পংক্তিভোজনে জায়গা পেয়েছে। প্রবীণ বলে মনোমোহনকে একটু আলাদা করে সরিয়ে দিয়েছেন সুহাসিনী। অসীমের একপাশে নন্দু, আর এক পাশে মঞ্জু, তাদের পাশে মায়া আর মিনু।

সুহাসিনী নিজেই প্রধান পরিবেশিকা। মাধুরী আর মানসী তাঁর জোগান দিচ্ছিল।

মাধুরী এক ফাঁকে বলল, 'তুইও বসে গেলে পারতি মানু। ঘরে জায়গাও রয়েছে। তাছাড়া যা দেবার মা আর আমিই তো দিতে পারতাম।'

মানসীর মুখখানা কি একটু আরক্ত হল? মাধুরীর কথার মধ্যে কি কোন বক্রতা আছে, কি একটু প্রচ্ছন্ন পরিহাস? ভাতের থালা থেকে মুখ তুলে আড়চোখে দুজনের দিকেই তাকাল অসীম। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। মানসীর সঙ্গে হোটেলে রেস্টুরেন্টের টেবিলে মুখোমুখি বসে খেয়েছে

অসীম। কিন্তু এই পারিবারিক ভোজের আসরে সেভাবে খেতে বসতে মানসীর বোধহয় লজ্জা করছে। এতই যদি সঙ্কোচ অসীমকে এখানে ডাকবার কি দরকার ছিল। এর চেয়ে দক্ষিণ কলকাতার বন্ধুর বাসায় উঠলেই সে বোধহয় ভাল করত। দেখা-সাক্ষাৎ মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা বেশি হত। অন্যান্য বার যেমন হয়েছে। এখানে কাছাকাছি থাকলেও গুরুজন আর লঘুজনের চোখ এড়িয়ে মানসী ক'বারই-বা তার সঙ্গে কথা বলতে পারছে—ধরা-ছোঁয়া দূরে থাক কাছে এসে নিশ্চিন্তে দাঁড়াতেই কি পারছে দু-এক মিনিটের জন্যে? এখানে বোকার মত মানসী তাকে কেনই-বা ডাকল আর আরও এক ডিগ্রী বেশি বোকা সেজে অসীমই-বা তাতে রাজী হয়ে গেল কেন।

সুহাসিনী বললেন, 'আমি তো বলছিলাম মাধু-মানু তোমরা দুজনেই বসে যাও। আমি একাই তোমাদের সবাইকে দিতে পারব। তা কেউ রাজী হল না। এ বলে তুই বোস, ও বলে তুই বোস।'

নন্দু বলে উঠল, 'ঠিক শঙ্খসাপের মত। জানেন অসীমদা, শঙ্খসাপের দুটি করে মুখ। একটি লেজের দিকে, আর একটি মাথার দিকে। এ মুখ বলে তুই খা, ও মুখ বলে তুই খা। মেজদি সেজদি তোমার দুই শঙ্খিনী মা।'

সুহাসিনী মৃদু হেসে ছেলেকে সস্নেহে ধমক দিলেন, 'ছি ছি ছি নন্দু, দিদিদের ওসব কথা বলে নাকি? দিদিরা না গুরুজন?'

মানসী বলল, 'আর তোর না পরীক্ষার ফল এখনো বেরোন বাকি?'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। অসীমও হাসল।

একটু বাদে সুহাসিনী বললেন, 'কই বাবা, তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না। মুড়িঘণ্টটা তো পড়েই রইল। ঝাল বেশি হয়েছে নাকি অসীম?'

অসীম বলল, 'ঝাল ঠিকই আছে মাসীমা। একটুও বেশি হয়নি। কিন্তু এত রান্না করেছেন কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা খাব ভেবে পাচ্ছিনে। চমৎকার হয়েছে রান্না।'

মাধুরী বলল, 'সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ মাছটা মানু রেঁধেছে অসীমদা।'

মানসী ছোট মেয়ের মত প্রতিবাদ করে উঠল, 'এই দিদি, নিজে রেঁধে আমার নাম দিচ্ছ, মোটেই ভাল হবে না কিন্তু। আমি ভাল রাঁধতে পারিনে কিনা তাই আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে।'

মাধুরী বলল, 'ঠাট্টা করব কেন, তুইও তো কাছে কাছেই ছিলি, রান্নার সময় জোগান দিয়েছিস, তেল-নুন-ঝালের পরিমাণ বলেছিস—'

অসীম হেসে বলল, 'ঠিক সেই জন্যেই ইলিশ মাছ পাতুরিতে তোমাদের দুজনের হাতেরই গন্ধ পাচ্ছিলাম।'

নন্দু বলল, 'আমিও পাচ্ছি অসীমদা। নাকের দুটো বাসি থাকায় খুব সুবিধে হয়েছে। দুখানা হাতের আলাদা আলাদা গন্ধ বেশ ধরা পড়ে।'

আর একবার হাসির রোল উঠল।

মাধুরী হাসি চেপে বলল, 'ভারি ফাজিল হয়েছিস তো নন্দু। বড্ড বাড় বেড়েছে তোর।'

একটু দূরে বসে নিজের মনেই খেয়ে যাচ্ছিলেন মনোমোহন। তাঁকে শ্রদ্ধা করে প্রবীণ পূজনীয় গুরুজন ভেবে সবাই দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাঁর সঙ্গে কেউ কথাও বলছে না, তাঁর কথা কেউ শুনতেও চাইছে না। এই মুখর ভোজের আসরে বিনাবাক্যে খেয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে এক বিষম শাস্তি। তিনি অনেকক্ষণ ধরেই কথা বলবার সুযোগ খুঁজছিলেন, এবার পেয়ে গেলেন।

'তোমাদের ওখানে মাছ-টাছ কি রকম সস্তা অসীম?'

অসীম বলল, 'সস্তা কি বলছেন মেসোমশাই? মাছ মেলেই না সেখানে।'

মনোমোহন অবাক হয়ে বললেন, 'বল কি, মেলেই না! তাহলে খাও কি?'

অসীম বলল, 'ডিম, মাংস। মুরগী-টুরগী পাওয়া যায়।'

হঠাৎ চোখে পড়ল মানসীর তর্জনী তার দুই ঠোঁটে উঠেছে।

অসীম তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'পাওয়া যায় তবে সেসব জমাদার-টমাদাররাই খায়। আমার ভাগ্যে বেশির ভাগই ডিম-সেদ্ধ আর । কি বড়জোর ডিমের ঝোলটা কোনরকমে করে নিই।'

মনোমোহন বললেন, 'করে নাও মানে? নিজেই রাঁধো নাকি?'

অসীম বলতে লাগল। মাঝে মাঝে তাও রাঁধতে হয় অসীমকে। প্রথম প্রথম সহকর্মীদের সঙ্গে জয়েণ্ট মেসিংএর ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু সেই যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরতে দেরি হয়নি। একেকজনের একেকরকমের রুচি। প্রবৃত্তিও একরকম নয়। অনেকেরই অভিযোগ খরচ বেশি পড়ে। তাই শেষ পর্যন্ত যার যার তার তার হয়েছে। অসীমও আলাদা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আদিবাসী একটি চাকর আছে। ঠাকুরও সেই। লোকটি ভাল। কিন্তু মাঝে মাঝে তার মাথা আর মতিগতির ঠিক থাকে না। বাঙালীবাবুর মাছ-মাংস রেঁধে দিলে তার জাত যায়। তাই বোধহয় ফাঁকে ফাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে আসে। টাকায় সব পাপ ঢাকে। সে যখন থাকে না কি তার বদলে আর কাউকে যখন খুঁজে পাওয়া যায় না, অসীম নিজেই রাঁধতে বসে যায়। কিন্তু হাতের কৃতিত্বের সঙ্গে জিভের রুচির মিল হয় না।

সুহাসিনী বললেন, 'কি করে পারবে তুমি। ওসব কি তোমাদের কাজ।'

মাধুরী বলল, 'দারোগাগিরি করবার সুখ তো মন্দ হয়নি অসীমদা। ব পর্যন্ত হাত পুড়িয়েও খেতে হচ্ছে।'

মনোমোহন বললেন, 'অত কষ্ট করবার দরকার কি। চেষ্টা করে বদলী-

টদলী হয়ে চলে এসো। তাছাড়া যেখানে মাছ নেই, সেখানে কি মানুষ থাকতে পারে? জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, মাছ ছাড়া তেমনি বাঙালী বাঁচে না। তুমি চলে এসো।'

সুহাসিনী সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই করো বাপু! এদিকে চলে এসো। বাপ নেই, মা নেই, এক বোন ছিল বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছ, অত কষ্ট তোমার কিসের জন্যে? ও চাকরি ছাড়া চাকরি আর নেই নাকি ভূভারতে? তুমি চলে এসো। হয় অন্য চাকরি নাও, কি চেষ্টা-চরিত্র করে কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় বদলী হয়ে এসো। আর ওখানে যদি থাকতেই হয় একটা বিয়ে-টিয়ে কর, শান্তিতে বসে যার হাতের দুটি রান্না খেতে পারবে তেমন একজনকে ঘরে আনো।'

অসীম মাছের টক দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'সেইজন্যেই এসেছি মাসীমা।'

সুহাসিনী হেসে বললেন, 'তাই নাকি বাবা? বেশ বেশ। সুমতি হয়েছে বুঝি এতদিনে?'

রাশভারি মাধুরীর গলা পর্যন্ত এবার তরল হয়ে উঠল, 'ও মা তাই নাকি? এতক্ষণ এমন সুখবরটা চেপে রেখেছিলে কেন অসীমদা? বিয়ে করতে এসেছ? তাই বল। কোথায় সম্বন্ধ ঠিক হল?'

মাধুরী যত উচ্ছল মানসী তত গম্ভীর আর ম্লান।

অসীম এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে আত্মচিন্তা করতে করতে সে মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছে। এক প্রশ্নের জবাব দিতে আর এক প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। যেমন দিয়েছে পরীক্ষার খাতায় আর নানা জায়গায় চাকরির ইণ্টারভিউতে। তাই জীবনে ভালো রেজাল্ট হল না, ভালো চাকরি মিলল না।

কিন্তু এক্ষেত্রে ভুল শোধরাবার সুযোগ পেল অসীম। হেসে বলল 'সম্বন্ধ-টম্বন্ধের কথা কি বলছ তোমরা!'

মাধুরী বলল, 'কিসের সম্বন্ধ আবার। বিয়ের।'

অসীম বলল, 'তোমরা ভুল শুনেছ। আমি চাকরির কথা বলছিলাম। চাকরির তদ্বিরের জন্যে এসেছি। আমাদের মত মানুষের কি আর বিয়ে করা সাজে?'

অসীম এতক্ষণে মানসীর মুখের রঙ লক্ষ্য করল, কিন্তু তার তাকাতে না তাকাতে সে অন্য ঘরে চলে গেল।

মানসীর মনের ভাবটা অসীম ভালো করে বুঝতে না পারলেও তা শেষের কথাটা যে ঘরের আর কেউ বিশ্বাস করেনি তা অসীমের বুঝতে বা রইল না।

অসাবধানে মনের কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে ভেবে অসীম নিজে

মনেই হাসল। তার কথাটাও মিথ্যা নয়, আবার মাধুরীদের আন্দাজটাও মিথ্যা নয়। চাকরির তদ্বিরে যেমন সে এসেছে তেমনি এসেছে মানসীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে। সেটা ঠিক বিয়ে না হলেও উপক্রমণিকা। না কি একটি দীর্ঘকালের সম্পর্কের উপসংহার?

—'অসীমকে আর একটা আম দাও।—উৎকৃষ্ট হিমসাগর এনেছি অসীম, আর একটা খাও। ওই তো ছোট ছোট আম, আমি তো ইচ্ছে করলে গোটা পঁচিশেক একসঙ্গে খেতে পারি।'

মনোমোহন আবার বক্তার ভূমিকা নিলেন।

টকের পরে দই। দইয়ের সঙ্গে আম। সুহাসিনী আরো দুটি আম অসীমের পাতে দিলেন।

অসীম মহা বিব্রত হয়ে বলল, 'এ কি করলেন মাসীমা, আমি কিন্তু আর একটাও খেতে পারব না।'

মনোমোহন সমানে উৎসাহ দিতে লাগলেন, 'খেলেই পারবে। খেয়ে দেখ অসীম, খুব মিষ্টি আম, উৎকৃষ্ট আম। সাধে কি বলে অমৃত?'

সুহাসিনী এবার স্বামীর দিকে এগিয়ে গেলেন, হেসে বললেন, 'তোমাকে দেব নাকি আর একটা? কেবল ওপাতে দাও, ওপাতে দাও করছ!'

মনোমোহন লজ্জিত হয়ে বললেন, 'তা থাকে যদি একটা দিতে পার। কিন্তু আর কারো ভাগেরটা যেন দিয়ো না।'

সুহাসিনী বললেন, 'সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।'

একটু বাদে খাওয়া শেষ করে প্রসন্ন মুখে উঠে দাঁড়ালেন মনোমোহন। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে গেলে তিনি অসীমের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'তোমার কল্যাণে খাওয়াটা আজ মন্দ হল না বাবা। ভেব না চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় এমন রাজভোগ আমরা রোজ খাই। তুমি এসেছ তাই হল। নিজের বাড়িতেই নিজে নেমন্তন্ন খেলাম। কিন্তু তুমি না এলে এসব আজ হত না।'

ভোজনপ্রিয় বৃদ্ধের এই পরিতৃপ্ত মুখের দিকে অসীম মুগ্ধ চোখে তাকাল। একটু আগে মানসীকে নিয়ে একসঙ্গে একান্তে বসে না খেতে পারার জন্যে তার যে দুঃখ হয়েছিল, সেই দুঃখের জন্যে এখন লজ্জা হল। মনে হল, এই পারিবারিক ভোজে এসে না মিলতে পারলে এমন দৃশ্য তার চোখে পড়ত না, এমন একটি দুপুরের মাধুর্য অনাস্বাদিত থাকত।

মুখোমুখি দুখানা ঘরের মাঝখানে যে এক ফালি জায়গা আছে এখন ড্রয়িং রুম। দেয়াল ঘেঁষে একখানা টেবিল, তার ওপর স্কুল আর কলেজের

বইখাতা স্তূপীকৃত। দুদিকে দুখানি হাতল-ছাড়া চেয়ার। মনোমোহন অসীমকে হাতে না ধরেও সেখানে টেনে আনলেন। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, 'বোসো, রেস্ট নাও।'

কি আশ্চর্য কাণ্ড। পানের ডিবেটায় করে সুহাসিনী নিজে নিয়ে এসেছেন পান। মেয়েদের কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হত। নিজের হাতে পান দিতে মানসীর যদি অতই সংকোচ, কোন বোনকে দিয়ে পাঠালেই হত। পান সিগারেটও যদি মা-মাসীর হাত থেকে আসে তার সমস্ত মাদকতা ধুয়ে যায়।

অসীম সুহাসিনীর দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি আবার পান নিয়ে এলেন কেন মাসীমা। পান তো আমি খাইনে।'

সুহাসিনী একটু হেসে বললেন, 'আহা খাও না, মাঝে মাঝে খাওয়া ভালো।'

মনোমোহন বললেন, 'যাও, তোমরা এবার খাওয়া-দাওয়া সেরে এসো, আমরা ততক্ষণ একটু রেস্ট নিই।'

সুহাসিনী বললেন, 'তোমার সামনে বসে রেস্ট? তবেই হয়েছে। মানুষের কানে তালা লাগবার আগে তোমার বকুনি কি থামবে না কি? বেচারা সারারাত গাড়ির ভিড়ে জাগতে জাগতে এসেছে। এবার ওকে একটু ঘুমুতে দাও।'

মনোমোহন এবার বেশ খানিকটা চটে উঠলেন, 'দিচ্ছি গো দিচ্ছি। ওর ওপর তোমার চেয়ে আমার দরদ কম নয়। ও তোমারও ছেলের বন্ধু, আমারও ছেলের বন্ধু। কিন্তু মানুষ নেই, জন নেই, দিন নেই রাত নেই তুমি সব সময় আমাকে গরু তাড়াবার মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন বলতো। ছেলেটাকে তো বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছ, এবার আমাকেও তাই করতে চাও নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে সুহাসিনী ঘুরে দাঁড়ালেন। অসীম অবাক হয়ে দেখল. তাঁর সেই শান্ত সৌম্যমূর্তি পলক ফেলতে না ফেলতে একেবারে রণচণ্ডীর রূপ ধরেছে।

সুহাসিনী চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'এই কথা তুমি বললে? ঘরের তলায় বসে এই ভরদুপুর বেলায় আমার নামে অত বড় একটা মিথ্যে কথা বলতে পারলে তুমি? একটুও জিবে আটকাল না? আমার নামে এমন বদনাম দেওয়ার আগে তোমার পাঁচটা প্রাণে একটা কথা বলল না? নিজে টাকার খোটা দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে পর করে দিয়ে ঘরের বার করে দিলে, এখন আমার ওপর যত দোষ চাপাবার চেষ্টা?'

অসীম মহা অপ্রস্তুত। এমন সুন্দর সুস্থ একটি পরিবারে মুহূর্তের

মধ্যে যে এ ধরনের কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেতে পারে তা ধারণাতীত। ছেলেমেয়ের বন্ধু হিসাবে অসীমের সঙ্গে এঁদের যত ঘনিষ্ঠতা থাকুক তার সামনে এমন মারমূর্তি হয়ে দাম্পত্য কলহ না করাটাই এঁদের পক্ষে সঙ্গত ছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের স্বাদ এরই মধ্যে কটু হতে শুরু করেছে। অসীমের মনে আবার অনুশোচনা এল এখানে না এলেই ভালো হত। অনেক কষ্টে তিনদিনের ছুটি জুটেছে। সেই দুর্লভ অবসরটুকু কাটাবার জন্যে স্থান নির্বাচনে অসীম সুবুদ্ধির পরিচয় দেয়নি।

গোলমাল শুনে মাধুরী আর মানসী ছুটে এল। মানসী বলল, 'আবার কি হল তোমাদের। ভাত বাড়া হয়েছে। চল মা, খাবে চল।'

সুহাসিনী বললেন, 'তোমরা খাও গিয়ে বাছা। আমার ক্ষিদে তেষ্টা সব মিটে গেছে। আমি খাব না।'

মাধুরী ধমক দিল, 'কি পাগলামি হচ্ছে? এসো, শিগ্‌গির এসো। ভাত তরকারি সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

সুহাসিনী গভীর অভিমানে বললেন, 'হোক। আমার সবই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এখন দেহের জ্বালাটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বাঁচি। সবাই বাঁচে তাহলে।'

মাধুরী বলল, 'লক্ষ্মী মা, চল। অমন রাগ করে নাকি।'

যেন মা আসলে সুহাসিনী নন, মাধুরী নিজেই। অবুঝ একগুঁয়ে মেয়েকে ভুলিয়ে-টুলিয়ে খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুহাসিনী অত সহজে ভুললেন না। আগের মতই গোঁ ধরে বললেন, 'আমাকে বিরক্ত কোরো না। তোমরা খাও গিয়ে, আমি খাব না।'

মনোমোহন কখন উঠে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছেন আর রাস্তার চলমান যাত্রীবোঝাই ট্রাম-বাসগুলিকে ছুটে যেতে দেখছেন। এই নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা ছাড়া সংসারে তাঁর আর যেন কোন ভূমিকা নেই।

মানসী আড়চোখে অসীমের দিকে তাকাল। মানে, তুমি সাহায্য কর, তুমি উদ্ধার কর। আমাদের মূল্যবান সময় চলে যাচ্ছে।

তা তো যাচ্ছেই। অসীম কি এখানে এক প্রৌঢ় দম্পতির ঝগড়া-বিবাদ মান-অভিমান দেখবার জন্যে ছুটি নিয়ে এসে বসেছে! তার কি পৃথিবীতে আর কোন কাজ নেই?

কিন্তু বাইরের মানুষ হয়ে এঁদের এই পারিবারিক ব্যাপারে কী করতে পারে, কীই-বা বলতে পারে অসীম। তার মুখ থেকে ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বেরোয় না, যথাস্থানে যথোচিত কাজের জন্যে সে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে না। তার উপস্থিত বুদ্ধি নেই, বরং সব সময়ে তার বুদ্ধি অনুপস্থিত। তবু

মানসীর চোখের ইশারাই বোধহয় পলকের মধ্যে সেই পলাতক বুদ্ধিকে ডেকে আনল, মূককে বাচাল করল আর পঙ্গুকে গিরি-লঙ্ঘন করতে সাহস দিল।

অসীম বলল, 'মাসীমা, আপনি তাহলে ওইভাবে রাগ করে না খেয়ে থাকুন। আমি চলে যাই।'

সুহাসিনী বললেন, 'সে কি, তুমি এই ভরদুপুরে কোথায় যাবে? বিশ্রাম-টিশ্রাম না করে?'

অসীম বলল, 'আপনি যদি অমন করেন আমার কি আর বিশ্রাম করা আসে মাসীমা?'

নিজের গলা শুনে অসীম নিজের মনেই হাসল। তার কণ্ঠের কৃত্রিমতা কি ওরাও টের পেয়েছে? মা না পেলেও মেয়ের নিশ্চয়ই বুঝতে বাকি নেই।

সুহাসিনীকে এবার একটু লজ্জিত দেখা গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি স্নিগ্ধ কৌতুকের সুরে হেসে বললেন, 'ও, আমাদের ঝগড়া-ঝাঁটি দেখে বলছ? কিছু মনে কোরো না বাবা। আগে আগে লজ্জা করতাম। এখন আর ছেলে-মেয়েদের সামনে আমাদের কোন লজ্জা নেই। কতক্ষণ আর লজ্জা করে মানুষ পারে বলতো বাপু, তোমার মেসোমশাইর সঙ্গে আমার অমন ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। এখন আর একেবারেই বনে না।' সুহাসিনী মিষ্টি করে একটু হাসলেন। তারপর মেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন, 'মাধু মানু, চল খাবি চল। আহা, তোদের বড় কষ্ট হল। চল।'

মেয়েদের নিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন সুহাসিনী।

মনে মনে অসীম তাঁর অভিনয় দক্ষতাকে নমস্কার জানাল। মেয়েদের যে জাত-অভিনেত্রী বলা হয়, তা এইজন্যেই। ওঁর কলাকৌশলের কাছে নিজেকে অসীমের শিশু মনে হল। ভিতরের বাইরের হাজার রকমের দীনতা হীনতাকে ঢাকবার জন্যে এঁদের বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই. দরজায় জানলায় দামি রঙীন পর্দা নেই যে সব আড়াল করবেন; শুধু দুটি কথা, একটুখানি হাসি আর গলার স্বরটুকু বদলাবার কৌশল এই সম্বল নিয়ে খোলা হাটের মাঝখানে এঁরা সব মর্যাদা আর গোপনতা রক্ষা করেন। যাদুকরীর কাঠি ছুঁইয়ে দিনকে রাত করেন, রাতকে দিন।

ভিতরের ঘর থেকে মঞ্জু এসে বলল, 'অসীমদা, যান আপনি এবার শুয়ে পড়ুন গিয়ে। বিছানা পাতা আছে।' ভেজানো দরজা ঠেলে মঞ্জু আগে আগে ঘরের ভিতর ঢুকল, তারপর হেসে বলল, 'আসুন।'

পুরোন একখানা ডবল বেডের খাট। অসীম অনুমান করল বাড়ির কর্তাগিন্নীর ফুলশয্যার দিনে বোধহয় এখানা পাতা হয়েছে। খাটের তলায় আশেপাশে দেয়ালের তাকগুলিতে ঘরের সব জায়গায় গৃহস্বামীর জিনিস-পত্র ঠাসা। আর সব মিলিয়ে কেমন একটা গন্ধ। সর্বনাশ। এই সিন্দুকের

মধ্যে কতক্ষণ তাকে কাটাতে হবে কে জানে। অসীম এই গরমে যে একেবারে আলুসেদ্ধ হয়ে যাবে।

অসীম বলল, 'আমাকে বরং বাইরেই বিছানা করে দাও মঞ্জু।'

মঞ্জু বলল, 'কেন, ঘরই তো ভালো অসীমদা। আপনি গরমের ভয় করছেন। ফ্যান খুলে দিচ্ছি। মোটেই গরম হবে না। একটু বাদে দেখবেন বেশ ঠাণ্ডা।'

অসীম বলল, 'কিন্তু ছারপোকা?'

মঞ্জু হেসে বলল, 'আপনার সেই ভয়? না, ছারপোকা নেই। বাবার বিছানায় একটি ছারপোকা থাকলে কি আর রক্ষে আছে? আমরা সপ্তাহে দুবার করে ওঁর বিছানা ধুয়ে দিই, রোদে দিই। তাছাড়া চাদর, বালিশের ঢাকনি সব ধোপাবাড়ি থেকে এসেছে। মেজদি বড় বাক্সটা খুলে সব বের করে দিয়েছে। আপনি ভাববেন না যে—।'

অসীম লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না না, আমি সে সব কিছু ভাবিনি। তোমার বাবা-মা বুঝি এই খাটে—?'

মঞ্জু বলল, 'না। আর—। মা, আমি, মায়াদি সব নিচে বিছানা পেতে—। আপনি এবার ঘুমোন অসীমদা, আমি যাই। কথা বললে আপনার ঘুম আসবে না।'

অসীম বিছানায় উঠে শুয়ে পড়তে পড়তে হেসে বলল, 'তুমি কথা বললে আমার আর ঘুমোতেই ইচ্ছা করবে না।'

মুখ নিচু করে গলা নামিয়ে মৃদু হেসে মঞ্জু বলল, 'ঈস্, সে আর আমার কথা নয়।'

বলেই ঘর থেকে দে ছুট।

অসীম বালিশ থেকে মাথা তুলে দোরের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'ও মঞ্জু, শোন শোন। শুনে যাও।' কিন্তু মঞ্জুর কোন সাড়া মিলল না, দেখাও মিলল না।

অসীম হেসে আবার শুয়ে পড়ল। সবই ঠিক আছে। বিয়ের আগে জামাই-আদর, শালিকা সদৃশাদের ঠাট্টা-তামাশা রসিকতা। শুধু বিয়ের নামেই দেখা নেই। বিয়ে যে হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মনোমোহনবাবু তার মত নিম্নবর্ণ আর কাঞ্চন-কৌলীন্যে নিম্নশ্রেণীর পাত্রের হাতে স্বেচ্ছায় স্বহস্তে কন্যাদান করবেন না এটা প্রায় নিশ্চিত। অসীমকে যদি নিতে হয় কেড়ে নিতে হবে। কিন্তু অতখানি বাহুবল কি তার আছে? কিংবা ঝামেলা-ঝক্কি পোহাবার মত মনোবল? সেও তো তিরিশ পেরিয়েছে।

তাছাড়া মানসীকে শুধু তার বাপ-মার হাত থেকে কেড়ে নিলেই তো হবে না, তার নিজের মনের হাজার রকমের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নানা ধরনের কর্তব্যবোধ,

মর্যাদাবোধের হাত থেকেও কেড়ে নিতে হবে। সেই কাড়াটাই বড় কাড়া। বড় কঠিন। মানসীর মনকে আজও ভালো করে বুঝে উঠতে পারেনি। বিয়ের বিপক্ষে, অন্তত সমূহ বিয়ের বিপক্ষে তার একেক সময় একেক ধরনের যুক্তি। কোনটাই ধোপে টেঁকে না। মানসীর মনে প্রেম যদি দুর্বার হত, তাহলে এসব বিচার বিবেচনা আসতই না। একথার জবাবে মানসী একবার বলেছিল, 'কী করব বল, তুমিও আর আঠের কি বিশ বছরের তরুণ নও, আমিও ষোড়শী-সপ্তদশী নই। ঝাঁপিয়ে পড়বার বয়স কি সাহস এখন আর আমরা কেউ রাখি না।'

কিন্তু অসীমের যে সাহস আছে সেই কথাই আজ সে জানাতে এসেছে। বলতে এসেছে, 'এখন বয়স থাকা সত্ত্বেও বয়স নেই ভাব করছ। বয়স যখন সত্যিই চলে যাবে সেদিন আর কেঁদে কূল পাবে না। অশ্রুবন্যায় শুধু ভেসে বেড়াতে হবে। আর যদিও তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট তবু প্রকৃতির নিয়মে তোমার যৌবনই আগে যাবে। যৌবনই তো রূপ। যৌবনই তো জীবন। জীবনের রাজা। সেই রাজাকে ইচ্ছা করে নির্বাসনে দিয়ো না। জীবনে পরম লগ্ন কোরো না হেলা হে গরবিনী।'

'মঞ্জুকে ডাকছিলে কেন অসীম? তোমার কি কিছু চাই? জলটল কিছু দরকার?'

মানসী নয়, মাধুরী নয়, তাদের বাবা ফের এসে হাজির হয়েছেন।

অসীম শঙ্কিত হল, বিরক্তও হল। নাঃ, এই বুড়ো ভদ্রলোক তাকে একেবারে অতিষ্ঠ না করে ছাড়বেন না। যত তাড়াতাড়ি পারে এখান থেকে বিদায় নিতে পারলেই তার কান দুটো রক্ষা পাবে।

অসীম বলল, 'না মেসোমশাই, কিছু চাই না। এমনিই ডাকছিলাম ওকে। আসুন।'

মনোমোহন পরম আপ্যায়িতভাবে হাসলেন, 'এলে তো তোমার আবার বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে অসীম।'

অসীমকে বলতে হল, 'না, না, ব্যাঘাত কিসের। বসুন আপনি।'

এই মুহূর্তে গৃহী তাঁর নিজের ঘরে অতিথি।

মনোমোহন খাটের পাশে আলগোছে বসে বললেন, 'এলাম তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে। I am grateful to you, Ashim—very grateful.'

অসীম অবাক হয়ে বলল, 'কৃতজ্ঞতা আবার কিসের মেসোমশাই?'

মনোমোহন গলা নামিয়ে বললেন, 'তুমি আজ সামনে না থাকলে তোমার মাসীমা সারাদিন সারারাত না খেয়ে থাকত। যেমন রাগ তেমনি জেদ। না খেয়ে সারাদিন কষ্ট পেত, আর সেই কষ্টে আমার সঙ্গে সারাদিন ঝগড়া করত। জানো অসীম, এক কষ্ট থেকে আর এক কষ্টের জন্ম, এক দুঃখ

থেকে আর এক দুঃখের। মানুষ দুঃখ দেয় বলেই দুঃখ পায়, আবার দুঃখ পায় বলেই দুঃখ দেয়। রক্তবীজের গল্প শুনেছ অসীম? এক ফোঁটা রক্ত মা ধরণীর বুকে পড়ে আর হাজার হাজার লাখ লাখ অসুরের জন্ম হয়। দুঃখ তেমনি। সে হল আর এক অশ্রুবীজ। এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে আর নতুন নতুন দুঃখের জন্ম হতে থাকে।

অসীম চমকে উঠল। তার গহন মনের কোন এক অদৃশ্য তন্ত্রীতে যেন ঝঙ্কার লেগেছে। মনোমোহনের কথাগুলি সেই সুরেরই স্বরলিপি। এই মুহূর্তে মানুষটির খর্বাকার চেহারা, বিসদৃশ গোঁফ, মানুষকে বোর করবার অসম্ভব ক্ষমতা সব যেন অসীমের চোখের সামনে থেকে লোপ পেয়েছে। যা বিলুপ্ত হয় না তার নাম দুঃখ। তার স্বাদই কি সমুদ্রের স্বাদ! তলহীন কূলহীন আদিহীন অন্তহীন সেই অসীম সমুদ্র। তার বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ।

অসীম বলল, 'আপনার কিসের এত দুঃখ মেসোমশাই।'

মনোমোহন বললেন, 'কিসের দুঃখ? জানো অসীম, খেতে বসে বারবার সেই হতভাগা হারামজাদাটার কথা আমার মনে পড়ছিল। সেও ইলিশ মাছ আর আম খেতে ভালোবাসে। আমি যে চুপচাপ খাচ্ছিলাম তা শুধু ওই জন্যে। কথা বলতে পারছিলাম না। বললেই তার কথা মুখে এসে পড়ে। অথচ আমি নিজেই বাড়ি ভরে সার্কুলার জারি করেছি, খবরদার সেই কুলাঙ্গারের নাম তোমরা কেউ মুখে আনবে না। সেই আইন ভাঙি কি করে? Law-maker should not be lawbreaker. কুলাঙ্গার—কুলাঙ্গার ছাড়া কি! এতগুলি আইবুড়ো সোমত্ত বোন ঘাড়ে। তাদের কথা একবারও ভেবে দেখল না। নিজে বিয়ে-থা করে দিব্যি মনের সুখে আছে। বল তো অসীম, এই কি মানুষের কাজ?'

অসীম শেখানো পাখির মত বলল, 'সত্যি, এটা শঙ্করের উচিত হয়নি।'

মনোমোহন বলতে লাগলেন, 'স্বার্থপর, পরম স্বার্থপর। শুধু নিজের বউ আর বাচ্চা ছেলে। পূর্ব গোলার্ধ আর পশ্চিম গোলার্ধ। তার পৃথিবী এই দুই ভাগে বিভক্ত। বাপ-মা, ভাই-বোন সব এখন ভেসে গেছে। অথচ এক সময় ওদের সে কী ভালোই না বাসত। আজ সেই ভালোবাসার ধারা আর একদিক দিয়ে বইছে। আজ এপারে চর, ওপারে গঙ্গা। আজ সে বলে কি জানো?—ওদের জন্যে আমি দায়ী নই, আপনি দায়ী। সমস্ত দুঃখ দুর্দশা দারিদ্র্যের জন্যে আপনি দায়ী।—ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছ অসীম? কিন্তু ভাষাটা ভদ্রলোকের হলে কি হবে, ভিতরের ভাবটা যে ইতরের মত। তোমাদের আজকালকার ছেলেরা এমন কথাও বাপকে মুখের ওপর বলে দিতে পারে। মোটেই জিভে আটকায় না। নিজের ছেলের মুখে ও কথা শুনে লজ্জায়

আমার মাথা হে'ট হয়ে গেল বাবা। মনে মনে বললাম, ধরণী দ্বিধা হও। ওরে হভতাগা, আমি কি কেবল তোর ভাইবোনগুলির জন্যেই দায়ী, তোর জন্যেও দায়ী নই! যে মুখ দিয়ে তুই আজ ওকথা বললি সে মুখে খাবার জোগাল কে, ভাষা জোগাল কে?'

সুহাসিনীদের খাওয়া হয়ে গেছে। তিনি ঘরের বাইরে থেকে স্বামীকে আবার তাড়া লাগালেন, 'আশ্চর্য, ছেলেটাকে কি তুমি একটুও ঘুমুতে দেবে না? ও-ঘরে তোমার বিছানা পেতে রেখে এসেছি। যাও শোও গিয়ে। বই আছে, কাগজপত্র আছে। আজ তো কাগজটাও ভালো করে দেখনি, যাও দেখ গিয়ে।'

এবার সুহাসিনীর গলা কোমল আর স্নিগ্ধ। দেখা গেল মনোমোহন এবার আর প্রতিবাদ করলেন না। ঘর থেকে চলে যাওয়ার আগে বরং একটু লজ্জিত ভঙ্গিতেই বললেন, 'সত্যি, তোমাকে খুব ডিস্টার্ব করে গেলাম, কিছু মনে কোরো না।'

অসীম কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'না না না।'

মনোমোহন বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মানসী ঘরে ঢুকল। আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়াল। খাটের ধারে অবশ্য বসল না, কিন্তু ধার ঘে'ষে দাঁড়িয়ে রইল। অসীম লক্ষ্য করল, দোরটা খোলাই রেখে এসেছে। বন্ধ করে এলে অবশ্য আরো অনেক খুশী হত অসীম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করল, তা সম্ভব নয়। একবাড়ি লোকের মুখের ওপর মানসী দরজা বন্ধ করতে পারে না, বরং খোলা রেখে মৌন অনুনয়ে বলতে পারে, 'তোমরা দয়া করে কিছুক্ষণের জন্যে এদিকে কেউ এসো না। আমরা অভদ্রতা করছিনে, তোমরাও অবিবেচক হয়ো না।' এইটুকু যে এসেছে—এই তো মাত্র ও-ঘর থেকে এ-ঘরে—তবু এও কম সাহসের কথা নয়। তাদের সম্পর্কের কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। অসীম মানসীর দাদার পুরোন বন্ধু প্রকাশ্যে এই পরিচয়ের জোরটুকু শুধু আছে। যদিও সেই বন্ধু আর এ বাড়িতে নেই, তার সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্ক শিথিল, শুধু শিথিল কেন একেবারে ছি'ড়েই গেছে। শঙ্করের সঙ্গে অসীমের নিজেরও আর তেমন কোন যোগাযোগ নেই, বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা ক্ষয়ে ক্ষয়ে মুছে মুছে আবার সেই প্রথম দিকের সাধারণ পরিচয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু শঙ্করের বন্ধু এই পরিচয়ই অসীম মুখ ফুটে জোর গলায় বলতে পারে, মানসীর বন্ধু এ কথাটা কিছুতেই বলবার জো নেই, বলবার রেওয়াজ নেই সমাজে।

মানসী আজ পান খেয়েছে। ফিকে হলদে রঙের শাড়িটি চমৎকার মানিয়েছে ওকে। গায়ে কোন গয়না নেই। রজনীগন্ধার ডাঁটার মত পুষ্ট স্বাস্থ্যই ওর সৌন্দর্য। এই মুহূর্তে মানসীকে ভারি সজীব আর সুন্দর

দেখাচ্ছে। যেখানে জীবন সেখানেই সৌন্দর্য সেখানেই রূপ। রূপ নেই শুধু মৃতের আর জীবন্মৃতের।

মানসী বলল, 'কী ভাবছ, কী দেখছ। আবার আর একজন ঘুমের ডিস্টার্ব করতে এল এই তো? আমি এক মিনিট তোমাকে ডিস্টার্ব করে যাব।'

অসীম হাসল, 'মাত্র এক মিনিট? তুমি সারাজীবন ডিস্টার্ব করবার অনুমতি কবে নেবে?'

মানসী সন্তর্পণে একবার দোরের দিকে তাকাল। দেখে নিল কেউ কোথাও আছে কি না। তারপর মৃদু হেসে মধুর গলায় বলল, 'খুব যে গরজ দেখছি। তাই যদি হয় তখন আর অনুমতি নিতে আসব না। বিনা অনুমতিতেই রাধা মূর্তিমতী হয়ে থাকব। মঞ্জুকে অত ডাকাডাকি করছিলে কেন?'

অসীম বলল, 'তার সেজদিকে ডেকে দেওয়ার জন্যে।'

মানসীর খুশী আর লজ্জা অসীম দু'চোখ ভরে দেখে নিল। 'যত সব মন ভোলানো কথা। ডেকে দেওয়ার জন্যে না আরো কিছু। তুমি তো ওর সঙ্গেই দিব্যি গল্প করছিলে।'

কৃত্রিম অনুযোগ আর ঈর্ষার ভঙ্গি মানসী চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলল।

অসীম লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ। ও তো এখনো ফ্রক ছাড়েনি। আজই বুঝি শুধু শখ করে শাড়ি পরেছে। ও সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।'

মানসী সকৌতুকে বলল, 'অত চটছ কেন। আগাগোড়া ইতিহাসটা একবার মনে করে দেখ না। প্রথমে তুমি এলে দাদার বন্ধু হয়ে। কি গুরু-গম্ভীর রাশভারি মুখ। কাছে যেতে ভয় হয়। তারপর আস্তে আস্তে ভয় ভাঙতে লাগল। প্রথমেই আমার নয়, আমার বড়দির আর দিদির। তখন তুমি ওদের সঙ্গেই গল্প করতে ভালোবাসতে। কিন্তু বড়দির বিয়ে হয়ে গেল আর ও রইল উদাসিনী হয়ে। থার্ড চান্স্ আমার। কিন্তু সে চান্স্ চলে যেতে কতক্ষণ। ফোর্থ ফিফ্‌থ্‌দের হাতে—।

অসীম বিরক্ত হয়ে বলল, 'মানসী, তুমি কি এইসব ঠাট্টা-তামাশা করবার জন্যেই আজ আমাকে ডেকে এনেছ?'

মানসী বলল, 'ঠিক তাই। তামাশাটা অর্ধসত্য। সত্যে আর মিথ্যেয় মধুর।'

'মানু!'

দুজনেই চমকে উঠে বাইরের দিকে তাকাল। মাধুরী। ঘর আর দোরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ন যযৌ ন তস্থৌ।

মানসী বলল, 'কি দিদি।'

'তোর একটা ফোন এসেছে।'

মানসী এবার হেসে বলল, 'তা আসুক। তাই বলে তুই অমন কাঠের মূর্তি হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। ঘরে আয়।'

মাধুরী যেখানে ছিল সেখানে থেকেই বলল, 'তুই ফোনটা ধর গিয়ে।'

মানসী হেসে বলল, 'ফোন যখন এসেছে নিশ্চয়ই ধরব। তুই আয় এদিকে। অসীমদার সঙ্গে ততক্ষণ বসে একটু গল্প কর।'

মাধুরী এবার হেসে তরল গলায় বলল, 'আচ্ছা।'

মানসী কথাটা না শুনবার ভান করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল, অসীম তাকে ডেকে বলল, 'তোমরা ফোনও নিয়েছ নাকি? কই দেখলাম না তো?'

মানসী যেতে যেতে আর একবার মুখ ফিরাল। তারপর হেসে বলল, 'আমাদের মনের মত ফোনটাও অদৃশ্য। কী করে দেখবে?'

মাধুরী ততক্ষণ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। বোনের শক্ত হেঁয়ালিটা সেই ব্যাখ্যা করে ভেঙে দিল, 'আমাদের ফোন নয়। দোতলার ফ্লাটে একজন এডভোকেট ভদ্রলোক থাকেন। খুবই ভদ্র। ফোন-টোন এলে ডেকে দেন। দরকার হলে করতেও দেন। কিন্তু অসুবিধে এই কিছুতেই চার্জ নেবেন না।'

অসীম বলল, 'এত ভদ্রতা তো ভালো নয়। বড় সন্দেহজনক।'

মাধুরী অসীমের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'দারোগা হয়েছ কিনা। সন্দেহই তো তোমাদের মূলধন।'

অসীম হেসে বলল, 'তা ঠিক। বোসো, মাধুরী।'

মাধুরী আর দাঁড়িয়ে রইল না। খাটের ধার ঘেঁষে বসল।

অসীমও শুয়ে নেই। অনেকক্ষণ আগেই উঠে বসেছে।

'তারপর মাধুরী, তোমার খবর-টবর বল।'

মাধুরী একটু হাসল, 'আলাপের অবতরণিকা হচ্ছে বুঝি? যখন আমাদের কোন কথা জিজ্ঞেস করবার থাকে না, তখনই খবর জিজ্ঞেস করি। কিসের খবর তুমি চাও।'

অসীম এবার চোখ তুলে মাধুরীর দিকে তাকাল। সকালে যে মুখে বিষাদের আভাস দেখেছিল অসীম, এই পড়ন্ত দুপুরে তাতে যেন একটু কৌতুকের আভা লেগেছে। সন্দেহ নেই দশ বছর আগের সেন্টিমেন্টাল সেই মেয়েটি এখন সিনিক হয়ে গেছে। ওর দুটি চোখ সেই রূপান্তরের সাক্ষ্য দিচ্ছে। পাঁচ বছর ধরে পুলিসের কাজ করে একটু-আধটু চোখ চিনবার ক্ষমতা হয়েছে অসীমের। শুধু চোর-ডাকাতের চোখই নয়, যাদের ওপর দিয়ে চুরি-ডাকাতি হয়ে গেছে তাদেরও। অসীমের মনে হল মাধুরীর মুখে রুক্ষতার

ছাপ পড়তে শুরু করেছে। অনেকদিন ধরে স্কুলে কাজ করছে মাধুরী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাস নিয়েছে, ছাত্রী তাড়না করেছে সমানে। এ কি সেই ক্লান্তিকর জীবিকার ছাপ? না কি সঙ্গহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনের?

একটু চুপ করে থেকে মাধুরী হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা অসীমদা, তুমি ওখানে থিয়েটার-টিয়েটার দেখ?'

অসীম একটু অবাক হয়ে বলল, 'না, ওখানে আর ওসব কোথায় পাব।'

মাধুরী বলল, 'এখানে কিন্তু খুব আছে। জানো, আজ আমিও এক থিয়েটারে নামব।'

'তাই নাকি? কোথায়?'

মাধুরী একটু হাসল, 'এখানেই। এই এখন যেমন দেখছ সন্ন্যাসিনী সেজে রয়েছি, সবাই তাই বলে আমাকে ঠাট্টা করে। সন্ধ্যাবেলায় দেখবে এই সন্ন্যাসিনীই কেমন সেজেগুজে উর্বশী হয়েছে।'

অসীম ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, 'তাই নাকি? পালার নামটা কি?'

মাধুরী বলল, 'নাম আগে শোনাব না, দেখলেই চিনতে পারবে।'

'কিসের চেনাচিনির কথা হচ্ছে দিদি?'

মানসী হাসিমুখে এসে ঘরে ঢুকল।

মাধুরী কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'এই বলছিলাম, আমার বোনটিকে এখনো চেনেনি। কে ফোন করছিল তোকে?'

মানসী বলল, 'বিজনদা।'

অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'সে আবার কোন জন?'

মানসী হেসে বলল, 'তুমি চিনবে না।'

মাধুরীও হাসল, 'আমাদের মানুর অমন দাদা কি দু'জন-একজন যে তোমাকে চিনিয়ে দেবে?'

অসীম গম্ভীর হবার ভঙ্গিতে বলল, 'বুঝতে পেরেছি, জনসঙ্ঘ।'

তার কথা শুনে দুই বোনই হেসে উঠল।

হাসি থামিয়ে মানসী বলল, 'সত্যিই দারুণ ক্ষমতা তোমার।'

অসীম বলল, 'ক্ষমতা আবার কিসের দেখলে?'

মানসী বলল, 'দিদি আজকাল কাতুকুতু না দিলে হাসে না। তুমি তাকে শুধু এলিটারেশনেই হাসিয়েছ।'

মাধুরী বলল, 'বাজে বকিসনে। বিজুদা কী বললেন? মায়া আর নন্দুর মার্কস্ জানতে পেরেছেন?'

মানসী বলল, 'এখনো পারেননি। তবে দু-একদিনের মধ্যেই জানতে পারবেন বললেন।'

অসীম এতক্ষণে বুঝতে পারল। হেসে বলল, 'ও, নন্দুর সেই পরীক্ষার ব্যাপার বুঝি?'

মানসী বলল, 'আর বোলো না। রেজাল্ট-রেজাল্ট করে ও একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে। শুধু আমাদের ওপর ভরসা করে বসে আছে ভেব না। গোপনে গোপনে কতজনকে যে রোল নাম্বার দিয়েছে তার ঠিক নেই। খেয়ে-দেয়ে ফের বোধহয় বেরিয়েছে সেই চেষ্টায়।'

মাধুরী বলল, 'বড্ড বাড়াবাড়ি। পরীক্ষা তো আমরাও এক সময় দিয়েছি। কিন্তু ওর মত এমন ছটফট কেউ করিনি।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ মাধুরীকে ফের যেন একটু বিমর্ষ আর অন্যমনস্ক দেখাতে লাগল।

মানসী তা লক্ষ্য করে বলল, 'জানো অসীমদা, আমি তো আগেই আজকের জন্যে অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিলাম, কিন্তু মেজদিও গোপনে গোপনে তোমার জন্যে স্কুল কামাই করে ফেলল।'

তার এই চটুলতার ফল উল্টো হল। হঠাৎ একেবারে তীরের মত উঠে দাঁড়াল মাধুরী, বোনের চোখে চোখ রেখে তীব্র ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'ইয়ার্কির একটা সীমা আছে মানু। কিন্তু তুই সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস। তুই কি জানিসনে কেন আমাকে স্কুল কামাই করতে হয়েছে? কেন অকারণে আমার ওপর এমন জোরজবরদস্তি চলছে—তুই কি জানিসনে কিছু?'

মাধুরী আর দাঁড়াল না। তীরের মত যেমন উঠে দাঁড়িয়েছিল, তীরের মতই তেমনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অসীম অবাক হয়ে মানসীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'ব্যাপার কি বলতো।'

মানসী গম্ভীর মুখে বলল, 'পরে এসে বলব। আগে ওকে ঠাণ্ডা করে আসি।'

বলতে বলতে সেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় টেনে দিয়ে গেল দরজা। অসীম নিজের মনেই হাসল। এতক্ষণে বুঝি ওর দোর বন্ধ করবার কথা মনে পড়েছে।

অসীম নিজে নিজেই হাসল, 'এবার শূন্য রঙ্গমঞ্চে আমার মৃত সৈনিকের পার্ট। অন্তত ঘুমন্ত সৈনিকের। কিন্তু ঘুম কি আর আসবে?'

আসুক না আসুক, অসীম এবার হাত-পা ছড়িয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

মাথার ওপরে চক্রাকারে সশব্দে ফ্যান ঘুরতে লাগল। খানিক ক্লান্তিতে খানিক আরামে অসীম এবার চোখ বুজল।

'অসীমদা, আপনার চা। অসীমদা!'

অসীম চোখ মেলে দেখল মানসী নয়, মঞ্জু চায়ের কাপ হাতে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কি ব্যাপার।'

মঞ্জু হাসল, 'আপনার চা। বাব্বা, কী ঘুমটাই ঘুমিয়েছেন। কতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছি আপনার সাড়াই নেই।'

অসীম বলল, 'কতক্ষণ মানে, একবার তো মাত্র ডেকেছ।'

মঞ্জু বলল, 'আপনি শুনেছেন একবার তাই বলুন। আমি অনেকবার ডেকেছি। মা বলছিলেন, ডেকে কাজ নেই, ঘুমুচ্ছে ঘুমোক। সেজদি বললে, তাই বলে কি চারটে পর্যন্ত ঘুমোবে?'

অসীম তাড়াতাড়ি উঠে বসল, 'সত্যি চারটে বাজে নাকি?'

মঞ্জু বলল, 'বাজে মানে, মিনিট দশেক আগেই বেজে গেছে।'

অসীম বলল, 'ঈস্, তাহলে তো আর দেরি করা যাবে না।'

'কেন কী হল?'

'পাঁচটার মধ্যে রাইটার্স বিল্ডিংএ যেতে হবে একবার।'

মঞ্জু হাসল, 'আজ আর তাহলে যেতে পারবেন না। হাত মুখ ধুয়ে জামা-টামা পরে বেরোতে বেরোতেই আপনার পাঁচটা বেজে যাবে। চা খান।'

অসীম ভাবল, আজ আর তাহলে কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। অবশ্য দেখা-সাক্ষাৎ করেও যে তার কিছু লাভ হবে তা নয়। যারা তেমন করে বলতে পারে ধরাধরি করতে পারে তাদের হয়। কিন্তু অসীম বহু চেষ্টা করে দেখেছে নিজের কথাটা গুছিয়ে বলবার তার সাধ্য নেই। বরং কি করে আসল কথাটা ঢাকা যায়, নিজের উদ্দেশ্যকে কত কৌশলে গোপন করা যায়, তদবির করতে গিয়ে সেই চেষ্টাই তার বড় হয়ে ওঠে। তখনকার মত নিজেই নিজের তারিফ করে, নিজের পিঠ চাপড়ায়। কারো কাছে সে ছোট হয়নি। আর একটু হলেই হত। কিন্তু নিজের ঝাণ্ডা সে উঁচু রেখেছে। আত্মমর্যাদার পতাকা। কিন্তু ফিরে আসবার পর তার সমস্ত প্রত্যয় আর আত্মপ্রসাদ বিস্বাদে ভরে ওঠে। যখন দেখতে পায় নিজের সহকর্মীদের অনেকেই তাদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে, শুধু সে-ই কিছু করতে পারেনি তখন আর তার অনুশোচনার অন্ত থাকে না। তখন তার আত্মপ্রীতি আত্মহিংসা আত্মহননে গিয়ে পৌঁছোয়। নিজের ওপর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তিরস্কারের চাবুক চালায়। কিন্তু মরা ঘোড়া তাড়নে উঠে দাঁড়ায় না, ছুটেও চলে না, মুখ থুবড়ে পড়ে।

নিজের চাকরি-বাকরির ব্যাপার নিয়ে অসীমের কারো কাছে যাওয়াও যা, না যাওয়াও তাই।

মঞ্জু চলে যাচ্ছিল, অসীম তাকে ডাকল, 'বাঃ তুমি চলে যাচ্ছ যে? আমি কি একা চা খাব নাকি? ওরা কোথায়?'

'সেজদির কথা জিজ্ঞেস করছেন তো?' মঞ্জু হাসল, 'তার এখন অনেক কাজ।'

'কী কাজ?'

মঞ্জু গলা নামিয়ে বলল, 'মেজদিকে সাজাতে হবে যে।'

অসীমের মনে পড়ল তখন মাধুরী নিজের মুখেই উর্বশী সাজবার কথা বলেছিল। সেই সজ্জা নাকি? কিন্তু মাধুরী কিসের যে ইশারা করেছিল তা ভালো করে বুঝতে পারেনি অসীম। কেন যে মানসীর সামান্য পরিহাসে তার দিদি অমন চটে উঠে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাও হেঁয়ালীই রয়ে গেছে। মনে পড়ল, ঘুমের মধ্যে কী একটা স্বপ্নও দেখেছে অসীম: দুই বীরাঙ্গনা ধারালো তলোয়ার দিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতেছে। তাদের মাথায় যাত্রার দলের রাজরানীর মুকুট। পরনে সেকেলে পোশাক আর গয়না। যে যুদ্ধে মেয়েদের সহজাত পটুতা সেই বাক্‌যুদ্ধ ছেড়ে কিসের জন্যে ওরা অসিযুদ্ধে মেতেছে তা বোঝা কঠিন। চারিদিকে আলো জ্বলছে। আসর জমজমাট। সবাই দুটি বাঙালী মেয়ের এই বীরত্ব উপভোগ করছে। শুধু অসীমেরই উদ্বেগের সীমা নেই। সে আসরের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে ওদের থামতে বলছে। জোরে চেঁচাতে পারছে না পাছে আসরসুদ্ধ লোক বিরক্ত হয়ে বেরসিক ভেবে তাকে আসরের বাইরে রেখে আসে। নিঃশব্দে যুদ্ধরতাদের কাছে এগিয়ে যেতে পারছে না পাছে গায়ে তরবারির খোঁচা লাগে। ভারি অস্বস্তিকর অবস্থা। সেই দুই বীরাঙ্গনাই কি মাধুরী আর মানসী? নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাদের মুখ ঠিক মনে পড়ছে না।—সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা ভেবে অসীম নিজের মনেই হাসল। তারপর মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের জন্যে এত সাজসজ্জা মঞ্জু? তোমার দিদিরা সিনেমায় যাবে নাকি?'

মঞ্জু হাসি চেপে বলল, 'আপনি আচ্ছা বোকা। সিনেমায় যাওয়ার জন্যে আবার বড় মেয়েদের কেউ কাউকে সাজিয়ে দেয় নাকি? মেজদিকে পটলডাঙা থেকে আজ দেখতে আসবে।'

অসীম বিস্ময়ের ভান করে বলল, 'ও তাই বল। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।'

মঞ্জু আস্তে আস্তে আরো অনেক কথা ভেঙে বলল। অসীম যদি কাউকে না বলে দেয় তাহলে সে সবই বলতে পারে। বাইরের লোকের কাছে এভাবে সেজেগুজে সঙ-এর মত এসে বসতে মেজদির মোটেই মত নেই। বরং ঘোর আপত্তি আছে। কিন্তু থাকলে কি হবে, বাবা সে আপত্তি মানতে

চান না। তিনি বলেন, 'এই যখন দেশের দস্তুর মেয়ে না দেখিয়ে বিয়ে দেব কী করে।' মা বলেন, 'কতজনকেই তো দেখালে কিন্তু কী হল।' বাবা বলেন, 'তবু চেষ্টা তো করে যেতে হবে। হাত-পা কোলে করে বসে থাকলে কি কেউ সেধে এসে তোমার মেয়েকে চৌদোলায় চড়িয়ে নিয়ে যাবে? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। যতদিন মেয়েরা আইবুড়ো আছে তার বর খুঁজে দেওয়া বাপ-মার কর্তব্য।' মা যতই তর্ক করুন ঝগড়া করুন বাবার সঙ্গে এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত তাঁর মতের মিল হয়ে যায়। দুজনে মিলে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করেন, চিন্তা করেন, আলাপ-আলোচনা করেন, মহা ঝগড়া থাকলেও মেজদির বিয়ের ব্যাপারে তাঁরা নিজেদের মধ্যে ফের ভাব করে নেন।

অসীম হেসে বলল, 'ভালোই তো, তবু নিজেদের মধ্যে ভাব করবার একটা স্থায়ী উপায় তাঁরা খুঁজে নিয়েছেন।'

মঞ্জু বলল, 'তা নিয়েছেন। কিন্তু মেজদির যে প্রাণ যায়। ভদ্রলোকেরা, যাঁরা দেখতে আসেন, এত অসভ্য—সঙ্গে আবার মেয়েদের নিয়ে আসেন, তাঁরা ভিতরে গিয়ে চুল খসিয়ে হাঁটিয়ে হাসিয়ে কতরকম করে দেখেন—বিশ্রী। সে দেখার ধরন দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। কোথায় মেয়েরা মেয়েদের দুঃখ বেশি করে বুঝবে তা নয়, তারাই বেশি করে যাচাই বাছাই করে, তারাই বেশি করে বাজিয়ে নিতে চায়।'

মঞ্জুর ভারিক্কিপনা দেখে অসীম হেসে বলল, 'দুদিন বাদে তোমাকেও তো সবাই অমনি করে বাজিয়ে নেবে মঞ্জু। কি করে বাজতে হয়, এখন থেকে শিখে রাখো।'

মঞ্জু বলল, 'ঈস্, আমাদের বেলায় আর ওসব খাটবে না। কেউ এসে যে দোকানের জিনিস দেখবার মত আমাকে দেখে যাবে তা আমি কিছুতেই হতে দেব না। মেজদিও দিতে চায় না। খুব রাগ করে, ঝগড়া করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একেকবার বাবা-মার মুখের দিকে চেয়ে রাজী হয়ে যায়।'

ওদিকের ঘরের ভিতর থেকে মানসীর গলা শোনা গেল, 'মঞ্জু, এদিকে আয় এখন, আর কত বক বক করবি।'

মঞ্জু অভিযোগের সুরে বলল, 'জানেন অসীমদা, এ-বাড়িতে বক বক সবাই করে। আবার বেশি কথা বলার জন্যে সবাই সবাইকে ধমকায়।'

অসীম হেসে উঠল, 'তাই নাকি? চমৎকার বলছো তো মঞ্জু।'

আবার ভিতর থেকে ডাক এল, 'মঞ্জু!'

এবার আর দিদির নয়, মায়ের গলা। মঞ্জু ছুটে পালাল।

অসীম উঠে বসল। বয়সের তুলনায় শুধু গড়নই বাড়ন্ত নয়, মনটাও পরিণত হয়েছে মঞ্জুর। অন্তত মুখে তো বেশ পাকা পাকা কথা বলে। কিন্তু ওর দোষ কি। যে পরিবেশে থাকে, যা দেখে শোনে, তাই তো

শেখে। আমাদের দেশের মেয়েরা যে মায়ের পেট থেকে পড়েই পূর্ণ-যৌবনা আর হামাগুড়ি দিতে শুরু করে প্রৌঢ়া হয়ে যায় না, সেই তো আশ্চর্য।

এবার তার কি করা উচিত, অসীম স্থির করতে চেষ্টা করল। এদের তো এখন দেখাদেখির পালা চলবে। ঠিক এই সময় বাইরের কোন লোকের ভিতরে না থাকাই ভালো। পাত্রপক্ষ এসে যদি জানতে চান, এ-বাড়ির সঙ্গে অসীমের সম্পর্কটা কি, কেউ সদুত্তর দিতে পারবে না। এ-সমাজে আত্মীয়তার সংজ্ঞা আছে, স্বীকৃতিও আছে, বন্ধুত্বের নেই।

কিন্তু এই মুহূর্তে কোথায় যায় ভেবে পাচ্ছে না অসীম। এত বড় কলকাতা শহরে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। অন্তত ছিল না। কিন্তু কয়েক বছর বাইরে বাস করার ফলে কলকাতা তার কাছে অন্য দেশের এক অচেনা শহর বনে গেছে। যার সঙ্গে যত সম্পর্কের সূত্র ছিল, সব আজ ছেঁড়া-ছেঁড়া। ফের গিঁট বাঁধতে চেষ্টা করে দেখেছে অসীম। কিন্তু গিঁট আঁটেনি, সব ফসকা গেরো। কলকাতার মানুষ সবাই কর্মব্যস্ত, যার কাজ নেই, তারও কাজের চেষ্টা আছে, কাজের ভাব আছে। মধু আহরণরত সবাই যেন সেই ব্যস্ত মৌমাছি। কারোরই দাঁড়াবার সময় নেই, কথা বলবার সময় নেই, অন্য কারো জন্যে একটু ভাববার সময় নেই। শুধু নিজেকে নিয়েই নিজের জগৎ। নিজের হাত-পা, নাক-চোখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, নিজের বাসনা-কামনা, অর্থ-যশ, বিষয়-সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র। এই নিয়ে পুরো একটি ব্রহ্মাণ্ড। অথচ আদর্শে সবাই সমাজবাদী। কিন্তু ভিতরের সামাজিক মানুষটিই শুধু বাদ পড়ে যাচ্ছে। সমুদ্রে অপরিমিত জল, কিন্তু তার এক ফোঁটাও পেয় না, জনসমুদ্রের মানুষও তেমনি—তা শুধুই জনতা।

অসীম বেরোবার উদ্যোগ করছে শুনে মানসী ফের কাছে এল। বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি চলে যাচ্ছ যে।'

অসীম বলল, 'থেকেই-বা কি হবে। তাছাড়া নিজেরও তো কিছু কাজকর্ম আছে।'

মানসী বলল, 'থাক, কাজের দোহাই আর তোমাকে দিতে হবে না। তুমি যে কত কাজের লোক, তা আমার জানা আছে। কাজের জায়গা থেকে ছুটি নিয়েই তো এসেছ। আবার কাজ কিসের।'

অসীম বলল, 'যাই, বন্ধুবান্ধবদের খোঁজখবর নিই গিয়ে।'

মানসী বলল, 'মানে মিছামিছি ঘুরে বেড়ানো। বরং এখানে থাকলেই একটু কাজ হবে। জানো মেজদিকে আজ আবার একদল দেখতে আসছে।'

অসীম বলল, 'শুনেছি।'

মানসী হেসে বলল, 'মঞ্জু বোধহয় কিছু আর বাকি রাখেনি। তাহলে

তো সব শুনেইছ। তাহলে তো বাইরে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে এখানেই তোমার থেকে যাওয়া উচিত।'

অসীম একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'এখানে আবার আমার কি কাজ। তোমরা মেয়ে দেখাবে, তাঁরা এসে দেখবেন, মাঝখানে তো আমার কোন ভূমিকা নেই।'

মানসী বলল, 'কেন, তুমি তাঁদের সামনে উপস্থিত থেকে আদর-আপ্যায়ন করবে। মেজদির গুণের বর্ণনা-টর্ণনা করবে। কাজ করতে চাইলে কি আর কাজের অভাব আছে সংসারে?'

অসীম বলল, 'তা অবশ্য নেই। কিন্তু যারা অকর্মণ্য, তাদের হাতের গুণে সৎকাজও অপকর্ম হয়। আমার মুখ থেকে তোমার মেজদির কোন প্রশংসা বেরোলে তা বরং bad publicity হবার আশঙ্কা আছে।'

মানসী লজ্জিত হয়ে বলল, 'তুমি আজকাল ভারি অসভ্য হয়েছ। মুখে আর কিছু আটকায় না। এ বোধহয় পুলিস লাইনে ঢুকবার ফল।'

অসীম বলল, 'মানে তুমি বলতে চাও যারা অন্যকে বাঁধে, তাদের নিজের কোন বাঁধন নেই।'

মানসী বলল, 'নেই-ই তো।'

কোন অর্থে বলল, তা ঠিক স্পষ্ট বোঝা গেল না।

এই অল্প জায়গা। আরো একদল বাইরের লোক আসছেন। মানসী যাই বলুক, অসীমের আর এখানে থাকা সঙ্গত নয়। মনোমোহনবাবুরা মুখে কিছু না বললেও ভিতরে ভিতরে হয়তো বিব্রত বোধ করবেন। সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হবে মাধুরী। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যাকে দর্শন দিতে হচ্ছে, রুচির বিরুদ্ধে সাজতে হচ্ছে প্রিয়দর্শনা। কিন্তু আগাগোড়া সব ব্যাপারই কি মাধুরীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে? তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, সে নিজে রোজগার করে, তার একটা স্বাধীন মতামত আছে। সে যদি বেঁকে বলে বসে, 'না, আমি বিয়ে করব না, অন্তত এই ধরনের ঘটকালির বিয়ে নয়, আমি নিজে দেখা দেব, আমাকে দেখাতে দেব না, শুভ হোক, অশুভ হোক, যা ঘটবার আমি নিজেই ঘটাব,' তাহলে কি কেউ তাকে জোর করে বিয়ে দিতে পারে? মাধুরী যদি জোর করে একবার 'না' বলতে পারে, তাহলে বিয়ের আলাপ-আলোচনাও সব বন্ধ হয়ে যায়। যেমন মানসী সব বন্ধ করে রেখেছে। সে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, বিয়ে করবে না। এই নিয়ে তাকে যেন কেউ বিরক্ত করতে না আসে। তার সেই একটি 'না'তেই কাজ হয়েছে। কিন্তু মাধুরীর বোধহয় তত মনের জোর নেই। তার মন এখনো দ্বিধা-দুর্বল। যে এই দৌর্বল্য দূর করতে পারে, সব সংশয় ঘুচাতে পারে, তেমন কারো দেখা কি মাধুরী জীবনে পায়নি? তেমন কারো কণ্ঠ শোনেনি, যার কথার ওপর সে

নির্ভর করতে পারে? না কি পেয়েও হারিয়েছে? যদি হারিয়ে থাকে, কার দোষে? তার, না মাধুরীর নিজের?

মানসীকে বাদ দিয়ে তার দিদির খোঁজখবর নিতে প্রবৃত্ত হয়েছে বলে অসীম নিজেই এক সময় হাসল। এই অনুসন্ধিৎসা চাকরির ক্ষেত্রে লাগাতে পারলে তার পদোন্নতি হত, অন্তত পুরস্কার, পারিতোষিক মিলত। কিন্তু দোকানদারদের মন আর আচার-আচরণ নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে গেলে তার মাথা ধরে যায়। হাত-পা অনড় হয়ে আসে। তার অমনোযোগ আর নৈষ্কর্ম্যের সুযোগ নিয়ে যারা নিচের ধাপে ছিল, সেই এ-এস-আই মুকুন্দ রায় আর সদানন্দ জানা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তার বিরুদ্ধে ফিস্‌ফিস্ ফুস্‌ফুস্ লেগেই আছে ওদের। চোর-ডাকাতের চেয়েও বেশি ভয় অসীমের ওই দু'জন সহকর্মীকে। কখন যে উঁচু চেয়ার থেকে তাকে ওরা ঠেলে ফেলে দেয়, কি টেনে নামিয়ে আনে, সেই আশঙ্কায় অসীম সদাশঙ্কিত। যে কর্ম-ক্ষেত্র সে ভালোবাসে না, সেখানেও অপদস্থ হতে তার ইচ্ছা নেই। সেখানেও নিজের পদ আর ভুঁয়ো প্রতিষ্ঠাকে সে আঁকড়ে থাকতে চায়। কোন কোন মেয়েকে সে দেখেছে, স্বামীর ঘরে যার সুখ নেই, কিন্তু ঘরের বাইরের অচেনা পৃথিবীকে বড় ভয়। সেই ভয়ে তারা সতী, ভালোবাসায় নয়। অসীমের অবস্থাও কি তেমনি? কিন্তু কিসের এত ভয় তার? মাঝে মাঝে অসীম নিজেকে উৎসাহ দেয়, উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করে। কিসের এত ভয় তার? লীলাকে বিয়ে দেবার পর তার আর কোন পারিবারিক দায়িত্ব নেই, নিজেকে ছাড়া আর কাউকে পোষণ করবার দায়ও তার নেই। তার মত মুক্ত পুরুষ আর কে আছে? সে ইচ্ছা করলে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পৃথিবীর যেখানে খুশী সেখানে চলে যেতে পারে। আর কোন কাজ যদি খুঁজে না-ও পায়, দু-একটা টুইশন সম্বল করে স্বাধীনভাবে দিন কাটাতে পারে অসীম। কিন্তু সেই স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের সাহসটুকু অসীমের নেই। বেকার হবার চেয়ে অপছন্দ-করা এক কাজের চাকার সঙ্গে নিজেকে সে বেঁধে রাখবে সে-ও যেন ভালো। মাধুরীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মাধুরীও হয়তো নিরুপায় হয়ে কোনরকম একটা সংসার চায়, যে-কোন রকম একজন পুরুষের স্ত্রী হতে চায়, সিঁথিতে সিঁদুর পরে ঘুচিয়ে দিতে চায় আইবুড়ো নাম। কে জানে, ভিতরে ভিতরে মাস্টারী আর বাপের সংসার নিয়ে মাধুরীও হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সে-ও এখন মুখ বদলাতে চায়। যদি তাতে জীবনে কোন নতুন স্বাদ আসে।

মাধুরী মনে মনে ঘর খোঁজে, কিন্তু অসীমের সন্ধানের বস্তু দু'টি। বাসের ঘর আর একটি কাজের ঘর। একটি নারীর মন, আর নিজের মনঃপূত একটি কাজ। কোন্‌টা প্রথম, কোন্‌টা প্রধান? বলা বড় কঠিন। নিজের

মন একেক সময় একেক কথা বলে। কখনো মনে হয়, 'ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা।' আর কিছু চাই না। শুধু একজনের মন পেলেই জীবন ধন্য। কখনো মনে হয়, মন-টন সব বাজে। আসলে কাজের জায়গা, সে-জায়গা যতই ছোট হোক, সেখানকার যশের মধ্যেই জীবনের সব রস ভরা রয়েছে। মনোরমা, নিজের মনোবৃত্তির অনুসারিণী একটি নারীর চেয়ে নিজের মনঃপূত একটি কাজ খুঁজে পাওয়া সংসারে কম কঠিন নয়।

'তুমি তাহলে সত্যিই বেরোচ্ছ বাবা?'

মনোমোহনবাবু ফের এসে দাঁড়ালেন দরজায়।

'সত্যিই' কথাটার ওপর বেশি ঝোঁক পড়ায় অসীম তাঁর মনের ইচ্ছাটা বুঝতে পারল। সে এখন কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে থাকে, মনোমোহনবাবু তাই চান। ভিন্ন জাতের নিঃসম্পর্কীয় একটি যুবক তাঁর ঘর আগলে বসে থাকুক, এটা তাঁর কাম্য নয়।

বেরোবার জন্যে অসীম তো নিজেই তৈরি হচ্ছিল, তবু এই নির্দেশটুকু দেওয়া কেন।

অসীম মনে মনে বেশ ক্ষুণ্ণ হল। সারা দুপুর ভরে এঁদের আদর-আপ্যায়নের কথা এই মুহূর্তে তার আর মনে রইল না।

অসীম মুখে একটু হাসি টেনে বলল, 'বেরোচ্ছি, মানে এবার যাচ্ছি মেসোমশাই। আপনারা অনেক কষ্ট করলেন। নন্দু কোথায় গেল। তাকে দয়া করে একটু বলে দিন, একটা গাড়ি-টাড়ি ডেকে দেবে। একটা রিক্সা-টিকসা হলেও হয়। শুধু স্যুটকেশ আর বিছানাটা—।'

মনোমোহন বাধা দিয়ে বললেন, 'আরে না না না। বাক্স-বিছানা নিয়ে এই সন্ধ্যাবেলায় তুমি কোথায় যাবে? তা হয় না অসীম। তুমি অন্তত আজ রাতটা এখানে থাকবে। তারপর কাল সকালে যা-হয় কোরো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। অনেক দরকারি কথা। এখনো কিছুই বলতে পারিনি।'

অসীম বলল, 'বেশ তো মেসোমশাই, আমি আরো দু'দিন কলকাতায় আছি। এক ফাঁকে সময় করে এসে আপনার সব কথা শুনে যাব।'

নিজের অনুরোধ-উপরোধে সুবিধা হবে না বুঝতে পেরে মনোমোহন মেয়েদের শরণ নিলেন, 'ও মানসী, ও মঞ্জু, শোন এসে অসীম কি বলছে। ও এখনই চলে যেতে চায়।'

সুহাসিনী মাধুরীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করাচ্ছিলেন, যাতে সে ভালো শাড়ি আর গয়না-টয়না দু-একখানা পরে, মনোমোহনের হাঁক-ডাক শুনে বাইরে এলেন। অসীম চলে যাচ্ছে শুনে বললেন, 'সে কি হয় বাবা। তুমি

আজই চলে যেতে পার না। বেশ তো বাইরে তোমার দরকার থাকে, তুমি সেসব সেরে এসো। রাত এগারোটা হোক, বারোটা হোক, কোন অসুবিধে নেই। আমরা অনেক রাত অবধি জেগে থাকি।'

অসীম বলল, 'আচ্ছা মাসীমা, দেখব যদি আসতে পারি।'

তার কাছ থেকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আদায় করবার জন্যে মানসী আবার একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিল। তারপর অসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে কৈফিয়ৎ চাইবার ভঙ্গিতে বলল, 'হঠাৎ তোমার মত পাল্টাবার কারণটা কি। আমরা যথেষ্ট আদরযত্ন করতে পারিনি তাই?'

অসীম বলল, 'বরং উল্টো কারণটাই সত্যি। বড় বেশি আদরযত্ন করেছ। আমার মত বাউণ্ডুলে মানুষের এত বেশি যত্ন সহ্য হয় না।'

মানসী বলল, 'অন্য জায়গায় তোমার থাকাটাকা হবে না। তুমি কথা দিয়েছ, এখানে থাকতে হবে তোমাকে। ভেবেছিলাম, যে-কোন ভাবেই হোক একবার বেরোব, একটু ঘোরাঘুরি যাবে। কিন্তু মেজদিকে—। বুঝতেই তো পারছ।'

অসীম বলল, 'ছি ছি ছি, তুমি কি তাই ভেবেছ নাকি? আমি কি সেইজন্যেই—।'

মানসী বললে, 'না-না, তা ঠিক নয়। আমি জানি তুমি মোটেই অবুঝ নও। অবুঝ হলে কি আর এতদিন ধরে কেউ—।'

অসীম বলল, 'ওসব কথা থাক মানসী।'

মানসী বলল, 'তাহলে কথা দিয়ে যাও, একটু ঘুরেটুরে ফের আসবে। আমার তো মনে হয়, রাত আটটার মধ্যে সব ঝামেলা মিটে যাবে। তখন—।'

মানসী একটু হাসল।

ওই এক ফোঁটা হাসির মধ্যে যেন অনন্ত সম্ভাবনার সিন্ধু ধরা রয়েছে।

অসীম তবু বলল, 'তখন কি—।'

মানসী বলল, 'যাও আমি জানিনে কিছু। যাই মেজদি কতটা কি করল দেখে আসি গিয়ে। আচ্ছা মেয়ে একখানা। বলে, আমি যেভাবে আছি সেই-ভাবেই থাকব। যারা দেখবার, তারা আমাকে এভাবেই দেখে যাবে। এত খামখেয়ালী।'

'তাই নাকি? তোমার চেয়েও?'

মানসী বলল, 'বাজে কথা বোলো না। আমি মোটেই দিদির মত নই। আমি অমন একবার এগোই, দুবার পিছোই না।'

অসীম বলল, 'এগোন-পিছোন তোমারও আছে। তবে তা অন্য ধরনের।'

মানসী বলল, 'যত বাজে কথা।' তারপর প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল. 'মেজদি কি বলছে জানো? তুই আমার হয়ে আজকের মত একটা প্রক্সি

দিয়ে দে। মানে যাঁরা দেখতে আসছেন, মেজদির হয়ে আমিই তাঁদের দর্শন দিই।'

অসীম বলল, 'বেশ তো তাই দাও না।'

মানসী হেসে বলল, 'মুখে বলছ বটে। কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি দেখা দিই আর একজন হিংসেয় বুক ফেটে মরে যাবে।'

একজনের হিংসা হবে, সেই সম্ভাবনায় আর একজনের আনন্দটুকু লক্ষ্য করতে করতে অসীম বাইরে এল।

মানসী পিছন থেকে ফের একবার ডেকে বলল, 'শোন, ভালো কথা, বেরোচ্ছই যখন দাদার একবার খোঁজ নিয়ে এসো না!'

'কার? শঙ্করের?'

মানসী বলল, 'হ্যাঁ, এই তো কাছেই বরানগরে থাকে। যাতায়াতের পথে, ইচ্ছা করলেই একবার আসতে পারে। কিন্তু ভুলেও এ-পথ মাড়ায় না। তুমি দেখ না একটু চেষ্টা-টেষ্টা করে বাপ-ছেলের মধ্যে ফের মিটমাট করিয়ে দিতে পার কিনা। যদি পার—বুঝতেই তো পারছ, যদি পার আমি তাহলে রেহাই পাই।'

অসীম মানসীর দিকে চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু সে ততক্ষণে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। এই প্রগল্‌ভা অকুণ্ঠিতা মেয়েটির এমন লজ্জা দেখে অসীম নিজের মনে হাসল। বুঝতে পেরেছে বই কি। অসীম সবই বুঝতে পেরেছে। এই পারিবারিক দায়িত্ব আর কর্তব্যের গহন অরণ্য থেকে নিজের পথটুকু বের করে আনতে চায় মানসী। সেই জন্যেই বড় বোনের বিয়ের ঘটকালিতে ওর এত গরজ। সেই জন্যেই বাপের সঙ্গে ভাইয়ের এই পুনর্মিলন ঘটাবার চেষ্টা। এই পারিবারিক বন্ধন থেকে এখন মুক্তি চায় মানসী আর-একটি নতুন বন্ধনের ভূষণ নিজের অঙ্গে পরবে বলে।

মানসীর কাছ থেকে তার দাদার ঠিকানাটা চেয়ে নিয়ে অসীম এবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বাস-স্টপটার দিকে এগোতে এগোতে লক্ষ্য করল মেয়ে-পুরুষে ভরতি একখানা ট্যাক্সি মানসীদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অসীম এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর ট্যাক্সিটার দিকে আর না তাকিয়ে বাস-স্টপের দিকে এগিয়ে গেল।

বাসে দাঁড়াবার জায়গা আছে, কিন্তু বসবার আসন একটিও খালি নেই। আশেপাশের কয়েকজন সহযাত্রী শুধু সঙ্গী নয় অসীমের একেবারে অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছেন। বিশ্রী একটা গন্ধ বার বার নাকে আসছে। হতে পারে এ

গন্ধ ঘামের—যে ভদ্রলোক ঈষৎ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর মুখগহ্বরের কিংবা আর এক ভদ্রলোকের হাতে যে একটি পুঁটুলি ঝুলছে তারই আঁশটে গন্ধ। দাঁড়িয়ে যেতে যেতে শুধু বাসের গতিটাই অনুভব করছে অসীম, মাঝে মাঝে আকস্মিক ঝাঁকুনিতে সেই অনুভূতির তীব্রতা বাড়ছে, কিন্তু এই অপূর্ব রথ থেকে পথও দেখবার জো নেই—পথের দুদিকে কি আছে না আছে তা-ও আর চোখে পড়ছে না। অসীমের মনে হল এরই নাম জনতা, জনগণের তাল। এই ভিড়ের মধ্যে থেকেও এদের প্রত্যেকেই অসীমের মতই স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ এবং আত্মচিন্তায় মগ্ন। এ ছাড়া উপায় নেই। মানুষ একই সঙ্গে একক এবং দশজনের সঙ্গে দশজনের মধ্যে একজন। বাকি ন'জনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কখনো প্রতিযোগিতার, কখনো ঔদাসীন্যের, কখনো সহযোগিতার। এই ন'জনের মধ্যেও কেউ আত্মীয়, কেউ বন্ধু, কেউ শত্রু, কেউ একেবারে কেউ না। নারী আর পুরুষের সম্পর্কের মত ব্যষ্টি আর সমষ্টির সম্পর্কও বিচিত্র আর জটিল। সে সম্পর্ক পরিবারের মধ্যেই হোক, সমাজেই হোক আর রাষ্ট্রেই হোক তার জটিলতা কোনদিনই উন্মোচিত হবে না। এক গিঁট খুলবে, আর একটি গিঁট পড়বে। যতদিন সমাজ আছে, সংসার আছে এই গিঁট খোলা, গিঁট বাঁধার পালা চলতেই থাকবে। কারণ এই গ্রন্থির মধ্যেই যত রস যত রহস্য।

হঠাৎ অসীমের দার্শনিকতা বাধা পেল। এতক্ষণ মনশ্চক্ষে একটি তত্ত্বকে দেখছিল, এবার প্রচণ্ড গোলমাল শুনে দুটি চোখ ফের সহযাত্রীদের দিকে খুলে ধরতে বাধ্য হল।

সেই মাছের পুঁটলিটা নিয়েই গোলমাল শুরু হয়েছে। মৎস্যরসিকের পাশের ভদ্রলোক আঁশটে গন্ধ পছন্দ করেননি। তিনি বললেন, 'আরে মশাই, আপনার পুঁটলিটি সরিয়ে রাখুন। বার বার আমার জামায় এসে লাগছে।'

যাঁর হাতে মাছ, তিনি প্রথমে না শুনবার ভান করছিলেন; দ্বিতীয়বার শুনেও কথা বলেননি, তৃতীয়বার আর প্রতিবাদ না করে পারলেন না। 'জামা জামা আপনার এক বাতিক হয়েছে। আপনার জামায় মোটেই লাগেনি, আমার খেয়াল আছে।'

ভদ্রলোক চটে উঠলেন, 'কি বললেন, বাতিক? জামা গায়ে দেওয়াটা যদি আমার বাতিক হয়, এই বাসের ভিড়ের মধ্যে অমন পচা মাছের থলি নিয়ে যাওয়া তার চেয়েও খারাপ বাতিক।'

মাছকে পচা বলায় মাছের মালিক রীতিমত অপমানিত বোধ করলেন। যিনি পচা বলেছেন, তাঁর নাকের সামনে থলিটা উঁচু করে ধরে বললেন, 'একবার শুঁকে দেখুন পচা না টাটকা। তিন টাকা সেরের পোনা, পচা বললেই হল! মাছ থেকে মাছের গন্ধই বেরোয়, আলু-পটলের গন্ধ বেরোয় না।'

যাঁর নাকের ওপর কটাক্ষ করা হয়েছে, তিনি চোখ-মুখ বিকৃত করে মারমূর্তি ধরলেন, 'তোমার এত বড় স্পর্ধা, ওই পচা রাবিশগুলি আমার মুখের সামনে নিয়ে এসেছ। তোমার ওই মাছের পুঁটলি আমি যদি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই, কে কি করতে পারে।'

পুঁটলির মালিক বললেন, 'একবার দেখই না ছুঁড়ে। হাত দিয়ে দেখ না একবার।'

হাত দিলে নিশ্চয়ই কুরুক্ষেত্র হয়ে যেত। কিন্তু আর পাঁচজনের হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হল। পিছন থেকে কে একজন বললেন, 'বাধা দিলেন কেন, বেশ তো চলছিল। কে বলে বাঙালীর জীবনে বৈচিত্র্য নেই। আমি রোজ এই বাসে যাতায়াত করি, আর নিত্য নতুন মজা দেখতে দেখতে যাই।'

আর একজন সহযাত্রী বললেন, 'আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই। এদিকে খুনোখুনি হয়ে যায়, আর আপনি মজা দেখছেন। গোলমাল আরো পাকালে বাসটা আর চলত না সে খেয়াল আছে?'

দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী একটু দূরে দূরে থেকে এখনো পরস্পরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে চলেছেন। তা দেখে আর একজন বিবেচক ভদ্রলোক বললেন, 'আরে যেতে দিন যেতে দিন। কয়েক মিনিট পরে কে কোথায় চলে যাবেন তার ঠিক নেই। কারো সঙ্গে কারো দেখাই হবে না। একথা যে মানুষ কেন ভুলে যায়, আমি বুঝতে পারি না। বাসটা যে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জায়গা নয়—।'

তাঁর পাশের প্রৌঢ় যাত্রীটি বাধা দিয়ে বললেন, 'আরে মশাই, স্থায়ীভাবে বাস করতে তো এই সংসারেও কেউ আসেনি। দুদিনের মেয়াদের কথা কে না জানে? তবু কি কেউ ঝগড়াঝাঁটি লাঠালাঠি করতে বাকি রাখে?'

দুই সহযাত্রীর মধ্যে তত্ত্বালোচনা চলতে লাগল।

অসীম লক্ষ্য করল তার মত বেশিরভাগ যাত্রীই আত্মচিন্তায় বিভোর, বাসের মধ্যে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে নিস্পৃহ, নিষ্ক্রিয়।

ট্রামে-বাসে যাতায়াতের সময় চার জাতের যাত্রীকে দেখেছে অসীম। একটু কিছু হলেই যারা উত্তেজিত হয়। কথা কাটাকাটি থেকে মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত যারা করে ফেলতে পারে। দ্বিতীয় জাতের লোক বিচার করতে আসে, মীমাংসা করতে আসে। কিছুতেই চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তারা সক্রিয় সংস্কারক। আর এক শ্রেণীর মানুষ বসে বসে মজা দেখে, না হয় তত্ত্বালোচনা করে। চতুর্থ শ্রেণীর লোক সেটুকুও করে না। যতক্ষণ না তাদের নিজের গায়ে ব্যথা লাগে, ততক্ষণ তাদের মনে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় না। অসীম নিজে এই শ্রেণীর মানুষ। এই নিষ্ক্রিয় স্বভাবের জন্যে নিজেকে সে ঘৃণা করে। তবু সক্রিয় হওয়া তার সাধ্যের অতীত। জাত বদলানো জন্ম

বদলাবার মতই কাল্পনিক ব্যাপার। তা নিয়ে শুধু জল্পনা করা যায়, আর কিছু করা যায় না।

বরানগরের মোড়ে নেমে মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটতে হল। এক ভদ্রলোককে বাড়িটার নিশানার কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'এই তো কাছেই। এর জন্যে আবার বাসে উঠবেন কেন, হেঁটে যান। বাসে গিয়ে সুবিধা হবে না।'

সুবিধা থাকলেও বাসে উঠত না অসীম। লোকের চাপে পিষ্ট আর পিণ্ডাকৃতি হয়ে এতক্ষণ যেভাবে এসেছে তার চেয়ে নিজের প্রত্যঙ্গগুলির সাহায্য নেওয়া ভাল। এর চেয়ে মফঃস্বলের সেই দ্বিচক্র যানটিও মন্দ নয় অসীমের। ভিড় নেই চাপ নেই শরিক নেই। সেই রথের সে নিজেই রথী নিজেই সারথি।

ও অঞ্চলে সাইকেল ছাড়া দ্বিতীয় যে দিব্যযান আছে, তার নাম গরুর গাড়ি। সে গাড়িতে পারতপক্ষে অসীম ওঠে না। সাইকেলই চালায়। এই একটিমাত্র পরিশ্রমের কাজ সে করতে পারে। এতে তার ক্লান্তি নেই। অফিসের কাজ ছাড়াও সে বেরোয়। বরং তাতেই আনন্দ বেশি। সেই ভ্রমণেই দর্শন আর মনন চলে। চাউলের চোরা-কারবারের তদন্তের সময় সেসব অচল।

জনবিরল জায়গাটা আস্তে আস্তে সয়ে গেছে অসীমের। অনুর্বর পাহাড়ী অঞ্চলের শান্ত নির্জন গাম্ভীর্য তার প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে গেছে। মানসী যদি কখনো সেখানে বেড়াতে যায়, হয়তো তার ভালোই লাগবে। কয়েকটা দিন কলকাতার হট্টগোলের বাইরে গিয়ে তার কান জুড়াবে, চোখ জুড়াবে। আর যদি স্থায়ীভাবে সেখানে বাস করতে রাজী হয় মানসী? না তা সে কখনোই হবে না। এই পাণ্ডববর্জিত গ্রাম, যেখানে রেডিও নেই, সিনেমা নেই, ট্রাম-বাস, সভ্যতা সংস্কৃতির বিদ্যুৎদীপ্তি নেই, সেই গণ্ডগ্রামের অন্ধকারে মানসীর মত নাগরিকা যেতে রাজী হবে কেন। কে জানে অন্য আপত্তির চেয়ে মানসীর হয়তো পাড়াগাঁয়ে যাওয়ার আপত্তিটাই বড়, দুর্নীতি দমনের দারোগার গৃহিণী হওয়ার লজ্জাটাই প্রধান। মানসী যে তার জীবিকা পছন্দ করে না তা জানতে তো অসীমের আর বাকি নেই। নিজের কাজকে অসীম নিজেও ভালোবাসেনি। হয়তো সেই জন্যেই মানসী অপছন্দ করতে সাহস পেয়েছে। এই সংসারে যে নিজে সগর্বে বুক ঠুকে বলতে পারে, আমি যা করেছি তাই ভালো, আমি যা হয়েছি তার চেয়ে মহত্তর কিছু আর নেই, আমি যা কিছু বলি তাই সবচেয়ে সারবান, সে-ই জয়ী হয়। তার দর্পকে যাচাই করবার সাহস অনেকেরই থাকে না। আর যে নিজে ভীরু, নিজের দীনতায় নিজেই কুণ্ঠিত, সংকুচিত তাকে সবাই কোণঠাসা করে। পৃথিবীতে কোথাও তার জায়গা হয় না। কেউ তাকে ঠাঁই দেয় না। না ঘরে না হৃদয়ে। লজ্জা মেয়েদের ভূষণ, আর অহংকার পুরুষের অলংকার। তা যদি শূন্য কুম্ভের ঝংকার হয় তাতেও ক্ষতি নেই।

বাড়িটা নতুন। একতলায় খোঁজ নিয়ে অসীম শুনল শঙ্কর মুখুজ্যে দোতলায় থাকে। উঠে গিয়ে কড়া নাড়তেই পুরোন বন্ধু বেরিয়ে এল। দেখতে আগের চেয়ে মোটাসোটা হয়েছে শঙ্কর। শুধু পুষ্ট নয়, হৃষ্টও। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি। বোধহয় বেরোবার উদ্যোগ করছিল। এক মুহূর্ত দেরি হলে অসীম আর ওর নাগাল পেত না।

শঙ্কর প্রথমে একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর হেসে বলল, 'আরে তুমি। এসো ভিতরে এসো। কবে এলে।'

অসীম বলল, 'আজই।'

'আজই! কোথায় উঠেছ?'

'বেলগাছিয়ায়। তোমাদের পুরোন বাড়িতে।'

শঙ্করের মুখ মুহূর্তের জন্যে ছায়াচ্ছন্ন হল। কিন্তু পরক্ষণেই সে হেসে বলল, 'বুঝেছি। মানসীর অনুরোধে?'

অসীম লক্ষ্য করল চশমার আড়ালে শঙ্করের চোখ দুটিও পরিহাসে তরল হয়ে উঠেছে। প্রথমে একটু বিব্রত আর লজ্জিত হল অসীম, তারপর যেন সেই লজ্জা আর ভীরুতাকে ঢাকবার জন্যেই আরো স্পষ্ট গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ও স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিল।'

শঙ্কর তেমনি তরল স্বরে বলল, 'তাই নাকি? তাহলে তো ওর সাহস আর বাবার উদারতা দুই-ই বেড়েছে দেখছি। বেশ বেশ। শুনে খুব খুশী হলাম। আমিও এই চাই। আমার বেলায় বাবা অবশ্য এই ঔদার্যের পরিচয় দিতে পারেননি।'

অসীম কোন জবাব না দিয়ে শঙ্করের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকল। সাজানো গুছানো পরিপাটি বসবার ঘর। ছোট একখানা গোল টেবিলকে ঘিরে কুশন আঁটা খানতিনেক নিচু চেয়ার। শঙ্কর একটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বোসো।'

পুরোন বন্ধুর মুখোমুখি বসল অসীম। বহুদিনের অদর্শনে যে দূরত্বের ব্যবধান মাঝখানে জমেছিল তা যেন এক মুহূর্তে ঘুচে গেল। যদিও স্বাচ্ছন্দ্যে মর্যাদায় সুখে স্বচ্ছলতায় শঙ্কর অনেক উঁচুতে, কিন্তু এই মুহূর্তে অসীমের কিছুই মনে পড়ছে না, যদিও জীবনদর্শন এবং খুঁটিনাটি আচার-আচরণে শঙ্করের সঙ্গে অসীমের তেমন মিল নেই, তবু প্রবাস থেকে এসে একজন পুরোন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাওয়ার সৌভাগ্য এই ব্যস্ত শহরে কম কথা নয়।

শঙ্কর অসীমের দিকে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও।'

অসীম হেসে মাথা নাড়ল।

শঙ্কর একটু বিস্মিত হবার ভঙ্গিতে বলল, 'সেকি। সব ছেড়ে দিয়ে বসেছ নাকি! আগে তো খেতে।'

অসীম বলল, 'আজকাল আর খাইনে।'

শঙ্কর হাসল, 'না খেলে অবশ্য পয়সা বাঁচে। অনেক টাকাই আমার ছাই হয়ে উড়ে যায়। সবই নিজের রক্ত জল করা টাকা, পৈতৃক সম্পত্তি নয়, কিন্তু অত ভাবতে গেলে জীবনে কিছু ভোগ করা যায় না। উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চয় করতে হলে জীবনে বহু অপচয়েরও দরকার হয়। কী বল?'

অসীম প্রতিবাদ না করে বলল, 'হুঁ।'

শঙ্কর বলল, 'যাকগে। তোমার খবর কি বল। কোথায় আছ, কী করছ।'

অসীম নিজের কাজ আর কর্মস্থলের নাম উল্লেখ করল।

শঙ্কর বলল, 'Anti-corruption?'

অসীম বলল, 'হ্যাঁ। হাসছ যে।'

শঙ্কর বলল, 'ভাবছি তোমরা করাপশনের বিপক্ষে না পক্ষে? তুমি পার ওসব কাজ?'

অসীম বলল, 'মোটেই পারিনে।'

শঙ্কর বলল, 'তবে করছ কেন?'

অসীম বলল, 'অন্য কাজ খুঁজে নেওয়া আমার পক্ষে আরও কঠিন।'

শঙ্কর হাসল, 'তুমি যদি কাজের যোগ্য হও কাজই তোমাকে খুঁজে নেবে। তোমার নিজের খুঁজতে হবে কেন? কিন্তু যা তোমার পছন্দ নয়, যাতে তোমার মন বসে না সেখানে মুখ গুঁজে পড়ে থাকাও কোন কাজের কথা নয়।'

অসীম বন্ধুর মুখে নিজের মনের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে খুশী হয়ে বলল, 'কিছুদিন ধরে আমিও তাই ভাবছি।'

শঙ্কর হেসে বলল, 'আমি তো ভাবতেই পারি না তোমার মত মানুষ ওসব কাজে দুদিনের বেশি টি'কে আছে কি করে। আর তুমি বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছ। দেখ, সব সয় বলে নাকি শরীরের নাম মহাশয়। কিন্তু মনের ওপর যদি সেই প্রবচন খাটাও তাহলে সব মরুভূমি হয়ে যাবে। কিছুদিন আগেও তো নর্থ বেঙ্গলে ছিলে। এবার বুঝি ঠেলে একেবারে ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্টে পাঠিয়ে দিয়েছে?'

অসীম বলল, 'হ্যাঁ।'

শঙ্কর হাসল। 'ভালোই তো। ঘুরে ঘুরে নানা জায়গার জলবায়ুর স্বাদ নাও। জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়ুক।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় তুমি আমাদের লাইনে থাকলেই ভালো করতে।

পড়তে পড়তে কী যে তোমার দুর্মতি হল, এম-এ'র কোর্সটা শেষ না করেই পালালে।'

অসীম অনুগত ছাত্রের মত বলল, 'এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছি।'

শঙ্কর হাসল, 'তাই যদি ভেবে থাক, ভুলটা শুধরে নাও। এখনো সময় আছে। কোনরকমে কলকাতায় চলে এসো। আমি তোমাকে হেলপ করব। অবশ্য আমার কাছে পড়তে যদি তোমার লজ্জা না হয় আর আমার সাবজেক্টে যদি তোমার রুচি থাকে—।'

অসীম বলল, 'কিন্তু এই বয়সে—।'

শঙ্কর বলল, 'বিয়ে-থা করনি, তোমার আবার বয়স কিসের? তাছাড়া অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। আমাদের বিদ্যাদান আর গ্রহণ সবই তো এখন অর্থকরী। মুখে আমরা অর্থকে যত তুচ্ছ করি, মনে মনে ত্ত গৌরব দিই। অর্থ-গৌরবই সবচেয়ে বড় গৌরব।'

অসীম হাসল, 'অর্থের মাহাত্ম্য তুমি ভালো করেই বুঝেছ। শুনেছি অনেক টাকা রোজগার কর।'

শঙ্কর বলল, 'অনেক নয় কিছু। তাও পায়ের ওপর পা তুলে বসে হয় না। উদয়-অস্ত খাটতে হয়। শুধু উদয়-অস্তই বা বলি কেন। সূর্যাস্তের পরেও অর্ধরজনী পর্যন্ত বিদ্যাদান করে তবে ঘরে ফিরি। তিনটে কলেজ পাঁচটা শিফট। কিন্তু ন দুঃখ পঞ্চভিঃ সহ। আমার সঙ্গে অনেকেই আছেন। অন্তত জন পঁচিশেককে আমি চিনি। শুধু কি পড়ানো? রাশ রাশ খাতা দেখা, নোট বই লেখা, আমরা কী না করি। তবু তো কুলোয় না। কী করে কুলোবে। আয় যত ব্যয় তার চেয়ে বেশি, সুযোগ সম্ভাবনা আরো বেশি। আর পাঁচজনে যখন ভোগ করছে তুমি কেন করবে না? তোমার সামনে ভোগের হাজার উপকরণ মেলে ধরে আমি বলব, ভোগ কোরো না, হিংসা কোরো না, সন্ন্যাসী হয়ে থাক, তা কি হয়? কিনবার ক্ষমতা না বাড়িয়ে চুরি কোরো না, ডাকাতি কোরো না, দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ো না এ সদুপদেশ কে শুনবে?'

অসীম বলল, 'এইসব দেখেশুনে আমার মনে হয়, আমি সেই আদিবাসীদের মধ্যেই বেশ আছি। তাদের এসব সমস্যা নেই।'

শঙ্কর হেসে উঠল, 'এবার তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ। আদিবাসীদের সেই আদিম বাসস্থানে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর—এ প্রার্থনা এখন আর কবিরাও করেন না। তপ-তপস্যা যা করতে হয় তোমাকে এখানে বসেই করতে হবে। এই ভোগ-সম্ভোগের মধ্যেই।'

—'দাদাবাবু, বউদি আপনাকে ভিতরে ডাকছেন।'

চৌদ্দ-পনের বছরের একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। পরনে হাফপ্যান্ট,

গায়ে একটা আধময়লা গেঞ্জি। বয়সের তুলনায় চেহারা বেশ লম্বা।

তার দিকে তাকিয়ে শঙ্কর হেসে বলল, 'তোর বউদিকেই বরং এখানে ডেকে দে গোকুল। বলগে আমার বন্ধু অসীমবাবু এসেছেন। আমি আজ আর টিউশনিতে যাব না।'

গোকুল চলে গেলে অসীম বলল, 'তুমি বুঝি সেই জন্যেই বেরোচ্ছিলে। আমার জন্যে কাজের ক্ষতি হল।'

শঙ্কর বলল, 'আরে রেখে দাও কাজ। তবু এই উপলক্ষে বিশ্রামের সুযোগ হল একটু। বেশি নয়, সপ্তাহে দু-একটা অফ পিরিয়ড এ সময় থাকে। সেগুলি ট্যুইশনে ঠাসা। গোচারণ করে করে একেবারে যখন হয়রাণ হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে কামাই করি। হেতু লিখি সেই পেটের অসুখ আর মাথা ধরা। যখন ছাত্র ছিলাম তখনো ওই দুটি রোগ ছিল স্কুল-কলেজ থেকে পালাবার সহায়। এখন মাস্টার হয়েও ওই দুটি রোগেরই শরণ নিই।' শঙ্কর হাসতে লাগল।

দু-তিনটি বুক-শেলফে অর্থনীতির বই। কাঁচের আলমারিতে শ্বেত-পাথরের বুদ্ধমূর্তি, এক জোড়া হাতী, মোষের শিং-এর তৈরি সৌখীন ধূপদানি, মাঝখানের তাকে কয়েক খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী। দেয়ালের তাকে নীল রঙের ঢাকনিতে ঢাকা ছোট একটি রেডিও সেট। জানলায় দরজায় নীল রঙের পর্দা। দুই ঘরের মাঝখানে প্রলম্বিত বড় পর্দাটি কারুকার্যে খচিত।

মানসীদের বাড়ির তুলনায় এ ঘর অনেক পরিচ্ছন্ন। গৃহসজ্জায় নিপুণ হাত এবং শিল্পরুচির পরিচয় স্পষ্ট। কিন্তু এই সুখনীড় গড়বার জন্যে অনূঢ়া কয়েকটি বোন আর বুড়ো বাপ-মাকে প্রতিপালনের দায়িত্ব অস্বীকার করেছে শঙ্কর! অসীমের মনে হল এত রূপ আর রুচির পিছনে এক নিষ্ঠুর স্বার্থপর মন লুকিয়ে রয়েছে।

পর্দা সরিয়ে এবার বাইশ-তেইশ বছরের একটি তন্বী দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে ঘরে ঢুকল। কন্যা নয় বধূ। সিঁথিতে ক্ষীণ সিঁদুরের রেখা। গায়ের রং মাজা গৌর। পরনের শাড়িতে চাঁপা ফুলের রঙ। সে যখন দুহাত তুলে নমস্কার করল, অসীমের মনে হল এই ধরনের আঙুলের গড়ন দেখেই প্রাচীন কবিদের চাঁপার কলির কথা মনে হয়েছে।

শঙ্কর স্ত্রী আর বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'বিয়ের সময় কাউকেই বলতে পারিনি। আর অসীমের তো কোন পাত্তাই ছিল না। তুমি বোধহয় তখন মালদা দিনাজপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। তবে নন্দিতাকে তুমি বোধহয় দেখেছ।'

অসীম একটু হাসল, 'তা দেখেছি বইকি। কলেজ স্ট্রীটে কয়েকবার, চৌরঙ্গীতে একবার।'

নন্দিতা লজ্জিত হয়ে মাথা নোয়াল।

অসীমের মনে হল এদের প্রাক্-বিবাহ যুগের কথাটা না তোলাই বোধহয় ভালো ছিল। ও প্রসঙ্গ তুলে সে সুরুচির পরিচয় দেয়নি।

খোঁপায় একটি বেলফুলের কুঁড়ি। আজ কি এদের কোন বিশেষ অনুষ্ঠান? না কি প্রতি রাত্রিই এদের শুভরাত্রি, সব শয্যাই ফুলশয্যা।

একটু বাদেই নন্দিতা উঠে দাঁড়াল। মৃদু হেসে বলল, 'আমি এক্ষুণি আসছি। আপনি এতক্ষণ ধরে এসেছেন, উনি আমাকে কিছু জানাননি। আমি ভাবলাম কোন ছাত্রটাত্র বুঝি—।'

অসীম হেসে বলল, 'আপনি ঠিকই ভেবেছিলেন। শংকরদের কাছে আমরা সবাই ছাত্র।'

নন্দিতা ফের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হল।

শংকর স্মিতমুখে বলল, 'অমন করে ঠুকছিলে যে। আমি কি খুব লম্বা লেকচার দিয়েছিলাম? একেবারে পঁয়তাল্লিশ মিনিট মেয়াদের?'

অসীম বলল, 'না, অত লম্বা হয়নি।'

শংকর হেসে বলল, 'পেশাগত অভ্যাস তো আছেই। কিছুটা বোধহয় পৈতৃক—। বাবাও খুব কথা বলেন, তাই না?'

অসীম বলল, 'বুড়ো হয়েছেন তাতো একটু বলবেনই। ওঁরা কিন্তু খুব দুঃখ করলেন শংকর।'

শংকরের মুখ গম্ভীর হল। 'দুঃখ! কিসের দুঃখ!'

অসীম একটু ইতস্তত করে বলল 'মানে তোমার এই আলাদা হয়ে আসাটা ওঁরা ঠিক সইতে পারেননি। ভিতরে ভিতরে খুবই আঘাত পেয়েছেন।'

'আঘাত পেয়েছেন?' আহত বাঘের মতই গর্জে উঠল শংকর। 'আঘাত পেয়েছেন? জানো আমাকে ওঁরা এভাবে সরে আসতে বাধ্য করেছেন? দিনের পর দিন কী যে কাণ্ডকারখানা হয়েছে তা তুমি বাইরে থেকে ধারণা করতে পারবে না। আমি দিনরাত পরিশ্রম করি। আর সেই পরিশ্রমের বদলে আমি সুখ চাই, স্বাচ্ছন্দ্য চাই, নিজের পছন্দমত বেঁচে থাকতে চাই।'

অসীম বলল, 'তা সবাই চায় শংকর। কিন্তু কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তেও হয়। আর সুখের কথা বলছ, সেই সুখ যদি শুধু বস্তুর মধ্যেই হত, চেয়ার-টেবিল, খাট-আলমারি, বুকশেলফ, রেডিওসেটের মধ্যে পাওয়া যেত, তাহলে আর মানুষ কয়েকটি ব্যক্তিকে নিয়ে পরিবার গড়ত না। আমার তো মনে হয় সুখ মানে অন্তত কয়েকজন মানুষের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক গড়ে তোলার সুখ। শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসার সুখ। সে সম্পর্ককে আমি অটুট

বলছিনে, অনড় বলছিনে। তা মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙে, আবার প্রতি মুহূর্তেই আমরা তা গড়ে তুলি। পাঁচজনকে নিয়ে না বাঁচলে আমাদের চলে না।'

শঙ্কর হাসল, 'তুমি সেই পুরোন ধারার বাহক হয়ে আছ। এযুগেও যেমন আদিবাসীরা আছে তেমনি। ওসব তত্ত্বকথা থাক, আসল কথায় এসো। তুমি যদি আমাদের বাড়িতে অন্তত দু-একটা দিন থাকো তাহলে বুঝতে পারবে বাড়িটা কী বস্তু।'

অসীম হেসে বলল, 'একটা দিন তো প্রায় কাটিয়েই দিলাম। আমার তো তেমন সাংঘাতিক কিছু বলে মনে হল না। মেসোমশাইর মত অমন অমায়িক ভদ্রলোক আর মাসীমার মত অমন—।'

শঙ্কর বাধা দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমার মা ও-পাড়ার ছেলেদের আর আমার বন্ধুদের মাসীমা হিসাবে আদর্শ ভদ্রমহিলা। কিন্তু আশ্চর্য, মা হিসাবে প্রায়ই বিমাতার মত ব্যবহার করে থাকেন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যে রেষারেষি তা দেখলে তোমার দুই সতীনের কথা মনে পড়বে।'

অসীম বন্ধুকে ধমক দিয়ে বলল, 'ছিঃ, কি যা তা বলছ। তোমার মুখে কিছু আটকায় না!'

খাবারের প্লেট হাতে নন্দিতা ঘরে ঢুকল। গোকুল নিয়ে এল ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম।

অসীম বিব্রত হয়ে বলল, 'এত কী এনেছেন।'

নন্দিতা মৃদু হেসে বলল, 'এত আর কোথায়। সামান্যই তো।'

শঙ্কর বলল, 'আরে খাও। কতদিন পরে দেখা। তোমার জন্যে আমি টিউশনিটা কামাই করলাম। বড়লোকের বাড়ি বড়লোকের ছেলে। টুলো পণ্ডিতের বেশে গেলে পাত্তাই দেবে না। তাই এই সাজসজ্জা, বুঝেছ? আমার বেশবাস নিয়ে তোমার বন্ধুপত্নী প্রায়ই কটাক্ষ করে। কিন্তু বেশ যে কিসের জন্যে তা আমিই জানি। আজকাল শুধু চেনাবামুন হলেই দক্ষিণা মেলে না, পৈতেটা বেশ ভালো করেই ঝুলিয়ে চলতে হয়।'

চামচে করে ওমলেটের টুকরো মুখে তুলতে তুলতে অসীম বলল, 'হুঁ।'

শঙ্কর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'ভালো কথা, অসীম আমার ছেলেকে দেখলে না? নন্দিতা, আমার বন্ধুর সঙ্গে তার বন্ধুপুত্রের পরিচয় করিয়ে দাও।'

নন্দিতা স্বামীর এই উচ্ছল প্রগল্‌ভতায় লজ্জিত হয়ে বলল, 'এখন থাক। ও এখন ঘুমুচ্ছে।'

শঙ্কর বলল, 'তাহলে আজকের মত ঘুমন্ত মুখই দেখিয়ে দিয়ো। দেখ অসীম, তুমি তো ভয়ে ভয়ে বিয়েই করতে পারলে না। আর আমি—তোমার চেয়ে এক পুরুষ সিনিয়র হয়ে গেলাম।'

নন্দিতা লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি যা তা বলছ।'

পিতৃত্বের জন্যে বন্ধুর গর্ব আর আত্মপ্রসাদ দেখে অসীম একটু বিস্মিত হল। মনে মনে হাসলও। নিজের ছেলেকে আদর করবার সময় নিজের বাপের কথা কি শঙ্করের মনে হয় না? এই উচ্ছল আনন্দ ওর বুড়ো বাপকেই যেন বেশি মানাত। কিন্তু ব্যথিত অভিমানক্ষুব্ধ নিজের সেই বাবার কথা শঙ্করের বোধহয় এখন আর মনে নেই। ও এখন একই সঙ্গে ওর ছেলের বাপ আর ঠাকুরদা হয়েছে।

একটু বাদে নন্দিতা ফের উঠে গেল। কিন্তু অসীমকে সহজে উঠতে দিল না শঙ্কর। বসে বসে গল্প করতে লাগল। পারিবারিক প্রসঙ্গই বেশি। শঙ্কর নিজের পছন্দমত ভালোবেসে বিয়ে করেছে একথা সে অস্বীকার করে না। কিন্তু তার পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের চোখে সেই ভালোবাসাটাই এক মহা অপরাধ হয়ে রয়েছে। যেন একটি মেয়েকে ভালোবাসলে বাবা-মা-ভাইবোনের ওপর আর কোন মমতা থাকে না। শুধু বাপ-মা নয়, গোড়া থেকেই শঙ্করের বোনদের মনোভাবও ওইরকম। মা যখন বলেন, আইবুড়ো বোনদের বিয়ে না দিয়েই সে নির্লজ্জ স্বার্থপরের মত বিয়ে করেছে তখন বোনরা কেউ প্রতিবাদ করে না। কিন্তু শঙ্কর নিজে জানে অত তাড়াতাড়ি বিয়ে না করে তার উপায় ছিল না। নন্দিতাকে তার বাবা-কাকা প্রায় জোর করেই আর এক জায়গায় বিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করে ফেলেছিলেন। নন্দিতার আর এক অপরাধ, ধনী ব্যারিস্টারের মেয়ে হয়েও সে বিয়ের সময় ধন-দৌলত পণ-যৌতুক সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারেনি; তাতে তার ননদদের কিছু সাহায্য হত। কিন্তু সঙ্গে লক্ষ্মীর ঝাঁপি কি করে আনবে নন্দিতা? অমন কড়া পাহারার ভিতর থেকে সে যে নিজে বেরিয়ে আসতে পেরেছে তাই তো ঢের। জাতে অবশ্য নন্দিতার বাবা কুলীন বামুন নয়, কিন্তু অর্থের কৌলীন্য তাঁদের অনেক বেশি। শঙ্করের মত একজন গরীব প্রফেসরের হাতে কন্যাদানে তাঁদের মন ওঠেনি। কিন্তু নন্দিতা এ ব্যাপারে বাবা-কাকার মান রাখার চেয়ে নিজের মনের গতিকেই বেশি অনুসরণ করেছে। ফলে তার বাপের বাড়ির দোর একেবারে বন্ধ না হয়ে গেলেও বাড়ির মালিকদের হৃদয়দুয়ার অবরুদ্ধই রয়েছে। যে মেয়ে তার জন্যে নিজের বাপকে ছেড়েছে, মাকে ছেড়েছে, সমাজকে ছেড়েছে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখবার দায়িত্ব কি সম্পূর্ণ শঙ্করের নয়? নিজের বাপ-মা-বোনদের শ্লেষ-বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ-কৌতুক, অনাদর-অপমানের হাত থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করার ভার সে ছাড়া আর কে নেবে? আর এ-ভার না নিতে পারলে শঙ্করের নিজেরই-বা সুখ কোথায়? তারই-বা আত্মগৌরবের তাতে কতটুকু বাকি থাকে? বাপ-মার ওপর তার নিশ্চয়ই কর্তব্য আছে, কিন্তু একটি মেয়ে যেহেতু তার স্ত্রী, আর তার ওপর স্বাভাবিক মমতার জন্যে

যেহেতু স্ত্রৈণ অপবাদের ভয় আছে সেইজন্যেই সে নন্দিতার ওপর উদাসীন হতে পারে না, সেই মেয়েটির মানসিক অস্বস্তির কারণগুলি তাকে দূর করতেই হবে।

তাছাড়া শঙ্করের বাবা-মারই বা এতে অত লজ্জা আর দুঃখ পাবার কি আছে? সে যদি অন্য কোথাও চাকরি করত তাহলেও তো স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হয়েই তাকে থাকতে হত। বরং এইভাবে থাকলেই সাধারণ সৌজন্য আর ভদ্রতাটুকু বজায় থাকবে। একসঙ্গে থাকলে শুধু অপ্রীতিকর সান্নিধ্যটুকু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাছাড়া নন্দিতার অভিমান বড় বেশি। সে মুখে কিছু বলে না কিন্তু সামান্য আঘাতে মনে বড় কষ্ট পায়। পাছে বাপ-মা কি ওইদিককার কোন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়, আর তাঁরা তাকে ভালো চোখে না দেখেন সেই ভয়ে নন্দিতা দক্ষিণ কলকাতা থেকে একেবারে উত্তর-প্রান্তে চলে এসেছে। আসল নগর থেকে বরানগরে। অবশ্য এখানে নন্দিতার এক মামাতো বোন আছেন। তাঁর বিয়েটাও সমাজসম্মতভাবে হয়নি। নন্দিতার ওপর তাঁর সহানুভূতি আছে। তাছাড়া যেসব কলেজে শঙ্করের কাজ সেগুলিও শহরের উত্তরপ্রান্তে কি আরও উত্তরে। তাই অনেক অসুবিধা হলেও এখানেই পড়ে আছে শঙ্কর। সব সুখ, সব স্বাচ্ছন্দ্য তো একসঙ্গে মেলে না। যতটুকু জোটে আর যতখানি কেড়ে নেওয়া যায় ততখানিই লাভ।

রাত বেড়ে যাচ্ছিল, অসীম এবার বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এর পর হয়তো আর বাসটাস কিছু মিলবে না।

যাওয়ার সময় নন্দিতা ফের এসে দাঁড়াল, হেসে বলল, 'কাল কিন্তু আপনাকে সন্ধ্যাবেলায় অবশ্য আসতে হবে।'

একটু লম্বাটে ধরনের মুখ। দাঁতগুলি সমান সুগঠিত। হাসলে বেশ দেখায়।

অসীম স্মিতমুখে বলল, 'এইতো এলাম, আবার কাল কেন। কাল কোথায় থাকব তার ঠিক নেই।'

নন্দিতা বলল, 'যেখানেই থাকুন, কাল এখানে একবার আসবেন।'

অসীম হেসে বলল, 'কেন কাল কি?'

নন্দিতা স্বামীর দিকে তাকালে।

শঙ্কর বলল, 'লজ্জা কি, বলেই ফেল না।'

অসীম বলল, 'ম্যারেজ অ্যানিভারসারি বুঝি?'

নন্দিতা স্মিতমুখ একটু নামিয়ে নিয়ে বলল, 'না।'

অসীম শঙ্করের দিকে তাকাল, 'তবে?'

শঙ্কর হেসে বলল, 'তোমার দৌড় ওই অ্যানিভারসারি পর্যন্ত। কাল পিলুর জন্মদিন।'

অসীম হেসে বলল, 'ও, তাই বল।'

এই দুই নতুন প্রসন্নমুখ জনক-জননীর পাশে হঠাৎ আর একজোড়া বাপ-মার রেখাকুঞ্চিত মুখ অসীমের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

অসীম আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা আসব। আসতে চেষ্টা করব।'

শঙ্কর জোর দিয়ে বলল, 'না না, চেষ্টা নয়, আসতেই হবে। আচ্ছা এক কাজ কর না। বেশ রাত হয়েছে। আজ এখানে থেকে যাও। থাকবার জায়গার তো অভাব নেই।'

অসীম বলল, 'কিন্তু আমি ওদের কথা দিয়ে এসেছি। ওরা অপেক্ষা করে থাকবে।'

'অপেক্ষা করে থাকবে? ও, বুঝতে পেরেছি।'

শঙ্করের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল।

অসীমের মনে হল, শুধু কৌতুক। তাছাড়া আর কিছু নেই। শঙ্কর নিজে ভালোবেসে বিয়ে করেছে তবু আর একজনের ভালোবাসা তার মনে কৌতুক ছাড়া আর কোন রসই সঞ্চার করে না।

অসীম সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবল, এও বড় কম কৌতুকের কথা নয়।

বেলগাছিয়ার তিনতলা ফ্লাট বাড়িটার সামনে ফের এসে যখন দাঁড়াল অসীম রাত দশটা বেজে গেছে। শহরতলী জনবিরল। পরিশ্রান্ত একদল যাত্রীকে নিয়ে একটি দোতলা বাস গন্তব্যে পৌঁছবার জন্যে গতি বাড়িয়ে দিল। রিক্সা-স্ট্যাণ্ডে একটি রিক্সাওয়ালা নিজের গাড়িতে উঠে বসে বিড়ি টানছে। তিনতলা বাড়িটায় কতগুলি ফ্লাট কে জানে। রাস্তার দিকের কয়েকটি ঘরের জানলা খোলা। ভিতরের আলো দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি ঘরের জানলা বন্ধ। ওদের কিছুই দেখা গেল না, জানা গেল না। প্রায় পুরো একটা দিন এই বাড়িতে কেটে গেল অসীমের। কিন্তু নিচেরতলার একটি পরিবারের কয়েকটি মানুষ ছাড়া আর কারো সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হল না। শুধু একটি দিন কেন, এক জীবন পাশাপাশি কাটালেও একজন তার পাশের ঘরের আর একজনকে না-ও চিনতে পারে। এমন কি চিনবার জন্যে কোন আগ্রহ পর্যন্ত হয় না। পৃথিবী বিপুলা। কিন্তু তোমাকে ধরবার জন্যে তোমার ধারণার জন্যে অল্প একটু জায়গাই যথেষ্ট। আশেপাশের কয়েকটা বাড়িতে কোন সাড়াশব্দ নেই। সব বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু বাদে এই তেতলা বাড়িটারও ওই দশা হবে। একতাল কাদার মত ঘুমন্ত মানুষগুলিকে নিয়ে

সে স্তব্ধ হয়ে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে। সেও কি ঝিমোবে, ঘুমোবে, স্বপ্ন দেখবে? প্রাণীর মত বস্তুরও কি স্বপ্ন আছে? আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনা আছে?

দোরের সামনে এসে আস্তে আস্তে কড়া নাড়ল অসীম। এ-বাড়ির দোতলা তেতলার ফ্লাটগুলির আর যারাই ঘুমিয়ে পড়ুক, এই সাত নম্বর ফ্লাটের বাসিন্দারা কেউ ঘুমোয়নি। ভিতর থেকে গোলমাল শোনা যাচ্ছে। মনোমোহন কাকে যেন বকাবকি করছেন।—'এই তোর বাড়ি ফেরার সময় হল? দিন নেই রাত নেই কেবল আড্ডা, কেবল আড্ডা।'

আর একবার কড়া নাড়তেই মানসী এসে দরজা খুলে দিল।

অসীম ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে বকছেন মেসোমশাই? আমাকে নাকি?'

মানসী, মঞ্জু ও মায়া একসঙ্গে হেসে উঠল। সুহাসিনীও একটু হেসে বললেন, 'আমার অসীমের কথা শোন।'

মনোমোহন সপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'না বাবা, তোমাকে কেন হবে? বলছিলাম নন্দুটাকে। এতক্ষণ পরে শ্রীমান্ ঘরে ফিরলেন। এই রাত দশটায়. ভেবে দেখ একবার। সেই যে তোমাদের পৌঁছে দিয়ে দুটি নাকে-মুখে গুঁজে ছেলে বেরিয়েছে, আর সারাদিনের মধ্যে তার দেখা নেই। ঠিক একেবারে দাদার পথের পথিক হচ্ছে। দাদা তো লভ ম্যারেজ করে প্রেমিক সাজাহান হয়েছেন, এখন ছোট ভাইটিও ওইরকম কিছু একটা ঘটিয়ে বসলেই হল। বাড়িটা তাহলে সত্যিই একখানা গুপ্ত বৃন্দাবন হতে পারে।'

অসীম লক্ষ্য করল মানসী মুখ নিচু করেছে। সে নিজেও কিসের একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মনোমোহনের লক্ষ্য কি তাহলে শুধু নন্দু নয়? আরো কেউ কেউ? তিনি কি কৌশলে ঝি'কে মেরে বউকে শেখাচ্ছেন? ছেলেকে গাল দিয়ে ছেলের বন্ধুকে?

সুহাসিনী স্বামীকে বাধা দিলেন, 'আঃ, কী যা তা বলছ। নন্দু দেরি করে ফিরেছে তাকে সেজন্যে বকতে হয় বকো। আবার আর পাঁচটা বাজে কথা কেন!'

মানসীও বাপের কথার প্রতিবাদ করল, 'সত্যি, ওসব কিসে আসে! নন্দু যে পরীক্ষার নম্বর-নম্বর করে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে আমরা সবাই জানি।'

মনোমোহন বললেন, 'থাম থাম। তোরা একজনের দোষ আর একজনে ঢাকতে ওস্তাদ। এই করে করেই তো তোরা সব নষ্ট করলি। তোরা সবাই ভালো। তুই ভালো, তোর দাদা ভালো, ছোট ভাই ভালো, দিদিরা ভালো, মন্দ শুধু আমার এই কপাল।'

নিজের কপালে আঙুল ছোঁয়ালেন মনোমোহন। তারপর আলনায়

ঝোলানো আধময়লা পাঞ্জাবির ঝুল-পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অন্য সুরে বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। এবার অসীমকে খেতেটেতে দেবে না কি?'

সুহাসিনী বললেন, 'তুমি থামলেই দিতে পারি। সেই থেকে যে ঝড় বয়ে চলছে।'

মনোমোহন নিজেও বোধহয় এতক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবার বাইরে গিয়ে বিড়ি ধরালেন।

অসীম একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'মূল আসামী কোথায়? তাকে দেখছিনে যে।'

মানসী বলল, 'সে ও-ঘরে পালিয়ে রয়েছে। ভারি বুদ্ধিমান ছেলে। কেউ যখন বকাবকি করে একেবারে ঘরের দেয়াল হয়ে থাকে। টু শব্দটি পর্যন্ত করে না। তখন মনে হয় তার মত শান্ত ছেলে আর দুটি নেই। কিন্তু আসামী শুধু আজ একজন নয়, দু'জন।'

অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'দ্বিতীয় জন কে?'

মানসী হাসল, 'কে আবার? মেজদি। সে হল আসামিনী। সেও আজ বাবাকে চটিয়ে দিয়েছে। তার ওপর দিয়েও বর্ষণ এতক্ষণ কম হয়নি।'

অসীম বলল, 'ও, তাকে তো সন্ধ্যাবেলা সব দেখতে এসেছিল। কী হল?'

সুহাসিনী জবাব দিলেন, 'নতুন আবার কি হবে। পরে সব শুনবে অসীম। চল এবার তোমাদের খেতে দিই।'

সুহাসিনী এ-বেলাও দু-তিনটি নতুন তরকারি রেঁধেছেন। অবশ্য বেশির ভাগই নিরামিষ। আমিষ ছাড়া অন্য খাবার অসীম পছন্দ করে না। কিন্তু রান্নার গুণে তার রুচি বদলেছে। পাঁচপাড়ার সেই শিবির-জীবনে এসব তো আর জোটে না। কোনরকমে কিছু সিদ্ধ করে নেয়। তার সেই আদিবাসী পাচক সব রান্না অনার্যদের মতই রাঁধতে চায়। নিজের খেয়াল-খুশী মত চলে। বেশি কিছু বললে কাজ ছেড়ে চলে যায়। আবার তাকে সেধে ডেকে আনতে হয়।

এবেলাও কিছুতেই মাধুরী মানসী পংক্তি ভোজনে বসল না। তারা পরিবেশিকা হয়েই রইল। মাধুরী নামে মাত্র পরিবেশিকা। খাবারঘরে সে প্রায় এলই না। দু-একবার যদি-বা তার মুখ দেখা গেল তা বিষাদগম্ভীর।

নন্দুও মুখ ভার করে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগল। দুপুরবেলার সেই হাসি-কৌতুক আর আনন্দের উৎস কেন যেন এখন রুদ্ধ হয়ে গেছে।

অথচ এই কয়েকঘণ্টার মধ্যে এই পরিবারে এমন তো কিছু ঘটেনি। নন্দু বাড়িতে দেরি করে ফিরেছে আর সন্ধ্যাবেলায় মাধুরীকে একদল লোক

এসে দেখে গেছে। এ পরিবারে নিশ্চয়ই এ ঘটনা এমন কিছু নতুন নয়। তবু সামান্য কারণে মানুষের মন এমন বদলে যায়, তার চালচলন এমন রূপান্তরিত হয় যে, তাকে একেবারে অন্য মানুষ বলে মনে হয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটি পারিবারিক আবহাওয়াও দিনের সব প্রহরে একরকম নেই। সম্পর্কের এক-আধটু অদল-বদলের সঙ্গে সঙ্গে তারও রঙের বদল হচ্ছে, রূপের বদল হচ্ছে। আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। যারা সেই পরিবারে বাস করে তারা হয়তো এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তন তেমনভাবে বুঝতে পারে না। কিন্তু বাইরের কোন লোক এলে সে নিশ্চয়ই অনুভব করে। বুঝতে পারে পর পর ঔদার্য আর সঙ্কীর্ণতার পট-পরিবর্তন।

এঁদের নীরবতা আর গাম্ভীর্য দেখে অসীমের মনে হল সে দিনের বেলা বিদায় নিলেই ভালো করত। রাত্রির আতিথ্য নেওয়া তার ঠিক হয়নি। এঁরা ভদ্রতা করে সৌজন্য দেখিয়েছেন। কিন্তু সে এখানে রাত্রেও থাকে তা হয়তো মনোমোহনবাবুর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না।

অসীম নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছিল, মনোমোহনই প্রথম কথা বললেন, 'তুমি বুঝি বরানগরে গিয়েছিলে?'

অসীম বলল, 'হ্যাঁ।'

'দেখা হল? বাড়িতে ছিল?'

'হ্যাঁ। শঙ্কর অবশ্য আর একটু হলেই বেরিয়ে পড়ত। পড়াতে যাচ্ছিল।'

মনোমোহন বললেন, 'দিনরাতই তো পড়ায়। শুনি দুহাতে টাকা আনে, চার হাতে খরচ করে। কিন্তু তাতে আমার কি। এই বুড়ো বয়সে সংসার চালাবার জন্যে আমাকে টিউশনি করতে হয়। কিন্তু আমার তো আর অত বিদ্যা নেই। উঁচু ক্লাসের টিউশনি আমার জুটবে কেন। তাছাড়া আজকাল জবরজং সব কোর্স হয়েছে, পড়িয়ে আনন্দ পাইনে। ওসব পড়তে গেলে ছেলেদের মাথা খারাপ হয়, আর আমাদের মত বুড়োদের মাথাও ঠিক থাকে না।'

অসীম এবার একটু হেসে বলল, 'মেসোমশাইর কি পড়ানো-টরানো অভ্যাস আছে?'

মনোমোহন বললেন, 'ছিল না। পেটের দায়ে অভ্যাস করে নিতে হয়েছে। আগে ছিলাম মফঃস্বলের পোস্টমাস্টার। মেজাজ যখন খারাপ থাকত পোস্ট-কার্ড এনভেলপের ওপর জোরে জোরে সীল মারতাম। রিটায়ার করে হয়েছি পড়ার মাস্টার। অঙ্ক বাংলা ইতিহাস ভূগোল গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান সব পড়াই। কিন্তু গবেট ছেলেমেয়েগুলির কাণ্ড দেখে সেই পোস্টমাস্টারের হাত নিসপিস করে। ইচ্ছা করে পিঠের ওপর বিরাশির ওজনের এককেটা কিল বসিয়ে দিই।'

এবার মেয়েরা হেসে উঠল।

সুহাসিনী ভাত দিতে দিতে বললেন, 'খবরদার অমন কাজও কোরো না। আজকালকার ছেলেমেয়েদের তো জানো না। তাদের গায়ে হাত দিতে গেলে তারা তোমাকে আস্ত রাখবে না।'

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলে মাধুরী হঠাৎ এগিয়ে এসে বলল, 'অসীমদা, সারাদিন আজ ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। চল না, একটু ছাদের ওপর থেকে ঘুরে আসি।'

অসীম খুশী হয়ে বলল, 'বল কি এত রাত্রে ছাদ! তাছাড়া এ-বাড়ির ছাদ আছে নাকি?'

মাধুরী বলল, 'ছাদ আছে। কিন্তু আমাদের একতলার বাসিন্দাদের তা বেশি ভোগদখলে আসে না। সবদিন মনেও থাকে না ছাদের কথা। ভিজে কাপড়-চোপড় আমরা নিচেই মেলে দিই। কিন্তু একেকদিন ওপরে উঠতে বড় ইচ্ছা করে।'

অসীম বলল, 'সে তো স্বাভাবিক।'

মাধুরী একা গেল না। মানসীকে ডেকে বলল, 'চল যাই ছাদ থেকে ঘুরে আসি।'

মনটা যেন তার তেমন খুশী হল না। মুখ ভার করে বলল, 'তোমরা যাও।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আরে আমরা তো যাবই। তুইও চল। এত রাত্রে দলে ভারি না হলে আর ছাদে যাওয়া চলে?'

এই রাত্রে মেয়েদের ছাদে যাওয়ার প্রস্তাবটা মনোমোহনও প্রসন্ন মনে নিলেন না।

তিনি আপত্তি করে বললেন, 'কেন আবার ছাদ ছাদ করছিস। রাত প্রায় দুপুর। যা এখন সব শুয়ে পড় গিয়ে। কাল তো আবার অফিস আছে, স্কুল আছে।'

মাধুরী বলল, 'সেজন্যে ভাবতে হবে না বাবা। কাল তো আর স্কুল কামাই করবার কোন কারণ থাকবে না। ছাদটা অসীমদাকে একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি। আমরা যাব আর আসব।'

সুহাসিনী বললেন, 'যেতে চাইছে যাক। তুমিই-বা অত বাধা দিচ্ছ কেন। রাত ভরে তো গরমে ছটফট করে। দু মিনিট যদি একটু খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে চায়, তোমারই-বা আপত্তির কি আছে।'

অসীম বলল, 'তাহলে থাক মাধুরী। সত্যি রাতও হয়েছে।' মনোমোহন হঠাৎ একেবারে উল্টো সুর বলতে শুরু করলেন, 'আরে না না অসীম। যাও ঘুরে এসো। আমি এমনই বলছিলাম। এগারটা আমাদের কাছে রাত। কিন্তু তোমরা ইয়ংম্যান, তোমাদের কাছে এগারটা-বারোটা তো সন্ধ্যা। আরে

তোমাদের বয়সে আমরা কী না করেছি। দাবা-পাশা খেলে রাতকে রাত ভোর করে দিয়েছি না? তাই নিয়ে তোমার মাসীমার সঙ্গে—। যাও যাও, ঘুরে এসো।'

মনোমোহন এমন আগ্রহ দেখাতে লাগলেন যেন তাঁর মেয়েদের নিয়ে অসীম ছাদে বেড়াতে না গেলেই তিনি মহা অসন্তুষ্ট হবেন।

অসীম অগত্যা ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

তিনতলায় বাড়িওয়ালার এক আত্মীয় থাকেন। তিনিই এ বাড়ির কেয়ার-টেকার। তাঁর কাছে ছাদের চাবি। সে চাবি যখন-তখন যার-তার হাতে তিনি দেন না। এ ব্যাপারে তাঁর বেশ পক্ষপাত আছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে অসীম বলল, 'তোমরা বুঝি সেই সুযোগ নাও?'

মানসী হাসল, 'আমার চেয়ে দিদির ওপরই ব্রজবাবুর টানটা বেশি। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাতে বিপত্নীক। দিদিকে স্থায়ীভাবে গোটা ছাদ আর ছাদের লাগা ঘরখানার মালিকানা দেবার বাসনা।'

অসীম হেসে বলল, 'ভালোই তো।'

মাধুরী ধমক দিয়ে বলল, 'কি যে সব সময় ফাজলেমি করিস। ব্রজবাবু বেশ ভদ্রলোক। এসিডিটির রোগী। কঙ্কালসার চেহারা। কারো সাতে-পাঁচে থাকেন না। মানসী তাঁকে নিয়েও—।'

মানসী হেসে বলল, 'যাঁরা সাতে নেই পাঁচে নেই তাঁরাই তো নাচেন বেশি।'

মাধুরী ওদের দু'জনকে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে ব্রজবাবুর কাছ থেকে ছাদের চাবিটা চেয়ে আনল।

একটু বাদেই সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি আর ছোট দরজা পার হয়ে অসীম প্রশস্ত ছাদে বিরাট আকাশের নিচে মুক্তি পেল।

মাথার ওপরে যে তারায়-ভরা এমন এক বিচিত্র বিস্ময়কর বিপুল রহস্যের আধার রয়েছে তা সব সময় মনে থাকে না, চোখেও পড়ে না। অসীম ভাবল, শুধু কি আকাশ? আকাশ তো অনেক দূরে। অনেক উঁচুতে। কিন্তু যে মাটির ওপর দিয়ে মানুষ হাঁটে সেই মাটির স্পর্শও কি সব সময় পায়? তার মমতা কোমলতা মাধুর্যের স্বাদ সমস্ত সত্তায় মেখে নিতে পারে? পারে না। মানুষ নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত, আরো পাঁচটা স্থূল প্রয়োজনের চিন্তায় চেষ্টায় এত অস্থির যে প্রকৃতির দিকে তাকাবার তার অবসর নেই। শুধু কি প্রকৃতির সম্পদ? স্নেহ ভালোবাসা বন্ধুত্ব? সেই হৃদয়ের সম্পদও সর্বক্ষণের নয়, কোন কোন ক্ষণের, দুর্লভ মাহেন্দ্রক্ষণগুলির জন্যে। শুধু সেই ক্ষণগুলিতেই মানুষ মহৎ—সে দাতা, গ্রহীতা।

আলিসার ধারে মানসী অসীমের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর আবছায়ার মূর্তিটি এই বিরাট আকাশের নিচে শুধু যেন এক অস্তিত্বের ইশারা।

মানসী আস্তে আস্তে বলল, 'ছাদের কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু বলতে ভরসা পাইনি। পাছে বাবা হৈচৈ করেন। দেখলে না এতেই কি রকম আপত্তি করতে লাগলেন। তবু দিদির কথা বাবা শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারেন না। দিদি অমনিতে খুব শান্ত, ঠাণ্ডা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব জেদী মেয়ে। বাবা সেই জেদকে ভয় করেন।'

অসীম বলল, 'তাই নাকি?'

মানসী বলল, 'হ্যাঁ। এই আজই যে কাণ্ডটা করল। দিদি গোড়া থেকেই নিষেধ করেছিল। তাকে যেন কেউ দেখতে না আসে। দিদি আর ওসব পছন্দ করে না। দলে দলে লোক আসবে আর তাকে অপছন্দ করে চলে যাবে ওর বয়সী মেয়ের পক্ষে তা সহ্য করা শক্ত। বাবা নিজেও তা বেশ বোঝেন। কয়েকমাস চুপচাপ থাকেন। কিন্তু হঠাৎ একেক সময় কি যেন হয়। বাপ হিসাবে নিজের দায়িত্বের কথা মনে পড়ে। দিন নেই রাত নেই ছেলের খোঁজ করেন, আমাদের না বলে মেজদির ঠিকুজী কোষ্ঠী পকেটে নিয়ে কোথায় কোথায় চলে যান। আলাপ-আলোচনা দেখা-সাক্ষাতের পালা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না।'

অসীম বলল, 'সত্যি ব্যাপারটা বড়ই—।'

মানসী বলল, 'আজও তাই হল। গোড়া থেকেই মেজদির মেজাজ ঠিক ছিল না। যাওয়ার সময়েই তো তুমি তা দেখে গিয়েছিলে। তুমি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি করে জন পাঁচেক এসে হাজির। ছেলের দাদা, বউদি, দিদি, ভগ্নীপতি, আবার একজন বন্ধুকেও জুটিয়ে এনেছেন। মানে ওঁদের পক্ষে একটা এক্সকারশন, আউটিং-এর মত। মা অবশ্য গোড়া থেকেই তৈরি ছিলেন। জলখাবার-টাবার করে রেখেছিলেন। তবু দোকান থেকে আরও কিছু মিষ্টি আনাতে হল। তাঁরা ধীরে সুস্থে চা-টা খেলেন। তারপর অনুমতি দিয়ে বললেন, 'তাহলে নিয়ে আসুন।'

অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'মাধুরী কি আসেনি?'

মানসী বলতে লাগল, 'এসেছিল। তবে অন্য দিন বিকেলে যেটুকু টয়লেট করে, আজ তাও করেনি। হাতে দু'গাছা চুড়ি জোর করে পরিয়ে দিয়েছিলাম। আর ধমকে-টমকে মা চুলটা বেঁধে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে সস্তা একখানা তাঁতের শাড়ি দিদি নিজেই বেছে নিল। কিছুতেই তাকে অন্য শাড়ি পরাতে পারলাম না। দিদি বললে, আমি অত সাজতে পারব না। মা ধমক দিয়ে বললেন, কখনো কি সাজিসনে? দিদি জবাব দিলে, নিজের ইচ্ছায় নয়।

ভারি জেদী মেয়ে। কিন্তু যাঁরা দেখতে এসেছেন তাঁরা তো আর কারো জেদ দেখতে আসেননি। তাঁরা কুমারী মেয়ের রূপ-লাবণ্য লালিত্য-নম্রতা দেখতে এসেছেন। তাঁদের চোখ দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম তাঁরা খুশী হননি। বেশ তো খুশী হননি, উঠে চলে যান। তা নয়, শক্ত শক্ত সব প্রশ্ন। সবজান্তা সেই বন্ধুটিই মুখপাত্র। দিদি মাস্টারী করে শুনে বেছে বেছে সেই মাস্টারী সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। দিদি সাহিত্য কিভাবে পড়ায়, ইতিহাস কিভাবে পড়ায়, ইতিহাসেও সাহিত্যের আমেজ আনতে পারে কিনা, নাকি শুধু নাম-ধাম সন-তারিখ মুখস্থ করায়,—আগের দিনের পড়া পরদিন এসে ক্লাসে রিক্যাপিচুলেট করে না কি হঠাৎ শুরু করে দেয়, এই সব।'

অসীম বলল, 'ভদ্রলোক নিজে কি করেন?'

মানসী বলল, 'তা জানিনে। ছেলে শুনেছি ওভারশিয়ার। ছেলের বন্ধুর খোঁজ নিইনি। জেরায় জেরায় দিদি মনে মনে বিরক্ত হয়ে মুখে একটু হাসি টেনে বলল, ওসব কথা তো বি-টি পরীক্ষার খাতায় লিখে দিয়ে এসেছি। আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার থাকলে তাই করুন। ভদ্রলোক অমনিই তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, না আমার আর কিছু জানবার নেই। মেয়েরা তবু গান শুনতে চাইলেন। দিদি বলল, আমি গান জানিনে। মা বললেন, আহা মাঝে মাঝে গেয়েও তো থাকিস। যে দুজন মহিলা দেখতে এসেছিলেন তাঁদের দিকে চেয়ে বললেন, জানেন দিদি, একা একা একেক সময় বেশ গায়। গলাটাও ভাল, কিন্তু বড় মেজাজী।—একটা গান শুনিয়ে দাও না মাধুরী, ওঁরা যখন অত করে বলছেন। কিন্তু দিদির মন-মেজাজ আগে থেকেই বিগড়ে রয়েছে। কিছুতেই গলা খুলল না। ওকে হারমনিয়মের সামনে বসানোই গেল না।'

অসীম বলল, 'তারপর?'

মানসী বলল, 'তারপর আর কি। ওঁরা বিদায় নিলেন। বললেন, পরে খবর দেবেন। কিন্তু তাঁদের মুখ দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছি খবর দেওয়ার আর কিছু নেই। তারপর ওঁরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা খুব চেঁচামেচি শুরু করলেন। তাঁকে এমন অপমান করবার কী মানে হয়। দেখা-সাক্ষাতের ইচ্ছা যদি দিদির না-ই ছিল তাহলে তো স্পষ্ট করে বলে দিলেই হত। ওঁদের এণ্টারটেইন করতে মিছামিছি কতকগুলি টাকা নষ্ট, সময় নষ্ট। ওঁদের অপমান করা মানে বাবাকেই অপমান করা। কারণ বাবাই ওঁদের ডেকে এনেছেন। মা দিদির পক্ষ নিয়ে বললেন, কেউ তাঁদের অপমান করেনি, তুমি মিছামিছি ওকে দুষছ। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। তুমি আসবার একটু আগে তা থেমেছে।'

অসীম হঠাৎ এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'বা রে, মাধুরী কোথায় গেল। ও তো ওইদিকে এগোচ্ছিল।'

মানসী বলল, 'তাহলে বোধহয় নেমে গেছে। না হয় ব্রজবাবুকে কথায়-বার্তায় আটকে রেখেছে। আমাদের সুযোগ দেওয়ার জন্যেই ওর এত কান্ড। কিন্তু ও বোধহয় জানে না আমরা শুধু ওর কথা নিয়েই আলোচনা করছি। ওর সামনে বলতে পারতাম না, এমন একটা কথাও বলিনি। ওর চলে যাওয়ার কোন দরকার ছিল না।'

অসীম বলল, 'তাইতো দেখছি। এসে অবধি তুমি তোমার দিদির কথাই বলছ। আর কোন কথা বলবার কি শোনবার গরজ তোমার নেই।'

মানসী বলল, 'আছে কি না আছে কী করে জানছো। আমিও তো দেখছি আমার চেয়ে দিদির কথা জানতেই তোমার আগ্রহ বেশি। বরং আমার দিকেই এবার তোমার আর কোন মন নেই।'

মানসী একটু হাসল।

অসীমের মনে হল, এই হাসি একেবারে অনাবিল এবং দুশ্চিন্তামুক্ত নয়। মানসীর হাসির মধ্যে কোথায় যেন দু-একটা ঈর্ষার কাঁটা লুকিয়ে আছে।

অসীম মনে মনে সেই ঈর্ষাটুকু উপভোগ করল। মেয়েদের চোখ কিছুই এড়ায় না। মাধুরীর স্বাস্থ্য আর দেহসৌষ্ঠব যে অসীম লক্ষ্য করেছে তা মানসী টের পেল কী করে? মানসী যেন আরো রোগা হয়ে গেছে আর শুকনো। অফিসে কি খুব খাটে মানসী, নিজেদের সংসার নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করে? নিজের দেহপাত করে অত পরিশ্রমই-বা কেন, অত চিন্তাই-বা কিসের? মানসী কি জানে না, তার দেহ শুধু তার একার নয়, তা অসীমেরও? কর্তব্য আর আদর্শের চাপে তাকে শুকিয়ে কাঠ করে রাখবার তার কোন অধিকার নেই? তাছাড়া শুধু দিদিকেই সাজিয়েছে মানসী, নিজেও কি আর একটু সাজতে পারত না? মানসীকে কনে হিসাবে দেখবার জন্যে বাইরে থেকে আর একদল ভদ্রলোক না হয় নাই-বা এসেছেন কিন্তু একজন তো আছে। তার চোখের তৃপ্তির জন্যে মানসীর কিছুই করবার প্রয়োজন নেই!

অসীম একটু হেসে বলল, 'মানসী, তোমার কথাগুলি যেন হিংসার মত শোনাচ্ছে।'

মানসী জবাব দিল, 'তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই। দিদির অনেক গুণকে আমি হিংসে করি সত্য, কিন্তু ওকে হিংসে করব কেন? ওকে আমি ভালবাসি, দারুণ ভালবাসি, ও যেন আমার সেকেন্ড সেল্ফ্, আমি ছাড়া ওর বন্ধু নেই। আমি ওকে ভালবাসি। সমস্ত দুঃখ থেকে আঘাত থেকে ওকে আমি আগলে রাখতে চাই। সব সময় হয়তো পারি না, কেউ

তা পারে না। দুঃখ মানুষকে পেতেই হয়। অন্যের দেওয়া দুঃখ, নিজের দেওয়া দুঃখ। সব দুঃখ থেকে কেউ কি কাউকে বাঁচাতে পারে? কিন্তু একেক সময় মনে হয় আমি যেন ওর জন্যে সব দিতে পারি। সব স্বার্থ, সব সুখ—।'

অসীম একটু চমকে উঠে বলল, 'মানসী, এসব কথা তুমি আজ কী বলছ, এসব আজ তোমার মনেই-বা কেন এল। আমি তো তোমার স্বার্থ-ত্যাগের কথা শুনতে আসিনি। বরং আমি চাই তুমি আরো বেশি স্বার্থপর হও, তাতে আমারও স্বার্থ।'

মানসী বলল, 'ওকথা তুমি বলতে পার। তোমার পক্ষে ওকথা বলা সহজ। তুমি স্বার্থপর হলে কারো কাছে তোমাকে লজ্জিত হতে হবে না, কারো কাছে তোমার কোন জবাবদিহিরও কিছু নেই।'

তার মানে অসীমের আত্মীয়স্বজন নেই, আর মানসীর সব আছে। বাপের একান্নবর্তী পরিবারে সে প্রধান সহায়। তার দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে। শুধু অসীমের জন্যেই কিছু করবার নেই। কারণ অসীম তাকে একথা বুঝতে দিয়েছে সে মানসীর জন্যে চিরজীবন অপেক্ষা করে থাকবে। মানসী ধীরে সুস্থে তার কর্তব্য করে যাবে। কোথাও কোন উদ্বেগের কারণ নেই।

অসীম বলল, 'জবাবদিহিটাই কি সবচেয়ে বড় কথা। আমি তো এই বুঝি, প্রত্যেক মানুষেরই স্বার্থপর হবার অধিকার আছে। স্বার্থপর না হলে নিজেকে গড়ে তোলা কী করে সম্ভব?'

মানসী একটু হাসল, 'তোমাকে তো নিজের ভাবনা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে হয় না, কিন্তু তাতে কতখানি গঠিত হতে পেরেছ তাই ভাবি।'

এমন সরাসরি আক্রমণ অসীম প্রত্যাশা করেনি। একমুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলল, 'কিছুই হতে পারিনি মানসী, কিছুই হতে পারিনি। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি কিছুই হইওনি, হয়তো কোনদিন কিছু হতে পারবও না—।'

মানসী বলল, 'না পারবারই-বা কী হয়েছে। প্রিয়গোপালবাবু বলেন, প্রত্যেকের মধ্যেই নিজেকে বদলাবার বাড়াবার শক্তি আছে। কিন্তু তাকে কাজে লাগানো চাই—।'

অসীম ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। মানসীকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'থাক থাক, তোমার আর অথরিটি কোট করে কাজ নেই। তোমার সেই ফ্রেণ্ড ফিলসফার এণ্ড গাইডের উপদেশামৃত তো আমাকে প্রত্যেক চিঠিতেই আজকাল উপহার দিচ্ছ, এখন ওসব থাক।'

মানসী একটু হেসে বলল, 'অথচ এই তুমিই খানিক আগে বলছিলে

আমি নাকি হিংসুটে। কাল আমি ওঁর কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। দেখবে মানুষটি কী ভালো। কত ভদ্র।'

অসীম বলল, 'মানসী, ভদ্র আর ভালো মানুষ আমি দেখেছি। আর বেশি দেখবার বাসনা নেই।'

মানসী বলল, 'কিন্তু ওঁর কাছ থেকে সত্যিই আমাদের উপকারের আশা আছে।'

অসীম একটু হাসল, 'তুমি ভুল করছ মানসী। আমি একেবারেই অপদার্থ। গাঁয়ের মজা ডোবা। পচা কাদাজলে ভরতি। সব রকম সংস্কারের বাইরে। তোমরা বরং অন্য কোন সমাজ-কল্যাণের কাজে হাত দাও। খাল কাটো, রাস্তা বানাও, নাইট স্কুল খোল, পৃথিবীতে তো সৎকাজের অভাব নেই। কিন্তু মজা ডোবাকে নিরিবিলিতে, নিজের মনে থাকতে দাও।'

মানসী একটু হেসে গলা নামিয়ে বলল, 'তা কী করে দিই বলো। ওই মজা ডোবা দেখেই যে আমি মজেছি।'

অসীম বলল, 'মোটেই মজোনি। পঙ্কোদ্ধারেই তোমার তৃপ্তি। কিন্তু আমার কথা শোন মানসী। পাঁক ঘেঁটে তোমার কাজ নেই। এ পাঁক অফুরন্ত। কেন মিছিমিছি কষ্ট করবে।'

মানসী গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওই অহংকারেই তুমি গেলে।'

অসীম জবাব দিল, 'না মানসী, তোমার কথা ঠিক নয়। আমার বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই, ভালো চাকরি-বাকরি পাইনি। অহংকার করবার মত আমার কী আছে। নিতান্তই ছোট একটু আমিত্ব। তুমি যতই বল তাকে আমি বিসর্জন দিতে পারিনে।'

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনে দুজনেই ফিরে তাকাল। মাধুরী নয়, মনোমোহন উঠে এসেছেন। তিনি আরো এগিয়ে এলেন। মুহূর্তের জন্যে সেই আবছা অন্ধকারে তার চোখ দুটি যেন জ্বলতে লাগল। কিন্তু একটু বাদে তিনি বেশ শান্ত বাৎসল্যভরা মধুর স্বরে বললেন, 'মানু, তুমি এবার নিচে যাও। কোথায় কার বিছানা হবে তা নিয়ে তোমার মা আর দিদি এখনো হিমসিম খাচ্ছে। যাও, তাদের সাহায্য কর গিয়ে। তাছাড়া রাতও তো কম হয়নি।'

মানসীর স্থির শক্ত মুখ দেখে অসীমের মনে হল সে যেন কিছু বলবে। রূঢ় তীব্রভাষায় তার বাবার আচরণের প্রতিবাদ করবে। কিন্তু তেমন কিছুই হল না। মানসী তার বাবাকে কোন কথা না বলে দ্রুতপায়ে সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগল। নামবার আগে পিছন ফিরে শুধু একবার তাকিয়ে গেল। কিন্তু মনোমোহন ততক্ষণে অসীমের কাঁধে সস্নেহে হাত রেখেছেন, 'আচ্ছা,

দু-মিনিট বাদেই না হয় যেয়ো অসীম। ওদের বিছানা-টিছানার হাঙ্গামা মিটুক, তারপরে আমরা নামব।'

অসীম বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

বলেই তার মনে হল কথাটা বড় বোকার মত বলা হয়ে গেল। কিন্তু ছুঁড়ে দেওয়া তীরের মত বলে ফেলা কথাকেও তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

মনোমোহন পূর্ণ সুযোগ নিলেন, হেসে বললেন, 'তাই ভেবেছিলে বুঝি? কিন্তু বাবা, বুড়ো মানুষের চোখে কি আর অত সহজে ঘুম আসে? নানা চিন্তায়-দুশ্চিন্তায় ঘুমের আর লেশমাত্রও থাকে না। দারুণ ইনসোমনিয়ায় ভুগছি। দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার বেশি কিছুতেই ঘুম হয় না। ঘুম তোমাদের বয়সী ছেলেদের জন্যে। ঘুমও তোমাদের, স্বপ্নও তোমাদের। আমাদের ভাগে এখন অনিদ্রা, তন্দ্রা আর দুঃস্বপ্ন। আর সেই মহানিদ্রার প্রতীক্ষা।'

অসীম একটু বিরক্ত আর বিরস মুখে বলল, 'চলুন এবার নিচে যাই।'

মনোমোহন বললেন, 'হ্যাঁ চল। দেখ, নিচে যেতে আর ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে হাঁফ ধরে যায়। একেক সময় ভাবি ছাদেই ঘুমোই। গরমের সময় এত বড় ছাদে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোতে যে কি আরাম, তা কি আর বুঝিনে? ইনসোমনিয়ার রোগীরও তাতে লাভ আছে। ঘুম যদি না আসে, আকাশের দিকে চেয়ে তারা গুণে গুণেই রাত ভোর করে দেওয়া যায়। কিন্তু কেয়ারটেকারের ভারি আপত্তি। সবাই তাহলে চাইবে। সবাই মাথায় উঠে বসবে।' একটু থেমে বলেন, 'আর হ্যাঁ, আমি তোমাদের ডাকতে এসেছি বলে তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

অসীম গম্ভীরভাবে বলল, 'মনে করবার আর কি আছে।'

মনোমোহন বললেন, 'সত্যিই কিছু নেই। আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক, যে জানাশোনা তাতে তুমিও কিছু মনে করতে পার না, আমিও কিছু মনে করতে পারি না। আমি আমার মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। ওরা নিজেরা স্বাধীনভাবে ঘোরে-ফেরে, যে কোন ছেলের সঙ্গে মিশতে পারে, বন্ধুত্ব করতে পারে, কোন বাধা নেই। সেকেলে মতে সেকেলে পথেই যদি চলতাম তাহলে ওরা প্রত্যেকে এতদিন দু-তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বামীর ঘর করত। কিন্তু আমি ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিনি।'

অসীম কোন মন্তব্য করে কি না মনোমোহন একটু থেমে দেখে নিলেন, তারপর বলতে লাগলেন, 'কিন্তু সংসারে সবাই তো আর অসীম দাশগুপ্ত নয়, মনোমোহন মুখুয্যেও নয়। পাঁচজনের মন এখানে পাঁচ রকম। এই একখানা বাড়ির মধ্যেই যে কত রকমের কত স্তরের মানুষ আছে, তা তুমি ভাবতে পার

না। কিন্তু এতগুলি আইবুড়ো সোমত্ত মেয়ের বাপকে অনেক ভেবে অনেক দিকে চোখ রেখে চলতে হয়।'

'বাবা!'

মানসী নয়, মাধুরী এসে দাঁড়িয়েছে। যে মাধুরী শুধু ছাদটা দেখিয়ে দিয়েই চলে গিয়েছিল, বোন আর তার বন্ধুর নিভৃত আলাপের ব্যবস্থা করে যে আর অপেক্ষা করেনি, সেই আবার ফিরে এসেছে।

অসীম নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে রইল, কোন কথা বলল না।

মাধুরীও অসীমকে কিছু বলল না। মনোমোহনকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি আবার ওপরে এলে কেন বাবা?'

মনোমোহন আমতা আমতা করে বললেন, 'এলাম যে কেন—!'

মাধুরী বলল, 'না, তোমার আসবার কোন দরকার ছিল না। আমিই তো ছিলাম। চল, তোমাদের বিছানা-টিছানা সব ঠিক করে দিয়েছি।'

তারপর অসীমের দিকে চেয়ে একটু মিষ্টি হেসে বলল, 'চল।'

মনোমোহনের খাটের ওপরই অসীমের বিছানা পাতা হয়েছে। মাধুরী এসে মশারি খাটিয়ে দিতে দিতে বলল, 'মিছিমিছি কত রাত হয়ে গেল। ওখানে বোধহয় তুমি সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়।'

অসীম বলল, 'না, না, সবদিন তা হয় না। রাত হয়।'

'রাত জেগে কি কর? রিপোর্ট লেখ?'

অসীম বলল, 'রিপোর্টের কাজ দিনেই শেষ হয়ে যায়। রাত্রে এক আধটু পড়ি। ওখানে সভ্যজগতের সঙ্গে পরিচয় তো বই ছাড়া আর কিছুতে হয় না।'

মাধুরী হেসে বলল, 'রোগটা তোমারও আছে তাহলে?'

অসীম বলল, 'আছে বই কি। রোগটা আছে বলেই তো বেঁচে আছি।'

মাধুরী মুখ টিপে হেসে বলল, 'ভালো কথা নয়। কোন রোগকেই ক্রনিক হতে দেওয়া অনুচিত।'

অসীমের মুখে এল, তুমিও তো একটা ব্যাপারকে ক্রনিক করে রেখেছ। দর্শনার্থীদের দর্শন দিয়ে যাচ্ছো। কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। প্রসঙ্গটা তো প্রীতিকর নয়। মাধুরী নিজেই যখন দুঃখের কথাটা ভুলে গেছে কী দরকার ফের তাকে তা মনে করিয়ে দিয়ে। অসীম বরং খুশীই হল। মাধুরী নিজের লাঞ্ছনা অপমান ভুলে গিয়ে অতিথির পরিচর্যা শুরু করেছে, সে যে মুখখানাকে করুণ আর বিষণ্ণ করে রাখেনি, তার সঙ্গে হেসে কথা বলছে, ঠাট্টা-তামাশা করছে এর জন্যে অসীমের মন প্রসন্নতায় ভরে উঠল। অসীম ভাবল মাধুরীর ওপর তার আরো সহানুভূতি দেখানো উচিত। এই মেয়েটি আরো সান্ত্বনা আর সহৃদয়তার দাবি রাখে।

দেয়ালে পেরেক ঠুকল মাধুরী। মশারির দড়ি বাঁধল। হাওয়া করে মশা তাড়িয়ে মশারিটা ফেলে চারদিকে গুঁজে দিল। অসীম একটু দূরে চেয়ারটায় বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মশারি টাঙানো যেন এই প্রথম দেখছে। প্রথম না হোক অনেকদিন পরে যে দেখল সেকথা সত্যি। মশারির মধ্যে মাধুরী যেন আরো রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। নেটের মশারির ভিতরে ওকে দেখা যাচ্ছে বলেই কি এত সুন্দর লাগছে? না কি ওর হাতের এই স্নিগ্ধ সেবাটুকুই মধুর মনে হচ্ছে অসীমের।

একটু পরেই মাধুরী বেরিয়ে এল। অসীমের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'খুব সাবধানে ঢুকবে। একটু ফাঁক পেলেই অগুনতি মশা চলে যাবে ভিতরে। সারারাত আর ঘুমোতে দেবে না।'

অসীম বলল, 'মন্দ কি। একেবারে নিঃসঙ্গ রাত কাটানোর চেয়ে—।

নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল অসীম। কথাটা আর শেষ করল না লক্ষ্য করল, মাধুরীও লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। ওর এই লজ্জাটুকু উপভোগ করল অসীম। কিন্তু সেই সঙ্গে এ আশঙ্কাটুকুও রইল, ও আবার কিছু মনে না করে বসে।

অসীম বলল, 'তোমাদের এদিকে মশা বুঝি খুব বেশি?'

মাধুরী হেসে বলল, 'আর বোলো না। এখানকার মশার খুব খ্যাতি আছে। মশা তো নয় একেকটি রাক্ষস।'

মাধুরীর হাসি দেখে অসীম খুশী হল। ও কিছু মনে করেনি বরং কৌতুকটুকু উপভোগ করেছে।

অসীম বলল, 'তুমি যে ভাবে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে দিয়ে গেলে তাতে রক্ষ-যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর কাউকেই আর ভয় নেই।'

মাধুরী হেসে বলল, 'তুমি তাহলে ভিতরে গিয়ে দুর্গেশ্বর হও, আমি চলি।'

দোরের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মাধুরী বিস্মিত হয়ে বলে উঠল 'এ কি মানসী, তুই যে এখানে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন। ভিতরে আয়।'

অসীম ঘরের ভিতর থেকেই মানসীর গলা শুনতে পেল, 'না, আমি এখন শুতে যাই।'

দুই বোনই একসঙ্গে চলে গেল।

অসীম একটু অবাক হল। মানসী কি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল নাকি। আশ্চর্য কাণ্ড। ভিতরে এল না কেন।

মানসী না এলেও মাধুরী ফের এসে দাঁড়াল। ছোট বোনের বিরুদ্ধে নালিশের ভঙ্গিতে বলল, 'আচ্ছা জেদী মেয়ে যাহোক। এত করে বললাম

আয়, এলো না তো এলোই না। তোমার জলের গ্লাসট্যাস সব রইল। আর যদি কিছু লাগে—।'

অসীম একটু গম্ভীরভাবে বলল, 'আর আবার কী লাগবে।'

মাধুরী কি বলতে যাচ্ছিল।

মাদুর আর বালিশ বগলে করে মনোমোহন এসে হাজির হলেন, 'আমার বিছানা কোথায় পেতে দিয়েছিলি মাধু?'

'কেন, ওই প্যাসেজের মধ্যে—। মা তো তাই বলল।'

মনোমোহন বললেন, 'না, ওখানে আমার ঘুম হবে না। এই গরমের মধ্যে—। তাছাড়া এই ঘরের মেঝেতেই আমাকে দাও। পাখার হাওয়া আছে। বেশ থাকব।'

নিজের বিছানা নিজেই পেতে নিলেন মনোমোহন।

মাধুরী হেসে বলল, 'কিন্তু তুমি এ ঘরে থাকলে সারারাত বক বক করবে। অসীমদাকে একটুও ঘুমোতে দেবে না।'

মনোমোহন এবার উষ্ণ হলেন, 'অসীমদার ঘুমের জন্যে বুঝি শুধু তোদেরই দরদ? আর আমার কোন ভাবনা নেই, না?' তারপর অসীমের দিকে চেয়ে একটু হেসে নরম সুরে বললেন, 'তুমি ভেব না অসীম, আমি আর তোমাকে একটুও ডিস্টার্ব করব না। মাধুরী, তোদের বিশ্বাস না হয় আমার দুই ঠোঁট ছুঁচ-সুতোয় গেঁথে দিয়ে যা।'

অসীম বিব্রত হয়ে বলল, 'ছি ছি ছি, এ কি বলছেন আপনি মেসো-মশাই। আপনি এ ঘরেই থাকুন, আমার কোন অসুবিধে হবে না। আমিই বরং আপনাদের অসুবিধে ঘটাচ্ছি। আপনি ওপরে উঠে আসুন, আমি নিচে নামি। মেঝেয় ঘুমোবার আমার বেশ অভ্যাস আছে।'

মনোমোহন প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'না না না, তাই কি হয়? তুমি হলে অতিথি নারায়ণ।—মাধুরী তোরা এখন যা। অসীমের সঙ্গে আমার ফুল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়ে গেছে। কারোরই কোন অসুবিধে হবে না।'

মাধুরী অসীমের দিকে চেয়ে অসহায় ভঙ্গিতে একটু হাসল। তারপর বলল, 'টিপয়ের ওপর জলের গ্লাস রইল, আর যদি কিছুর দরকার হয়—।'

অসীম বলল, 'আর কিছুর দরকার হবে না।'

মনোমোহন বললেন, 'যদি কিছুর দরকার হয় আমিই তো আছি।'

মাধুরী চলে গেলে তিনি উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন, সুইচ অফ করে দিলেন। তারপর আর একবার অভয় দিয়ে বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও অসীম, আমি তোমাকে মোটেই ডিস্টার্ব করব না।'

অসীম ভাবল, ছারপোকায় যদি বেশি উৎপাত না করে, তাহলে কেউ আর তার ঘুমের ব্যাঘাত করতে পারবে না।

বিছানায় অবশ্য ছারপোকা ছিল না। তবু শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এল না অসীমের। ছারপোকাই ঘুমের একমাত্র আততায়ী নয়। চিন্তাকীটেরা আরো মারাত্মক।

মনোমোহন যে ব্যবহারটা করলেন তারপর একটি মুহূর্তও আর এ বাড়িতে থাকা উচিত ছিল না অসীমের। সঙ্গে সঙ্গে সে যদি এখান থেকে বেরিয়ে যেত তাহলেই অপমানের যোগ্য জবাব দেওয়া হত। অসীমরা ছাদে আছে জেনেও মনোমোহন সেখানে গিয়ে হানা দিয়েছেন। ধমকে মেয়েকে নিচে পাঠিয়েছেন, মিষ্টি মিষ্টি করে অসীমকেও কম বলেননি। মানসী যেন তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে আর অসীম আঠার-উনিশ বছরের তরুণ। স্থানকাল বিবেচনা না করে তারা যেন যে-কোন কাণ্ড করে ফেলতে পারত। তাই মনোমোহন তাদের কান মলে ফিরিয়ে না এনে পারেননি। তার আর অসীমের এই একই ঘরে রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত। এর উদ্দেশ্য কি কারো বুঝতে বাকি থাকে? মনোমোহনের আশঙ্কা দেখে, তাঁর এই সতর্ক পাহারা দেওয়ার ধরন দেখে হাসিও পায়, আবার রাগে গা-ও জ্বলে। অসীম কি এমনই কাণ্ডজ্ঞানহীন, আসঙ্গপিপাসায় এমনই কাতর যে, একবাড়ি লোকের মধ্যে সে মানসীর সঙ্গলাভের জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠত? আর তাই যদি হতই তাহলে কি মনোমোহন তাকে বাঁধতে পারতেন? যতই অতিথি নারায়ণ, অতিথি নারায়ণ করুন মনোমোহন অসীমকে একেবারেই বিশ্বাস করেন না। আর তাঁর সেই চূড়ান্ত অবিশ্বাসের পাত্র হয়েও অসীম তাঁরই খাটে, তাঁরই বিছানায় সুখশয্যা পেতেছে।

দিনের প্রথম দিকে এই মানুষটিকে কী সরল আর উদার বলেই মনে হয়েছিল অসীমের। মানসীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে একথা জেনেও, যে ছেলে তাঁর সঙ্গে পরম দুর্ব্যবহার করেছে অসীম সেই ছেলের বন্ধু জেনেও মনোমোহন তাকে সাদরে বাড়িতে ডেকেছেন, থাকতে বলেছেন, আপ্যায়ন করে খাইয়েছেন, নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলেছেন, অভাব-অনটনের কোন কথাই গোপন রাখেননি। বিসদৃশ গোঁফ আর অতিকথনের অভ্যাস ছাড়া মনোমোহনের কোন দোষই অসীমের চোখে পড়েনি। ঠোঁটের ওপরের আর ভিতরের দুই অসঙ্গতিই তার তখন বাহ্য বলে মনে হয়েছে। এই দরিদ্র পোষ্যভারানত রিটায়ার্ড পোস্টমাস্টার মাঝে মাঝে অসীমের মনকে সহানুভূতিতে আর্দ্র করে দিয়েছেন। উপযুক্ত ছেলের কাছ থেকে যিনি আঘাত পেয়েছেন, সংসারে সমাজে অবহেলিত অবজ্ঞাত হয়ে রয়েছেন, সেই মানুষটির ওপর মমতা বোধ করে নিজের মনেই মহত্ত্ব আর মাধুর্যের স্বাদ পেয়েছে অসীম। কিন্তু তাঁর রাত্রির আচরণ সেই মাধুর্যকে একেবারে মুছে ফেলেছে। অসীমের মনে হল, মনোমোহনের এখনকার এই ব্যবহার যেমন অনুদার

তেমনি অশালীন আর শিষ্টাচারবিরোধী। তিনি পুলিস-অফিসার অসীমকে কয়েদী বানিয়ে পাহারা দিচ্ছেন, এর চেয়ে দৃষ্টিকটু আর হাস্যকর ব্যাপার কি হতে পারে। সঙ্গতিহীন সামঞ্জস্যহীন মানুষ এক সৃষ্টিছাড়া জীব। যে মানুষ এই মুহূর্তে উদার, পরমুহূর্তে সে সঙ্কীর্ণ। যে এক বিষয়ে উদাসীন, আর এক বিষয়ে সে পরম আসক্ত। যে মানুষ একজনের কাছে সরল আর একজনের কাছে সে কুটিল। একজনের যে প্রিয়, আর একজনের সে পরম শত্রু। শুধু তাই কেন, একই ব্যক্তির সে প্রিয় এবং শত্রু। একই আধারে প্রেম আর দ্বেষ-বিদ্বেষ মিশে রয়েছে। কখন যে কোন্‌টা উপচে পড়বে মানুষ কি তা জানে না? সে কি প্রবৃত্তির হাতের পুতুল? তার পদতলে দাসানুদাস?

মনোমোহনের মত রক্ষণশীল মানুষ নিজের মেয়েদের তো পাহারা দেবেনই, অসীম এমন কতজনকে জানে যাঁরা পরের বেলায় কোন বাঁধনই মানেন না, তাঁরাও নিজের স্ত্রী-কন্যাকে অন্যের স্পর্শ থেকে অন্যের দৃষ্টি থেকে প্রাণপণে আড়াল করে রাখেন। কামিনী যেন কাঞ্চনের মতই সিন্দুকে তুলে রাখবার ধন। কিন্তু যারা হাত বাঁধে, পা বাঁধে, তারা কি মন বাঁধতে জানে। এই মনোমোহন যদি নিজের মেয়ের মনকে চিনতেন তাহলে এমন টহলদার হয়ে রাত জাগতেন না। ভবানীর ভ্রূকুটি ভঙ্গী ভবই বুঝতে পারেন, ভূধর পারেন না। মানসীকেও আজকাল কতখানি বুঝতে পারেন মনোমোহন? তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-স্বপ্নের কতটুকু খোঁজ রাখেন?

'আচ্ছা অসীম!'

অনিদ্রার রোগী মনোমোহন তাঁর প্রতিজ্ঞা ভেঙেছেন। ভাঙবেন একথা অসীম জানত। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি? দ্বিতীয় ডাকেও সাড়া দিল না অসীম।

তৃতীয়বারে মনোমোহন কণ্ঠ আর হৃদয় দুই-ই তুলে ধরলেন, 'বাবা অসীম, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

অসীম মনে মনে বলল, আপনার মত লজ্জাহীন, বিচার-বিবেচনাহীন মানুষের ঘরে কারো কি ঘুমোবার জো আছে! মুখে সাড়া দিয়ে বলল, 'না ঘুমুইনি।'

মনোমোহন শুনে খুশী হয়ে বললেন, 'জানি অসীম, তুমি ঘুমোতে পারনি। যারা ভাবুক, চিন্তাশীল রাত্রে তাদের তো ঘুমোবার জো নেই বাবা। তাদের permanent night duty. তাছাড়া, যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ। একথা আমি তোমার মাসীমাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারিনি অসীম। প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করেও বোঝাতে পারিনি।'

অসীম সাড়াও দিল না, সায়ও দিল না। মৌন থেকে এই ইশারাই

দিতে চাইল যে, রাত দুপুরে দার্শনিক অদার্শনিক কোনরকম আলোচনায় তার সম্মতি নেই।

কিন্তু অসীম সাড়া দিল কি দিল না তা লক্ষ্যই করলেন না মনোমোহন। তিনি নিজের ঝোঁকে বলে চললেন, 'আচ্ছা অসীম, এই সমাজের কি হবে বলতে পার?'

জবাব না দিয়ে নিষ্কৃতি মিলবে না, অসীম তাই বলল, 'কোন্ সমাজের কথা বলছেন?'

মনোমোহন বললেন, 'আরে যার মধ্যে আমরা বাস করছি তার কথা ছাড়া আর কিসের জন্যে এত রাত্রে আমার মাথাব্যথা হবে বলো?'

অসীম বলল, 'তা ঠিক।'

মনোমোহন বললেন, 'আমার এমনিতেই ঘুম কম। কিন্তু এই হতভাগা দেশটার কথা যখন ভাবি তখন ঘুম একেবারেই ছেড়ে যায়।'

অসীম একটু তরল সুরে বলল, 'ঘুমের যদি সত্যই ব্যাঘাত হয় বলে মনে করেন তাহলে দেশ আর সমাজের কথা রাত্রে মোটেই ভাববেন না মেসো-মশাই। ওসব চিন্তা দিনের বেলার জন্যে রেখে দেবেন।'

মনোমোহন একটু চুপ করে থেকে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'অসীম তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ। তোমার তো সোমত্ত মেয়ে ঘাড়ের ওপর নেই, আমার চোখের ঘুম কিসে যে কেড়ে নিয়েছে তা তুমি বুঝবে না।'

অসীম চুপ করে রইল।

মনোমোহন বলতে লাগলেন, 'আমার মাধুরী রূপসী না হলেও কুশ্রী তো কেউ ওকে বলতে পারবে না। যাকে বলে শ্রী লাবণ্য, তা ওর যথেষ্ট আছে। শিক্ষাদীক্ষাও দিয়েছি। অবশ্য ওরা নিজেরাই কষ্ট করে শিখেছে গরীবের ঘরের মেয়ে। নিজেরাই প্রাইভেট টিউশনি করে পড়ার খরচ চালিয়েছে। আমি ওদের সমস্ত বই কিনে দিতে পারিনি, কলেজের মাইনে টাইনেও মাঝে মাঝে বাকি পড়েছে। কিন্তু তাই বলে ওরা কেউ উদ্যম হারায়নি, পড়াশুনায় ফাঁকি দেয়নি। ভালোভাবেই পাশ করে বেরিয়েছে শুধু নোট মুখস্থ করা পাশ নয়, লেখাপড়া ওরা যে যেটুকু জানে তা খাঁটি তার মধ্যে ভেজাল নেই। বুঝেছ অসীম?'

অসীম বলল, 'হুঁ।'

মনোমোহন বলতে লাগলেন, 'তারপর লেখাপড়া শিখেছে বলে, কি চাকরি-বাকরি করে বলে ওরা যে বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে তা ভেব না। ওরা সব কাজ জানে, ঘর-সংসারের সব কাজ নিজের হাতে করে রান্নাবান্নায়, সাজানো-গুছানোয় সমান উৎসাহ। বিলাসিতা বাবুগিরি করবার মত পয়সা তো ওদের বাপের নেই, ওরা সে সব শিখবে কোথায়? শেখেনি

ভালোই হয়েছে। আলস্য আমার চক্ষুশূল। মাধুরীর হাতের রান্না তুমি আজ খেয়েছ, ওর হাতের সেবাও তুমি দেখে থাকবে। তুলনা হয় না, বুঝলে অসীম, তুলনা হয় না। এতদিনের যে পাকা গিন্নী ওর মা, সে-ও ওর কাছে হার মানে। যাকে বলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তাই। বুঝেছ?'

অসীম বলল, 'হুঁ।'

মনোমোহন ক্ষোভের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'কিন্তু হলে হবে কি, এই পোড়া দেশে এমন একজন কেউ এসে বলল না, আপনার লক্ষ্মীটিকে আমার ঘরে দিন, সে এসে আমার ঘর আলো করে তুলুক। চিত্তকে আনন্দে ভরে দেয় বলেই তো মেয়ের নাম নন্দিনী। মেয়ে হল রত্ন। কিন্তু সেই রত্নকে আমাদের দেশ চিনল না। সে যেন পাথরের নুড়ি। এমনি তার অনাদর, এমনি অবহেলা। যারা রত্ন যাচাই করতে আসে তারা জীবনেও কোনদিন রত্ন দেখেনি, তাই তাদের চোখে সবই কাচ। তারা জানে না তাদের নিজের চোখগুলিও পাথরের। তাই তো সে চোখে লজ্জা নেই, মায়া-মমতা নেই, মানুষের যা থাকে তার কিছুই নেই।'

কোন্ প্রসঙ্গে যে কথাগুলি মনোমোহনের আজ মনে পড়ছে তা বুঝতে বাকি নেই অসীমের। মাধুরী এবারও অমনোনীতা হয়েছে। তার জন্যে প্রথমে মেয়ের ওপরই রাগ করেছিলেন মনোমোহন, এবার পক্ষ পরিবর্তন করেছেন। কিংবা আসল রাগটা কখনোই নিজের মেয়ের ওপর ছিল না। শুধু একটা আবরণ ছিল মাত্র। এখন তা সরে গেছে।

অসীম সহানুভূতির আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, 'মাধুরীর গুণ আছে।'

মনোমোহন উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কিন্তু কে সেই গুণের দাম দেয় বল? দাম তো দেয়ই না, বরং টাকা চায়। ওর শরীরের যেখানে যতটুকু খুঁত আছে তার জন্যে টাকা, রঙ ময়লা তার জন্যে টাকা। নাকটা তেমন উঁচু নয় তার জন্যে ক্ষতিপূরণ, পটে আঁকা ছবির মত চোখ নয়, তার জন্যে দাও আরো পাঁচশ। এই হল এদের মনোবৃত্তি, বুঝলে অসীম? অথচ সমাজে এরাই শিক্ষিত বলে, সভ্য বলে গর্ব করে, নিজেদের প্রগতিশীল বলে জাহির করে বেড়ায়। শিক্ষা সংস্কৃতি প্রগতির নমুনা তো এই। ঘেন্না ধরে গেছে। আমার একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে।'

অসীম এবারও কোন কথা বলল না। কিন্তু সাড়া না দিলেও সে যে ঘুমোয়নি তা মনোমোহন টের পেয়েছেন।

মনোমোহন বলে যেতে লাগলেন, 'এককে সময় মনে হয় কি জানো? ভাবি ওকে পরিষ্কার বলে দিই, মা, পারলাম না। তুই তোর নিজের পথ দেখ, স্বয়ম্বরা হ'। নিজে পছন্দ করে ভালোবেসে একজনকে বিয়ে কর। কিন্তু

বাপ হয়ে তো তা বলা যায় না। ওর মা ওকে ঘরের কাজ শিখিয়েছে, আমি লেখাপড়া, সভ্যতা-ভব্যতা যতদূর পারি শিখিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ও বিদ্যা তো বাপ হয়ে শেখানো যায় না।'

অসীম চুপ করে রইল। কন্যাদায় আজকাল আর দায় নয়। বিশেষ করে যে মেয়ে উচ্চশিক্ষা পেয়েছে, নিজের জীবিকা খুঁজে নিয়েছে, তার বিয়ে নিয়ে বাপের অত না ভাবলেও চলে। তবু ভদ্রলোকের ওপর কেমন যেন মায়া হল অসীমের। মনোমোহনের অসঙ্গত ব্যবহারের কথা তার আর মনে পড়ল না, এমন কি, তিনি যে অনর্গল কথা বলে তাকে একটুও ঘুমুতে দিচ্ছেন না সেই অভিযোগ পর্যন্ত ভুলে গেল।

একটু বাদে মনোমোহন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'ছেলেটা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় অন্যায় করে ফেললাম। কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলাম না। বকে বকে ওর ঘুমের ব্যাঘাত করে তবে ছাড়লাম। কী যে অভ্যাস হয়েছে।' ফের একটু কাল চুপ করে রইলেন। তারপর আবার আত্ম-পক্ষ সমর্থন। 'কিন্তু কাউকে না কাউকে মনের সব কথা বলতে না পারলে মানুষ কি শান্তি পায়? মনে হয় বুকের ভিতরে যত কিছু জমেছে সব ঢেলে উজাড় করে দিই। কিন্তু বলতে যাওয়া ভুল। পরের কথা পরে বেশিক্ষণ শোনে না। সে বিরক্ত হয়। আমার মা দুঃস্বপ্ন দেখলে জলের কাছে বলতেন। যদি দুঃখের কথাও মানুষ খানিক খানিক গাছপালা পশুপক্ষীকে শোনাত তাহলে বেশ হত।'

অসীম স্তব্ধ হয়ে মনোমোহনের স্বগতোক্তি শুনতে লাগল। সংকল্পের পর তিনি বোধহয় এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। খানিক বাদে তাঁর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আরো কিছুক্ষণ বাদে শুধু নাকের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

অসীম হাসল। এতক্ষণে অনিদ্রার রোগীর একটা সুরাহা হল।

কিন্তু একবার ঘুম চটে গেলে সহজে অসীমের ঘুম আর আসতে চায় না। তাছাড়া অন্যের নাসিকাধ্বনি আর একজনের নিদ্রার পক্ষে অনুকূল নয়। এপাশ-ওপাশ করা ছাড়া বাকি রাতটুকু আর বোধহয় কিছু করবার থাকবে না অসীমের।

জীবনের আর একটি দিন শেষ হল। একটি দিন আর একটি রাত। রাতকে আর আলাদা করে কেউ দেখে না, উল্লেখ করে না। দিনের তারিখটির মধ্যেই তাকে গুঁজে দেয়। কিন্তু রাতগুলি মানুষ ঘুমিয়ে কাটায় বলেই তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টের পায় না। যারা মাঝে মাঝে জাগে, জেগে জেগে দেখে তারাই বুঝতে পারে রাত্রির আলাদা সত্তা আছে। তাতে শুধু বাইরের প্রকৃতির রূপ আর রং বদলায় না, মানুষের ভিতরের প্রকৃতিকেও রূপান্তরিত করে।

বাইরের পৃথিবী আঁধারে আবৃত হয় মনের গভীরে আর এক গোলার্ধ উন্মাটিত হবে বলে।

আর একটা দিন কাটল। কাল কি অসীম ভাবতে পেরেছিল এইদিনটা ঠিক এইভাবেই কাটবে? এইভাবে এই মানুষগুলির সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মনে এইসব অনুভূতির উদ্রেক হবে? ভাবতে পারেনি। ভবানীপুরে তার এক বন্ধুর ওখানেই উঠবে ঠিক করে এসেছিল। মানসী সব বেঠিক করে দিল। বন্ধুর ওখানে উঠলে নিশ্চয়ই এসব ঘটত না। হয়তো সত্যিই ডালহৌসী স্কোয়ারে যেতে পারত। চাকরির ব্যাপারে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য কি কর্মান্তরিত হওয়ার জন্যে এক-আধটু চেষ্টা-চরিত্র করা যেত। দিনের এই ছকটিতে পাশায় অন্য দান পড়ত, গুটিগুলি অন্য চালে চলত। বাসনা, বাক্য, কর্ম, মনন এই হল চতুরঙ্গ।

কোন কোন দিনের কিছু কিছু পরিকল্পনা থাকে। অফিসের ডায়েরিতে নির্দিষ্ট থাকে সেই কর্মসূচী। কিন্তু আজকের এই ছুটির দিনটিকে সে আগে থেকে লিপিবদ্ধ করেনি, পরিকল্পনায় গেঁথে রাখেনি, শুধু কল্পনায় ছেড়ে দিয়েছে। যা ঘটবার ঘটুক, যা হবার হোক। সারাদিন অবশ্য এমন কিছুই ঘটেনি যা অভাবিত। কিন্তু কোন পদক্ষেপ, কোন বাক্যাংশ সে ভেবে রেখেছিল একথাও বলা চলে না। ভাবা থাকে না বলেই জীবনে এত দুঃখ, এত আঘাত, এত বঞ্চনার পরেও এত বিস্ময়, এত রস, এত রহস্য অবশিষ্ট থাকে।

অসীম নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চায় না। নিতান্ত কৌতুক ছাড়া গণৎকারের কাছে কোনদিন সে হাত মেলে ধরেনি। তার কিছু জানতে চায় না। আগামী দিনটির পাতা সে আজই পড়ে ফেলতে চায় না। অজ্ঞাত অপঠিত সেই পাতাটি রহস্যে ঢাকা থাকুক, রঙীন খামে মোড়া প্রিয়ার চিঠির মত।

মনে আছে, ক্লাস নাইনে একদিন অঙ্কের মাস্টারমশাই জানকীবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ওহে সেকেণ্ড ক্লাসের বাবুরা, ভবিষ্যতে তোমরা কে কি হবে ঠিক করেছ?'

কেউ বলেছিল ডাক্তার, কেউ বলেছিল ইঞ্জিনীয়ার, কেউ প্রোফেসর, যারা দুঃসাহসী ডানপিটে তাদের কেউ কেউ জাহাজের ক্যাপ্টেন কি উড়োজাহাজের পাইলট হবার সাধ জানিয়েছিল। শুধু অসীম বলেছিল, 'আমি জানিনে।'

একথা শুনে মাস্টারমশাই ধিক্কার দিয়েছিলেন, 'ছি ছি ছি। হতে পার কি না পার সাহস করে কথাটা বলতে পারলে না?' সহপাঠীরা হেসে উঠেছিল। দু-একজন বন্ধু চুপে চুপে উৎসাহ দিয়েছিল, 'বল না, বলে দে না একটা কিছু।'

কিন্তু অসীম কিছুই বলতে পারেনি, কিছু হওয়াটা বোধহয় তার মনঃপূত হয়নি।

জীবন সেই অসংকল্পের শোধ নিয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে যে যা হতে চেয়েছিল হয়তো সবাই তা হতে পারেনি। কিন্তু অনেকেই কিছু না কিছু হয়েছে। যে উকিল হতে চেয়েছিল সে প্রোফেসর হয়েছে, যে ডাক্তার হবে বলে ভেবেছিল সে গেছে ইঞ্জিনীয়ারিং লাইনে, কোথাও না কোথাও সবাই গিয়ে পৌঁছেছে। অসীমেরই শুধু কোন গন্তব্য নেই। সে অর্ধপথে লেখা-পড়া বন্ধ করেছে, কোন কাজে সে মন বসাতে পারেনি। কয়েকবার অফিস বদলেছে কিন্তু তাতে কি স্বভাব বদলায়? কতবার কল্পনা করেছে, সেও ভাস্করের মত নিজের জীবনকে একটা বিশেষ রূপ দেবে, পাথর কুঁদে কুঁদে মনোহর মূর্তি গড়বে, সেও হবে স্বপরিকল্পিত, স্বনির্মিত মানুষ। কিন্তু আসলে সে আর পাঁচজনের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। পাঁচজন মানে পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক। সে তার হাতে কাদার পুতুল। অমনিতে সে নিয়তি মানে না, অদৃষ্ট মানে না, শুধু স্বয়ং কর্তৃত্বে, শুধু পুরুষকারে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস শুধু একটা ফ্যাশন, শুধু আধুনিক বলে নিজের পরিচয় দিতে পারবার আত্মপ্রসাদ। চলবার সময় পুরুষকারকে জীবন থেকে একেবারে বাদ দিয়ে চলে। সর্বদিক থেকে অন্যনির্ভর পুরুষের কোথায় পুরুষকার, কোথায় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব? পুরুষ শুধু আকারে, পৌরুষ শুধু বাক্য আর বিতর্কে। আর কোথাও তার পুরুষকারবাদের অস্তিত্ব নেই। তাই সে যা হতে চায়নি তাই হয়েছে এবং হওয়ার পরেও বলছে, চাইনে চাইনে।

অসীমের মনে হল, তার এই দ্বিধা মানসীকেও দুর্বল করেছে। তার ভালোবাসাকে, অসীমের ওপর তার আকর্ষণকে দুর্বল করেছে। বরং গোঁয়ার, একগুঁয়ে পুরুষকে মেয়েরা ভালোবাসে। যে বড়াই করতে জানে, নিজেকে জোর করে জাহির করতে জানে তার গলাতেই তারা বরমাল্য দেয়। আর যার আত্মবিশ্বাস নড়বড়ে, তাকে তারা মোটেই বিশ্বাস করে না। তারা গাছের মত, পাহাড়ের মত শক্ত আর অবিচল কিছুর ওপরই নির্ভর করতে চায়।

হয়তো মানসীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে জোর সঞ্চারিত করে দিতে পারেনি অসীম। তাই বছরের পর বছর তারা একই জায়গায় রয়ে গেছে। না, এক জায়গায় কেউ থাকতে পারে না। হয় এগোতে হবে, না হয় পিছোতে হবে। হয় উঠতে হবে, না হয় নামতে হবে। তারা পিছোচ্ছে, তারা নামছে। তাদের সম্পর্কের উত্তাপ ক্ষয় হচ্ছে, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

নিজের মধ্যে বাসনার সেই আগুন নেই বলেই মানসী তার দায়িত্ব কর্তব্যের দোহাই দিচ্ছে। দিদির বিয়ে না হলে সে এখান থেকে নড়তে

পারে না। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেই কি পারবে? তখন কি বলবে না, 'আমি চলে গেলে আমার বুড়ো বাপ আর ভাই-বোনগুলিকে কে দেখবে?' মানুষের পরার্থপরতার কি শেষ আছে? স্বার্থপরতা এক জায়গায় এসে থামে, কিন্তু পরার্থপরতা থামতে জানে না।

মানুষ না থামলে ঘর বাঁধবে কি করে? শঙ্কর আর নন্দিতা থেমেছে, তারা ঘর বেঁধেছে। সেই স্বার্থপরের ঘরে নতুন করে পরার্থপরতার জন্ম হচ্ছে। তারাও একজনের জন্যে আর একজন ছাড়ছে, ছেলেমেয়ের কল্যাণে আত্মোৎসর্গের জন্যে তৈরী হচ্ছে। বেশ করেছে শঙ্কর। যাকে সে ভালোবাসে তাকে তার পুরোন পারিবারিক ভূমি থেকে উপড়ে নিয়ে এসেছে। মনের জোর আছে শঙ্করের, বাহুর জোর আছে। আর যার জোর আছে সে স্বার্থপর হতে ভয় পায় না। কিংবা যে স্বার্থপর হয়, সেই নিজের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে জানে। সংসারে যাঁরা বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, ধনবান, খ্যাতিমান তাঁরা সবাই স্বার্থপর। ভদ্রভাষায় আত্মকেন্দ্রিক বলা যায়। তাতে শব্দ বদলায়, অর্থ বদলায় না। তাঁরা সবাই স্ব-কে গঠন করতে তৎপর। অসীমও স্বার্থপর। আত্মগঠনে নয়, আত্মপঠনে।

অসীম যদি শঙ্করের মত দৃঢ়মনা, বলবান পুরুষ হত, বেশ হত। তাহলে সেও মানসীর দ্বিধা দৌর্বল্যকে তুচ্ছ করে, তার দায়িত্ব কর্তব্যকে দু' পায়ে মাড়িয়ে তাকে এখান থেকে ছিঁড়ে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু শঙ্করের মত অসীমের সেই জোর তো নেই। নন্দিতার মত মানসীর সেই দৈহিক সৌন্দর্যই কি আছে? শঙ্করের স্ত্রী সত্যিই রূপবতী। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই অসীম তাকিয়ে দেখেছে একবার, লুকিয়ে দেখেছে অনেকবার। যতক্ষণ দেখেছে ততক্ষণ পৃথিবীর কোন কথাই আর ভাবেনি। চাকরির কথা নয়, মানসীর কথা নয়। শঙ্করের নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতার সমালোচনা পর্যন্ত করতে ভুলে গেছে। রূপ সব ভোলায়। যে মেয়ে বলে, 'রূপে তোমায় ভোলাব না' সে মনে মনে জানে, তার রূপ নেই। ভালোবাসা নাকি ভোলায় না, পথ দেখায়। কিন্তু মানুষ পথ দেখতেও চায়, ভুলতেও চায়। তার চাওয়ার মধ্যে এই উল্টো-পাল্টা হাওয়া নিরন্তর বইতে থাকে। সে পথও চায়, বিপথও চায়, পথ্যও খায়, কুপথ্যও খায়। তার জন্যে নিজের কাছে, পরের কাছে বার বার ধমক খায়, তবু স্বভাব যায় না।

নন্দিতার পাশে মানসী একেবারেই দাঁড়াতে পারে না। তার রূপ নেই। তার যা রূপ তা শুধু অসীমের চোখে। কিন্তু যার চোখে বাসনার কাজল নেই, (বাসনাই হোক আর ভালোবাসাই হোক, বাসনা ছাড়া ভালোবাসা কোথায়-বা বাসা বাঁধতে পারে?) সে মানসীর কোন অঙ্গে কোন রূপ খুঁজে পাবে না। মানসী তা জানে। হয়তো সেইজন্যেই সে নন্দিতার মত নিষ্ঠুর বেপরোয়া

হতে ভয় পায়। হয়তো সেইজন্যেই গুণকে আঁকড়ে থাকতে চায়। গুণ আর কি! মানসী গাইতে জানে না, বাজাতে জানে না, অন্য কোন শিল্পে তার দক্ষতা নেই। বি-এ পাশ করে লাইব্রেরিয়ানশিপ পড়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে কাজ নিয়েছে। বিয়ের বাজারে তার রূপ যাদের চোখে পড়বে না এই গুণটুকুও কি তাদের চোখে পড়বে? কিংবা শুধু এই গুণই কি অন্য কারো মনে বাসনা আর ভালোবাসার উদ্রেক করবে? মানসী জানে এই গুণই তার যথেষ্ট নয়। তাই নিজের ঘরের মধ্যে সে পরার্থপরতায় বড় হতে চায়, সব স্বার্থ আর সুখ ত্যাগ করে হৃদয়বত্তার খ্যাতি লাভ করতে চায়। অসীমের কাছে সহজে ধরা দিতে চায় না পাছে সহজে ছাড়া পেতে হয়।

অসীমের নিজের আত্মবিশ্বাস নেই। কিন্তু মানসীরই কি আছে? নিজের রূপের দৈন্য সে জানে। তবু এমন একটা ভঙ্গি আছে যেন ওসব সে গ্রাহ্য করে না। যেন স্বাস্থ্য কিছু নয়, দেহসৌষ্ঠব কিছু নয়। নিজের শ্রীহীনতা নিয়ে মানসী কোনদিন অসীমের কাছে বিনয় করেছে বলে তার মনে পড়ল না। এ ধরনের বিনয় অবশ্য অসীম চায় না। দৈহিক গড়নের ওপর কারো হাত নেই। তবু মেয়েদের মুখে একটু বিনয় একটু কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠলে তাতে তার চরিত্রের মাধুর্য বাড়ে। কিন্তু মানসী যেন পণ করেছে কোন নমনীয়তা কমনীয়তার ধার সে ধারবে না। সে যা আছে বেশ আছে। সে যা করে তাই তাকে মানায়। এই যে আত্মতুষ্টি আর আত্মপ্রাধান্যের ভাব এও এক ধরনের রোগ। মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় মানসকূট। আসলে মানসী জানে সে অত বড় নয়। তার গর্ব করবার মত বিশেষ কিছু নেই। অসীম যদি তাকে ভালোবেসে থাকে দয়া করেই ভালোবেসেছে। কিন্তু পাছে তার দয়াটা ধরা পড়ে তাই মানসী সব সময় এমন একটা ভাব নিয়ে চলে যেন সে-ই অসীমকে দয়া করেছে। বার বার মনে করিয়ে দেয়, বিদ্যায় বুদ্ধিতে সামর্থ্যে অসীম পৌরুষের পরিচয় দিতে পারেনি। নিজের দৈন্য অসীম জানে। তার জ্বালা সে নিজে ভোগ করে। কিন্তু তাই বলে মানসী তাকে দীন ভাববে কেন? তার কোন্ রূপগুণের দম্ভে? দম্ভ আসলে দৈন্যেরই ছদ্মবেশ। মানসী জানে কোথায় তার দৌর্বল্য। তাই ছোট বোন মঞ্জুর সঙ্গে অসীম একটু রসিকতা করলে তার সহ্য হয় না। যতই উদারতা দেখাক, দিদির জন্যে যতই সর্বস্ব ত্যাগের পণ করুক, অসীম মাধুরীকে একটু ডাক-খোঁজ করলে মানসীর বেশ হিংসে হয়। অসীম মনে মনে হাসল, আহা বেচারা! মাধুরী যে অসীমের বিছানা পেতে দিয়ে গেছে, মশারি টানিয়ে দিয়ে গেছে, পান এনে দিয়েছে, জল এনে দিয়েছে তা মানসীর বোধহয় সহ্য হয়নি। সেইজন্যেই সে তখন দোরের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। অত ডাকাডাকিতেও ঘরে ঢোকেনি। এ কি শুধু অভিমান? না অসূয়া? আহা বেচারা! নিজেই উঠে গিয়ে

অসীমের ওকে ডেকে আনা উচিত ছিল। কিন্তু কী করে আনবে অসীম? মানসীর যা একখানা বাপ। ফের দুজনে কথা বলছে দেখতে পেলে তিনি নিশ্চয়ই লাফ-ঝাঁপ শুরু করে দিতেন। মাধুরীর পক্ষে তেমন ভয়ের কোন কারণ নেই। তাই সে অসংকোচে এসে অতিথিসেবা করেছে। ওর এই সেবাটুকু নিতে বড় ভালো লেগেছে অসীমের। যেমন ওর চেহারায় তেমনি ওর পরিচর্যায় এক অপূর্ব কোমল স্নিগ্ধতা আছে। মাধুরী এই সেবাটুকু না করলেও পারত। করবার কোন কথা ছিল না। অপ্রত্যাশিত এক ফোঁটা প্রাপ্তি। একবিন্দু অমৃত। তার পরিমাপ পরিমাণে নয়, স্বাদে। অনির্বচনীয়তায়।

নাঃ, এ কি এলোমেলো বাজে অর্থহীন চিন্তায় নিজের ঘুমকে নিজেই তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে অসীম। আজ কি তার ঘুমোবার মতলব নেই? অসীম পাশ ফিরল। নতুন জায়গা। সিন্দুকের মত ঘর। তারপর এই দুঃসহ গরম। ঘুমের পক্ষে কোনটাই অনুকূল নয়। কিন্তু নিজেকে যিনি অনিদ্রার রোগী বলে জাহির করে বেড়ান সেই সাবধানী গৃহস্থ মনোমোহন দিব্যি এখন নাক ডাকাতে শুরু করেছেন। অসীম হাসল। তারই ঘুম হচ্ছে না। ঘুম যখন আসে না তাকে শত সাধ্যসাধনাতেও আনা যায় না। পাঁচপাড়াতেও মাঝে মাঝে এমন হয়। ঘুম আসতে চায় না। অফিসের কাজ নিয়েও মাঝে মাঝে এমন ঘুমের ব্যাঘাত হয় অসীমের। এমন কিছু বিরাট দায়িত্ব তার মাথার ওপর নেই। কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকুও যদি ঠিক মত করে যেতে পারত হয়তো শান্তি পেত অসীম। পারে না যে সে কি তার নিজের অযোগ্যতা অনিচ্ছা, না কি আরো কিছু এর মূলে আছে? অসীমের মাঝে মাঝে মনে হয় এক বিরাট জটিল কর্মযন্ত্রে সে সামান্য ছোট একটি নাট-বল্টু। অচেতনভাবে নিজের কাজটুকু করে যেতে পারলে আর কোন ঝামেলা নেই। কিন্তু সেই নাট-বল্টু যদি সচেতন হয়ে ওঠে, যদি যন্ত্রের নানা রকমের খুঁৎ তার চোখে পড়ে তাহলেই মুশকিল। সে না পারে যন্ত্রকে বদলাতে, না পারে সেই যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসতে। একথা স্বীকার করতে অসীমের পৌরুষে বাধে, মানসীর কাছে একথা সে কিছুতেই স্বীকার করতে পারবে না। তবু নিজে তো জানে এই জটিল বিশাল যন্ত্রের মধ্যে তার কিছুই করবার জো নেই। সার্ভিস রেকর্ড খারাপ হবার ভয়, অপদস্থ হবার ভয়, ক্যারিয়ার নষ্ট হবার ভয়, হাজার রকম ভয়ে বুক কাঁপে। চাকরির মাহাত্ম্যই এই। তা যাবার আশঙ্কা সব সময় লেগে থাকে। এই জন্যেই কি অসীম পালাই পালাই করে? ভয় থেকে মুক্তি চায়? কিন্তু কোন না কোন কাজ তো তাকে খুঁজে নিতেই হবে। নতুন কাজ খোঁজা যে কী শক্ত তা তো তার অজানা নেই। তার চেয়ে পুরোন কাজের মধ্যে মুখ বুজে পড়ে থাকা ঢের সোজা। শুধু মুখ বুজে নয়, চোখ বুজে পড়ে থাকতে হয়। 'যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।' আজও

কলকাতায় এসে বড়কর্তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করল না অসীম। ভাবতেই খারাপ লাগল। একবার যখন ছুটি নিয়েছে, রুদ্ধ ঘরের দোর খুলে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে এসে দাঁড়াতে পেরেছে, ফের কেন তার মধ্যে ঢুকবে, ফের কেন সেই বদ্ধ আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবে?

আজ আর ঘুম আসবে না অসীমের। ঘুমোতেই যখন পারবে না, শুয়ে শুয়ে কেন এই কষ্ট পাবে? খাঁচার মত একটি ঘর। তার মধ্যে আবার মশারি। অসীম আস্তে আস্তে মশারি তুলে খাট থেকে নেমে পড়ল। পা টিপে টিপে দরজার কাছে এল। যত কম শব্দে পারা যায় খিল খুলল। প্যাসেজের মধ্যে বিছানা পেতে নন্দু ঘুমোচ্ছে। এখানে আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। বাইরে যেতে হলে সদর দরজা খুলতে হয়। তার চেয়ে দক্ষিণ দিকে যে একটু ফাঁকা জায়গা আছে সেখানে দাঁড়ানোই ভালো। ওদিকেই বাথরুম। ঠাণ্ডা জলে চোখ-মুখ ধুয়ে আসতে পারবে। পা টিপে টিপে অসীম এগিয়ে গেল। আলো জ্বালবার দরকার হল না। শেষ রাতের বেলে জ্যোৎস্নায় সব আবছা-আবছা দেখায়।

রেলিং-এ ভর করে এদিকে পিছন ফিরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। অসীম ইতস্তত করল। এগোবে না ফিরে যাবে। কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগেই ধরা পড়ে গেল।

'কে?'

অসীম বলল, 'মাধুরী তুমি!'

মাধুরী বলল, 'হ্যাঁ। যা গরম। কিছুতেই ঘুম আসছে না। তুমি যে উঠে এসেছ? তোমারও কি সেই দশা?'

অসীম ওর পাশে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'না। তা কেন হবে। আমি বোধহয় ঘুমন্ত অবস্থায় নিশির ডাক শুনে উঠে এসেছি। আর ঘুমের মধ্যেই তোমাকে দেখছি, তোমার সঙ্গে কথা বলছি।'

মাধুরী লজ্জিত হয়ে বলল, 'কী যে বল। তোমার সব সময়েই কেবল ঠাট্টা-তামাশা। তুমি বড় হালকা হয়ে গেছ অসীমদা।'

মাধুরী কি সত্যিই অসীমকে তিরস্কার করছে? সত্যিই অপছন্দ করছে এ ধরনের কথাবার্তা? অসীম একটু দ্বিধান্বিত হল। সত্যিই তো, সন্ধ্যারাত্রে যে চাপল্য উপভোগ্য মনে হয়, শেষরাত্রে তাই হয়তো অশোভন হয়ে ওঠে।

অসীম একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মাধুরী, আমাকে মাফ করো। আজ বিকেলে যেসব কাণ্ড ঘটেছে তার জন্যে তোমার মন খারাপ হয়ে আছে। তুমি বোধহয়—।'

এবার হেসে উঠল মাধুরী, 'কী যে বলো। তুমি বুঝি ভেবেছ আমি

তাই নিয়ে হা-হুতাশ করবার জন্যে এই শেষরাত্রে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। ওসব আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। মনে একটুও লাগে না। যখনকার কথা তখনই ভুলে যাই। বিশ্বাস করো—।'

—'দিদি, একটু আস্তে। সবাই উঠে পড়বে।'

দুজনেই চমকে উঠল। মানসী কখন যে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ টের পায়নি।

মাধুরী নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'এই যে মানু, তুইও উঠে এলি। বেশ হল। আয় আমরা তিনজনে মিলে গল্প করে করে রাতটা ভোর করে দিই।'

অসীম হেসে বলল, 'কথাটা মন্দ নয়। সবাই মিলে জাগলে রাতটাই দিন হয়ে যায়।'

কিন্তু মানসী কারো কথারই জবাব দিল না। সোজা বাথরুমে চলে গেল। বার বার জলের ঝাপটার শব্দ আসতে লাগল। যেন এত রাত্রে শুধু চোখ-মুখ ধোবার জন্যেই সে উঠে এসেছে।

একটু বাদে সে বেরিয়ে আসতে মাধুরী বলল, 'মানু, দাঁড়া এখানে। এতক্ষণ বাদে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।'

মানসী গম্ভীরভাবে বলল, 'না দিদি। তোরা গল্প কর। আমি যাই। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

মানসী চলে যাওয়ার পর মাধুরীও আর দাঁড়াল না। যেতে যেতে অসীমের দিকে চেয়ে বলল, 'আর রাত জেগে কাজ নেই। যাও এবার শুয়ে পড় গিয়ে। এবার নিশ্চয়ই ঘুম আসবে।'

মাধুরী ঘরে গিয়ে ঢুকল। অসীম আরো কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে গিয়ে খিল দিল। ভয় হল, মনোমোহন আবার জেগে না ওঠেন। তাহলে শুধু যে কৈফিয়তের পাল্লায় পড়তে হবে তাই নয়, তার চেয়েও বড় আশঙ্কা তাঁর নৈশ বক্তৃতা শুনতে হবে। শুরু হলে তা আর থামবে না।

কিন্তু অসীমের ভাগ্য ভালো, মনোমোহন তখনো অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।

আলগোছে মশারি একটু উঁচু করে অসীম তার ভিতরে ঢুকে শুয়ে পড়ল।

কিসের একটা অস্বস্তি থেকে থেকে তাকে খোঁচা দিতে লাগল। কিন্তু দোষটা তো মানসীরই। সে যদি এমন এড়িয়ে না যেত, তাদের পাশে কি মাঝখানে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ গল্পটল্প করত তাহলে সবারই ভালো লাগত। মানসী চিরকালই ওইরকম। রসকসহীন। কেবল চড়া চড়া কথা বলতেই পারে। ওর তুলনায় মাধুরী অনেক—। ছিঃ। একজনের সঙ্গে কি আর

একজনের তুলনা হয়। যে মেয়েকে ভালোবাসি তার সঙ্গে কারোরই তুলনা হয় না। প্রেম তুচ্ছকে মহৎ করে, শূন্যকে পূর্ণতা এনে দেয়।

অসীম মানসীকে আরো বেশি করে ভালোবাসবে। আজ যদি ও দুঃখ পেয়ে থাকে অসীম কাল আদরে আদরে ওর সেই দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে। এই মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে ভালোবাসার মাহাত্ম্যের কথা ভাবতে ভাবতে নতুন অধ্যবসায় নিয়ে অসীম ফের ঘুমোতে চেষ্টা করল। আর হঠাৎ তার খুব ভালো লাগতে লাগল। ব্যর্থতা দীনতা গ্লানি সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। চমৎকার এই শেষরাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়া, মিষ্টি জ্যোৎস্না, আর সব মিশিয়ে এই মধুর অস্তিত্ব। সত্যিই মধুময় পৃথিবীর ধূলি। কে যেন চোখে কোমল আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত সত্তায় তার স্পর্শ অনুভব করতে করতে অসীম চোখ বুজল। নিদ্রা নারীরূপিণী। এছাড়া তার আর কোন রূপের কথা ভাবা যায় না। আর নারী মমতা দিয়ে ভরা, সহানুভূতি দিয়ে গড়া কান্তকোমল পদাবলীর মত মধুক্ষরা মধুস্বরা; সুখে দুঃখে পার্শ্বচারিণী। তার আর কোন মূর্তিকে স্বীকার করতে ইচ্ছা করে না।

অসীম পাশ ফিরল। কাঁকনপরা একটি কোমল হাত সকৌতুকে তার দুটি চোখের পাতাকে ঢেকে রাখল।

অসীম বলল, 'হাত ছাড়ো।'

সে বলল, 'কেন।'

অসীম বলল, 'আমি তোমার মুখ দেখব।'

সে বলল, 'আর দেখে কাজ নেই। এবার ঘুমোও।'

অসীম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখতে লাগল।

দুই

মাধুরী চোখ মেলে দেখল আর সবাই উঠে পড়েছে। বালিশে কুলোয়নি বলে ছোট একটা পাশ-বালিশ মাথার তলায় দিয়ে শুয়েছিল মানসী। মাথার চাপে সেই গোল বালিশটা চেপ্টা হয়ে পড়ে আছে। ওদিকের ঢালা বিছানায় শুয়েছিল মা, মায়া, মঞ্জু আর মিনু। মা পাঁচটার সময় উঠে ওদের টেনে তুলেছেন। ওদের মর্নিং স্কুল। মঞ্জুর আর মিনুর। সকালে ওঠা ওদের অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু হয়নি। মা তাড়া না দিলে ওরা আর ওঠে না। মায়া অবশ্য আই-এ পরীক্ষা দিয়ে ক'মাসের জন্য জিরিয়ে নিচ্ছে। ওর সাত তাড়াতাড়ি না উঠলেও চলে। কিন্তু মা ওকেও তুলে দেন। ঘর-সংসারের কাজকর্ম আছে। না উঠলে চলবে কেন। তাছাড়া সকালের চায়ের পাটটা আজকাল মায়ার হাতেই এসে পড়েছে। চা করা ছাড়াও আরও অনেক কাজ করে মায়া। বিছানা তোলে, ভাই-বোনদের নাওয়ায়-খাওয়ায়, মায়ের ফাইফরমায়েস খাটে। মুখে কথাটি নেই। আর ভারি লজ্জা। বাড়িতে ঠিক ছায়ার মত আছে। ওর জন্যে ভারি মমতা হয় মাধুরীর। ছেলেবেলায় সেও ওইরকম ছিল। অমনি মুখচোরা অমিশুক। মঞ্জুটা হয়েছে ফাঁকিবাজ আর বাবু। মাধুরী হাসল। ওর ভাগের কাজ মায়ার ঘাড়ে এসে পড়ে। বাবা বলেন, মঞ্জুটাকে তোরা বিলাসের ডিবা বানিয়ে ছাড়ছিস। বাবা সাজগোজ একেবারে পছন্দ করেন না। আহা কী-ই বা এমন সাজে। কাঁচের চুড়ি আর পুঁতির মালা আর চুল বাঁধবার রঙীন ফিতে। গয়নার মধ্যে এই তো সম্বল। আর দিদিদের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে চুরি করে যা একটু স্নো-পাউডার নিতে পারে। এই নিয়ে বকুনির কোন মানে হয় না। বাবা মাঝে মাঝে সত্যিই ওদের উপর বড় রাগ করেন। বুড়ো হলে বোধহয় ওইরকমই হয়। বুড়ো হলে মানুষ নিজের যৌবনের কথাটা ভুলে যায়। বাবার জন্যে কিছুই করবার জো নেই। মাধুরী ভেবেছিল পরীক্ষার পর মায়া আর নন্দুকে কোথাও পাঠিয়ে দেয়। নিজেদের তেমন আত্মীয়স্বজন বাইরে কেউ নেই, যাঁদের কাছে পাঠানো যায়। বন্ধুবান্ধবই ভরসা। শর্মিলা থাকে ভুবনেশ্বরে। সেখানে ভালো চাকরি করে ওর বর। অবস্থা ভাল। এখনো ছেলেপুলের ঝামেলা হয়নি। মাধুরী ভেবেছিল মায়াটাকে শর্মিলার কাছে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। অত বড় মেয়েকে কি যেখানে-সেখানে যার-তার কাছে পাঠানো যায়? অথচ শর্মিলা মাধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একসঙ্গে বি-এ পর্যন্ত পড়েছে। বিয়ের পরেও ভুলে যায়নি। এখনো চিঠিপত্র লেখে।

কলকাতায় এলে মাধুরীর জন্যে কিছু-না-কিছু হাতে করে নিয়ে আসে। কোন বার পর্দা, কোন বার ব্যাগ। সেবার এনেছিল হর-পার্বতীর যুগল-মূর্তি। মাধুরী হেসে বলেছিল, 'ও মূর্তি দিয়ে আমি কি করব? ওটা তুই রাখ।' শর্মিলা বলেছিল, 'কেন, তুই কি চিরকাল এমন সন্ন্যাসিনী থাকবি নাকি?' মাধুরী বলেছিল, 'চিরকাল।' শর্মিলা মুখের কাছে মুখ এনে বলেছিল, 'চিরকাল রব আমি প্রেমের কাঙাল—এবং সন্ন্যাসিনী থাকব। আইডিয়াটা ভাল।'

'ও মাধুরী, তুই এখনো উঠলিনে। দেখ দেখি, কত বেলা হয়ে গেল।'

সুহাসিনী এসে দাঁড়িয়েছেন। বিছানা তুলবেন।

মাধুরী হেসে মায়ের দিকে তাকাল। এই ভোরবেলায় মার মুখখানাও কেমন নরম মনে হচ্ছে। নরম আর স্নিগ্ধ। দিনের শুরুতে মানুষকে শিশুর মত দেখায়। জীবনের শুরুতে যেমন।

'অমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছিস কেন? ওঠ এবার।' আর একবার তাড়া দিলেন সুহাসিনী।

মাধুরী বলল, 'খুবই বেলা হয়ে গেছে নাকি মা?'

সুহাসিনী বললেন, 'হয়নি? ছ'টা কখন বেজে গেছে। সবাই উঠে পড়েছে। অসীম তোর খোঁজ করছিল।'

মাধুরী বলল, 'অসীমদা? আমার?'

সুহাসিনী বললেন, 'হ্যাঁ। খোঁজ করছিল তুই কখন উঠিস। বেলা আটটায় না নটায়। তোকে বেড-টি দিতে হয় কি না।'

মা হাসলেন।

মাধুরী হেসে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, দিতে হয়। বল গিয়ে সে যেন দিয়ে যায় এসে।'

মার হাসিভরা মুখখানা এবার একটু কি গম্ভীর দেখাচ্ছে? কেন, মাধুরী কি অশোভন কিছু বলে ফেলল? খুব বেশি চঞ্চলতা প্রকাশ করে ফেলেছে? কিন্তু অসীম তো এ বাড়িতে সকলেরই বন্ধু। বন্ধুকে নিয়ে কি মানুষ হাসি-তামাশা করে না? আর মা, মাও তো আজকাল মাধুরীর বন্ধু। কোন্ কথাটা মার সঙ্গে তার এখন না হয়? কোন্ কথাটা বলতেই-বা সে বাকি রাখে?

সুহাসিনী মঞ্জুদের বাসী বিছানায় হাত লাগিয়েছেন দেখে মাধুরী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বলল, 'তুমি কেন মা, ওরা কোথায় গেল। তুমি যাও, আমি তুলছি।'

সুহাসিনী বললেন, 'না বাপু, তুমি তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে নাও, ওরা বসে আছে।'

ওরা মানে মানসী, মায়া, মঞ্জু, নন্দু আর অসীমও আছে। সেই কালকের

অতিথি। এক তিথি পার করে দিয়েও আজও যে যায়নি। নিজেই যায়নি নাকি যেতে দেওয়া হয়নি? তাই তো হয়। একজন এগিয়ে আসে আর একজন এগিয়ে আনে। নাহলে কি রাখা যায়? না হলে কি থাকা যায়? কিন্তু কেউ কারো জন্যে বসে আছে শুনলে বড় ভালো লাগে। 'আমি বসে আছি তোমার আশে—।' না, অন্য কোন আশায় নয়। শুধু একসঙ্গে চা খাবে বলে। সেইটুকুই যথেষ্ট। তাই যে থাকে সে-ও বন্ধু। এই পৃথিবীতে এক ফোঁটা সান্নিধ্য এক ফোঁটা মাধুর্য যে দেয়, সেই আপন। মাধুরী, আর কিছু চেয়ো না। আর বেশি কিছু নয়। সমুদ্রের বেলায় ঝিনুক কুড়াবার মত এই সংসার-সিন্ধুর তীরে অগুনতি মধুর মুহূর্তগুলি তুলে তুলে নাও। পুঁতির মালার মত গেঁথে রাখ।

মার আপত্তি না শুনে মাধুরী তাঁর সঙ্গে বিছানা তুলতে শুরু করল। মাদুরটা গুটিয়ে বালিশগুলি জড়ো করে রাখল বড় ট্রাঙ্কটার ওপর।

মাধুরী বলল, 'মা, এবার এ ঘরে একটা তক্তপোষ পাততে হবে।'

মা বললেন, 'হুঁ, সবই হচ্ছে।'

একখানা তক্তপোষ কিনবার মত টাকা তাদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এ ঘরে পাতলে ঘরটা একেবারে জুড়ে যায়। তাই পাতা হয়নি। কিন্তু মাধুরী এখন ভাবছে একখানা তক্তপোষ পাতলেই সুবিধে বেশি হত। বিছানাগুলি তার ওপর গুটিয়ে রাখা যেত। কিন্তু বাবা তা কিছুতেই কিনতে দেবে না। মা যা করতে চাইবেন বাবার তাতে আপত্তি এবং ভাইসি-ভার্সা। অদ্ভুত দাম্পত্য-জীবন দু'জনের।

মাধুরী এবার বাথরুমের দিকে এগোল। ভাগ্য ভাল, দোরটা খোলা আছে। দোর বন্ধ দেখলে মাধুরীর মেজাজ বিগড়ে যায়। ভিতরে যেই থাকুক তাকেই মনে হয় পর। দু-চার মিনিট কাটতে না কাটতে মনে হয় পরম শত্রু। এর আগে যে ভাড়াটে বাড়িটায় ছিল সেখানে একই বাথরুমের ছিল তিন শরিক। এখানে গোটা পরিবারের জন্য পুরো একটি বাথরুম মিলেছে। তবু শরিকিয়ানা যায়নি। এখন স্নানের ঘর স্নানের জল নিয়ে মনে মনে ভাগাভাগি চলে বাবার সঙ্গে, মার সঙ্গে, মানসীর সঙ্গে। বিশেষ করে মানসীর সঙ্গে। মানসী দেবী যদি একবার বাথরুমে ঢুকলেন তো আর বেরোতে চান না।

টুথপাউডারের কৌটোটা বাঁ হাতের তালুর ওপর রেখে মাধুরী টোকা দিতে লাগল। কৌটোয় কি কিছু আর নেই নাকি? না, এদের নিয়ে আর পারা গেল না। যাতে হাত দেবে তাই নেই। মা বলেন, 'গৃহস্থের বাড়িতে নেই বলতে নেই। বল বাড়ন্ত।' কিন্তু যাই বল, কথাটার মানে একই দাঁড়ায়। তবু মার মুখে ওই উল্টো বাড়ন্ত কথাটা শুনতে সময় সময় বড়

ভালো লাগে। শব্দ আর প্রতিশব্দ অর্থে এক হলেও ধ্বনিতে আলাদা। অনেক মিথ্যে কথাও শুনতে ভালো লাগে। এই যেমন তাঁর এই বাঁ হাতের তালু দেখে একজন পামিস্ট বলেছিলেন—'তুমি রাজরানী হবে।' এই গণতন্ত্রের যুগে কোথায় রাজা, কোথায়-বা রানী। তবু রাজরানী কথাটা রয়ে গেছে। ভিখিরীর মুখে, জ্যোতিষীর মুখে, আশীর্বাদকারীর মুখে, আর যে মাস্টারনী হয়েও মাঝে মাঝে রানী হতে চায় তার মনে।

কিন্তু বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। অল্প পাউডারে তাড়াতাড়ি দাঁত মাজা শেষ করল মাধুরী। ওরা সবাই তার জন্যে বসে আছে। ছি ছি ছি, আজ অনেক আগেই তার উঠে পড়া উচিত ছিল। হাজার হোক বাইরের এক ভদ্রলোক বাড়িতে আজ গেস্ট। এই সময় মাধুরীর বয়সী একটি মেয়ে যদি পড়ে পড়ে ঘুমোয় বড় বিশ্রী দেখায়। আর মার সামনে ওই বেড-টি খাওয়াবার কথাটা বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু সত্যিই কি কোন পুরুষ কোন ঘুমন্ত মেয়ের সামনে বেড-টি হাতে নিয়ে সাধাসাধি করে? তিনতলার রমা-বউদি নাকি তার স্বামীর বিছানায় একেকদিন চা দিয়ে আসে। কিন্তু বিপরীত প্রীতির কথা তো মাধুরী শোনেনি, কোন গল্প উপন্যাসেও পড়েনি। ভাবতে কিন্তু মন্দ লাগছে না। একজন লোক মানে ভদ্রলোক—চাকর-বাকর নয়—তার সামনে চায়ের কাপ নিয়ে তাকে আদর করে ডাকছে। মাধুরী নিজের মনেই হাসল। তারপর নিজেকেই নিজে ধমক দিল, 'ছিঃ, তোমার আজ হল কি? কেন এত চঞ্চলতা, এত চাপল্য?' ক্লাসের দুরন্ত ছাত্রীদের যেমন ধমকায়, তেমনি মাধুরী নিজেকে ধমকাল। শিক্ষিকা মাধুরী ছাত্রী মাধুরীকে ধমকাচ্ছে। একই মাধুরীর মধ্যে দুই মধুরা।

দেয়ালে ছোট একখানা আয়না টাঙানো। আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মাধুরী একবার সেই আয়নার দিকে তাকাল। শুধু মুখ দেখে তৃপ্ত হল না, ছোট মেয়ের মত দাঁতগুলি বের করল। পরিষ্কার সুন্দর মাজা দাঁত। সামনের একটি দাঁতের ওপর পাশের দাঁতটি একটু উঠে গেছে। কে যেন বলেছিল তাতে আরো ভাল দেখায় মাধুরীকে। ওই বঙ্কিম দাঁতেই বুঝি তার ব্যক্তিত্ব। মাধুরী হাসল।

'মাধুরী!'

এবারও মার গলা শোনা গেল। আজ মার মুখ দেখে, তাঁর ডাক শুনে উঠেছে। তিনি আজ সারাদিনই ডাকবেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে মাধুরী শোবার ঘরে ঢুকল। বাসি শাড়ি আর ব্লাউজ বদলে দ্রুতপায়ে চলে এল চায়ের আসরে। সরু বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে পাতা সেই পড়ার টেবিলটা এখন চায়ের টেবিলে রূপান্তরিত হয়েছে। বইগুলি অপসারিত। নিশ্চয়ই নন্দুর কান্ড। শুধু বই-ই সরায়নি। বাবার ঘরের বেঞ্চখানাও টেনে নিয়ে

এসেছে। বাক্স-টাঙ্কগুলি বোধহয় মাটিতেই নামিয়ে রেখে এল। বাবা দেখলে বকাবকি করবেন সে ভয় নেই। প্রধান অতিথিকে একখানা চেয়ার দেওয়া হয়েছে, আর ওরা সব পাশাপাশি বসেছে বেঞ্চে। বাবা এখন নেই। তাঁর বোধহয় মর্নিং ওয়াক এখনো শেষ হয়নি। দেখে মাধুরী যেন স্বস্তিবোধ করল। বাবাকে অবশ্য সে ভালবাসে। খুবই ভালবাসে। কিন্তু অনেক সময় গুরুজনদের নেপথ্যে রেখেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

অসীমই প্রথমে অভ্যর্থনা করল, 'এই যে, ঘুম ভাঙলো তোমার? বসে থেকে থেকে আমাদের চা যে জুড়িয়ে গেল।'

মাধুরী বলল, 'ঈস, চা খাওয়া তো শুরুই হয়ে গেছে দেখছি। তবে নাকি সব বসে আছ।' তারপর একটু হেসে বলল, 'চা জুড়োলে তো ক্ষতি নেই। সঙ্গে সঙ্গে আর এক কাপ গরম করে দেওয়া যায়। যারা খাচ্ছে তারা না জুড়োলেই হল।'

মানসীর দিকে তাকিয়ে মাধুরী ফের একটু হাসল।

মানসী একটু লজ্জিত হল। ছোট ভাই-বোনদের সামনে কথাটা বলা কি মাধুরীর ঠিক হয়নি? কিন্তু আসল মানে তো মঞ্জু নন্দু আর বুঝতে পারবে না। যাদের জন্যে বলা তারাই শুধু বুঝবে।

একটু সরে গিয়ে দিদিকে বসবার জায়গা করে দিতে দিতে মানসী বলল, 'আমার দিকে চেয়ে ওসব কথা বলা হচ্ছে যে। আমি কি জুড়িয়ে গেছি নাকি?'

মাধুরী বলল, 'ওরে বাবা, তুই আবার জুড়োবি। তুই তো টগবগ-টগবগ করে ফুটছিস। কেটলির জলের মত।'

মানসী কি যেন বলতে গিয়ে বলল না। ও কি রাগ করল? আজ মাধুরীর ঠাট্টা-তামাশা কেউ কি সহজভাবে নেবে না?

মায়া পরিবেশনের ভার নিয়েছে। চায়ের সঙ্গে আপাততঃ এসেছে গরম কচুরি আর সিঙ্গাড়া। ঘরের খাবার মা একটু পরে করে দেবেন। মাধুরী যদি আরো ভোরে উঠত, তাহলে সে নিজেই করে দিতে পারত। মানসী যেন কি। ও কেন খাবার-টাবার করে দিল না? শুধু সামনে বসে থাকলেই হয়? মানুষকে আদরযত্ন করতে হয় না?

মঞ্জু বলল, 'জানো মেজদি, এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কি কথা হচ্ছিল জানো?'

মাধুরী চায়ে চুমুক দিয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল, জানে না।

মঞ্জু বলল, 'নন্দুদা তো দিব্যি এই রেস্টুরেণ্ট খুলেছে। এর নাম নাকি হবে মাধুরী রেস্তরাঁ।'

'কে? কে বলেছে একথা?'

মাধুরী প্রথমে মানসী তারপর অসীমের মুখের দিকে তাকাল, 'কে বলেছে?'

এরই মধ্যে দাড়িটাড়ি কামিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়েছে অসীম। আটপৌরে আবরণ হিসেবে গেরুয়া রঙের একটা পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়েছে। ওর গৌর-বর্ণের সঙ্গে মানিয়েছে ভালো। ঝিনুকের বোতামগুলি সব আটকায়নি। ভিতরের জালি গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। তার ফুটোয় ফুটোয় রোমশ বুকের আভাস। শক্ত খাড়া খাড়া চুলগুলি গুছিয়ে এই সকালেই আঁচড়ে নিয়েছে। সব চুলই অবশ্য চিরুনির শাসন মানেনি। চেহারাটা ছিপছিপে বলে আগে বড় রোগা রোগা লাগত। এখন কিন্তু সেই অসহায় ভাবটা নেই। দৃঢ়তার সঙ্গে বেশ একটু তীক্ষ্ণতা এসেছে। মোটা হলে এটুকু থাকত না।

অসীম হেসে বলল, 'বাবাঃ, কি সন্ধানী চোখ। আসলে পুলিসের চাকরি তোমারই নেওয়া উচিত ছিল মাধুরী। স্বীকার করছি কালপ্রিটকে ধরে ফেলেছ। আসামী আমিই।'

মাধুরী লজ্জিত হল। ও কি বেশিক্ষণ অসীমের দিকে তাকিয়ে ছিল? একটু বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'সব সময় দোষ কবুল করলেই শাস্তি এড়ানো যায় না। আমার নাম নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা? ভারি সাহস তো তোমাদের। কেন, মানসীও তো এখানে আছে। ওর নামেই নাম রাখ। রেস্টুরেণ্টের নাম রাখ মানসী কেবিন। শোনাবে ভাল।'

মানসী প্রতিবাদ করে বলল, 'আবার আমাকে নিয়ে পড়লি কেন দিদি?'

একটা সিঙ্গাড়ার প্রায় আধখানা মুখের মধ্যে রেখে নন্দু অস্পষ্টভাবে বলল, 'বেশ তো ওদের যদি সবারই আপত্তি থাকে অসীমদা, রেস্টুরেণ্টের নামটা আমার নামেই থাকবে। আমার নামটা মনে আছে তো অসীমদা?'

অসীম হেসে বলল, 'শুভঙ্কর তো?'

নন্দু বলল, 'হ্যাঁ, ওই নামটা হবে দোকানের। আর আমার ডাকনামটা ইউজ করব প্রোপ্রাইটার হিসাবে। জানেন, আমার একটা সত্যিই রেস্টুরেণ্ট খোলবার ইচ্ছা আছে। এ পাড়ায় ভালো কোন রেস্টুরেণ্ট নেই। খুলতে পারলে কিন্তু বেশ চলে।'

মাধুরী বলল, 'হতভাগা, তোর কপালে তাই আছে।'

অসীম বলল, 'আঃ ডিসকারেজ করছ কেন মাধুরী। বাঙালীর ছেলে ব্যবসাবাণিজ্য করতে চাইছে ভালোই তো। নিশ্চয়ই চলবে নন্দু, খুব চলবে। তোমার এক দিদি ম্যানেজার হবে, আর এক দিদি কাউণ্টারে বসবে আর মঞ্জুটা বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে সার্ভ করবে।'

মাধুরী একটু অবাক হল। খুশীও হল। শুধু তার মনেই আজ হালকা হাওয়ার স্রোত বইছে না। অসীমদার চলন-বলনেও আজ খুব চপলতা

এসেছে। ওর স্বভাব তো এমন ছিল না। বদলালো কি করে? মানুষ বদলায়। একেক সময় একেক রকম হয়। হয় বলেই দেখতে ভাল লাগে। অসীমদাকেও বেশ লাগছে এখন। কিন্তু মানসীটা অত গম্ভীর হয়ে আছে কেন। ও কোন কথা বলছে না। আহা বলবে কি! বেচারা যার সঙ্গে কথা বলবে, যেসব কথা বলবে তার সুযোগ-সুবিধাই মোটে হচ্ছে না। কাল সারাদিন অসীমদাকে কেউ-না-কেউ ঘিরে রেখেছে। কখনো মা, কখনো মঞ্জু, কখনো বাবা। বিকেলে তো অসীমদা বেরিয়েই গেল। বাড়িতে আরো ভিড় বাড়বে বলে পালালো। তারপর রাত্রে ছাদে যাবার যদি-বা একটু সুযোগ মাধুরী করে দিয়েছিল বাবা গিয়ে হানা দিলেন। ছি ছি ছি, তাঁর তো লজ্জা হয়নি, মাধুরী লজ্জায় মরে গেছে। কিন্তু কাল যে সুযোগ হয়নি আজ ওদের সেই সুযোগ করে দেবে মাধুরী। আজ সবাইকে আগলে রাখবে। ওদের সুযোগ দেবে ঘুরে বেড়াবার, সবার আড়ালে মনের কথা বলবার।

চা খাওয়া শেষ হতে-না-হতে মা আবার এলেন। লুচি-পরোটা নয়, ক'খানা স্যাণ্ডউইচ করে নিয়ে এসেছেন। মাধুরীর কাছেই শিখেছেন এটা তৈরি করতে। কখনো-বা ডিম এল কখনো পাঁউরুটি। অবাক কাণ্ড! এখানে বসে গল্প না করে মাধুরীর নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু খাবার দেখে অসীম যেন আঁতকে উঠল। 'না মাসীমা, আমাকে একখানাও দেবেন না, একখানাও নয়। কাল থেকে কেবলি খাচ্ছি। মেরে ফেলতে চান নাকি?'

সুহাসিনী মৃদু হেসে বললেন, 'দেখ দু'খানি খেয়ে। ঠিক হয়েছে কিনা দেখ। আমার মেয়েরা ভাবে এসব আমি করতে জানিনে। আমি কেবল যেন শাক-চচ্চড়ি, ঝোল, তরকারি রাঁধতেই জানি।—তোরা জিনিসপত্তর এনে দিয়ে দেখ তখন যদি না পারি—।'

মাধুরী হেসে বলল, 'তুমি সব পার মা। রান্নায় তোমার অলৌকিক প্রতিভা। তবে এ কালের অনেক রান্না তুমি আমার কাছ থেকে শিখেছ। সেকথাও স্বীকার কোরো।'

সুহাসিনী হেসে বললেন, 'মাধুরী সেই গর্বেই অস্থির। কিন্তু জানো অসীম, শৌখীন রান্নার চেয়ে কঠিন রান্না হল নিত্য তিরিশ দিনের আটপৌরে রান্না। যে ডাল কর্তার আর ছেলেমেয়েদের কিছুতেই মুখে রুচতে চায় না, সেই ডালকে—'

অসীম পাদপূরণ করে বলল, 'রুচিকর করে তোলা। নিশ্চয়ই মাসীমা। সে কাজ বড় কঠিন। আমি আপনার সঙ্গে একমত।'

সুহাসিনী একথার জবাব না দিয়ে ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'ও

নন্দ, তুই যে এখনো বসে আছিস? বাজারে যাবি কখন? মানসীকে ন'টার মধ্যে ভাত দিতে হবে। সে খেয়াল আছে?'

নন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই যাচ্ছি মা। অসীমদা, কি মাছ খাবেন বলুন।'

অসীম হেসে বলল, 'আজ আর এ বাজারের কোন মাছ খাব না নন্দ। আমি এবার বিদায় নেব।'

নন্দ বলল, 'বললেই হল বিদায় নেব? না না না, তা হবে না, কিছুতেই হবে না।'

সুহাসিনী বললেন, 'তুই বাজারে চলে যা। আর দেরি করিসনে।'

নন্দ বলল, 'অসীমদাকে কিন্তু ছেড়ে দিয়ো না মা।'

সুহাসিনী ভরসা দিয়ে বললেন, 'তোর কোন চিন্তা নেই। তুই বাজারটা চট করে নিয়ে আয়।—তোমরা বোসো। যাই, আমি ওকে বাজারের থলে আর টাকা দিয়ে আসি।'

সুহাসিনী নন্দর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দিকে গেলেন।

অসীম মাধুরীর দিকে চেয়ে বলল, 'মাসীমাকে বুঝিয়ে বোলো, আমি সত্যিই থাকতে পারব না। আমার জরুরী কাজ আছে।'

মাধুরী বলল, 'দশটার আগে তো আর অফিস-আদালত কিছু খুলছে না। জরুরী কাজ তখন যা দরকার হয় কোরো। এখন তুমি কিছুতেই ছাড়া পাবে না।'

হঠাৎ মানসী উঠে দাঁড়াল।

মাধুরী বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও কিরে, এখনই কোথায় যাচ্ছিস?'

মানসী সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে বলল, 'কাজ আছে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'বাপরে বাপ, তোরা কি সবাই আজ কাজের মানুষ হয়ে উঠলি নাকি? আমার কিন্তু আজ আর কোন কাজে মন বসছে না।'

মানসী বলল, 'তাইতো দেখছি।'

তারপর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মঞ্জু আর মিনু অনেকক্ষণ উঠে পড়েছে। ওরা স্কুলে যাবে। মায়া আছে মার পায়ে পায়ে। এই মুহূর্তে ধারে-কাছে আর কেউ নেই।

মাধুরী অসীমের দিকে আর একটু সরে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'কী হয়েছে তোমাদের?'

অসীম হেসে বলল, 'হবে আবার কি?'

মাধুরী মনে মনে হাসল। সহজে কথা আদায় করা যাবে না। পুলিস অফিসারকে এক কাপ চা ঘুষ দেওয়া যাক। পটে কি আর চা আছে?

মাধুরী বলল, 'আর এক কাপ চা খাবে নাকি?'
অসীম বলল, 'এক কাপ নয়, আধ কাপ চলতে পারে।'
মাধুরী বলল, 'দেখি এক কাপই বোধহয় আছে।'
অসীম হেসে বলল, 'তাহলে তো ভালোই হল। তুমি অর্ধাংশ ভাগিনী ও।'

মাধুরী বলল, 'আহা-হা।' আরো জুৎসই জবাব দিতে যাচ্ছিল, বলতে ।চ্ছিল, 'তোমাদের অর্ধাংশ কি অফুরন্ত? ভগ্নাংশ নয় পৌনঃপুনিক?' ক্লন্তু বলা হল না। মা এসে পড়লেন।

তার আগে আধ কাপ চা দিয়েছে অসীমকে, আধ কাপ নিয়েছে নিজে। কন্তু সুহাসিনীকে দেখে মাধুরী ভদ্রতা করে বলল, 'তুমি চা খেলে না মা? াবে? করে আনব?'

সুহাসিনী হেসে বললেন, 'বাঃ রে মেয়ে। তোর বাবা যে এখনো এলেন া, চা খেলেন না। কোথায় এত দেরি করছেন কে জানে।'

মাধুরী লজ্জিত হয়ে একটু জিভ কাটল, 'ওমা, তাইতো।'

বেশির ভাগ দিনই দেরিতে ওঠে বলে বাবা-মার সঙ্গে মাধুরী চা খায়। ানসীরা আগেই খেয়ে নেয়। কিন্তু ছি ছি ছি, বাবার কথাটা আজ মাধুরীর নেই নেই।

মুখে কিন্তু অপরাধটা স্বীকার করল না মাধুরী, হেসে বলল, 'মা, াবা বোধহয় পার্কে কাউকে পেয়ে ক্লাস খুলে বসেছেন। ওঁর তো বিষয়ের ভাব নেই। মনু থেকে মার্কস পর্যন্ত বাবা সব সংহিতারই খবর রাখেন। ুমি কতক্ষণ আর দেরি করবে। চা করে দিচ্ছি খেয়ে নাও। বাবা এলে াবার না হয় সেকেণ্ড কাপ তাঁর সঙ্গে খেয়ো।'

সুহাসিনী লজ্জিত হয়ে বললেন, 'বড্ড ফাজিল হয়েছিস তো। যাই, দেখি গিয়ে মায়া কি করছে? তুই আজ স্কুলে যাবি না?'

মাধুরী বলল, 'নিশ্চয়ই যাব। কাল তোমরা আমাকে ধরে-বেঁধে রাখলে। কছুতেই যেতে দিলে না পাছে সময় মত না আসি, কি কোথাও পালিয়ে- ালিয়ে যাই। আজ কামাই করব কোন দুঃখে।'

সুহাসিনী একথার কোন জবাব না দিয়ে স্মিত মুখে ভিতরের দিকে লেলেন।

মাধুরী জানে, মার এখন অনেক কাজ। ঠিকে ঝি যদিও বাসন মেজে দয়ে গেছে। কিন্তু বাটনা মা নিজেই বেটে নেবেন। রাণুর মার বাটনা াধুরীর মার পছন্দ হয় না। মানসী অফিসে বেরোচ্ছে। ওকেও তাড়াতাড়ি একটা ডাল তরকারি কিছু নামিয়ে দিতে হবে। এখান থেকে তেত্রিশ নম্বর াসে মানসীর পুরো এক ঘণ্টা লাগে অফিসে গিয়ে পৌঁছতে। এদিক থেকে

মাধুরীর বেশ সুবিধা আছে। পনের বিশ মিনিটের বেশি লাগে না বীর-নগর কলোনীর স্কুলে গিয়ে পৌঁছতে। হাজিরাও আধ ঘণ্টা পরে। সাড়ে দশটায়। কিন্তু এসব সুবিধা তো আর সুবিধা নয়। সব অসুবিধা দূর হয় টাকায়।

মাইনে মানসীর বেশি। মর্যাদাও। কি বাড়িতে, কি বাড়ির বাইরে। তা হোক। মানসী বেশির ভাগ টাকা—হাত খরচা ছাড়া সব টাকাই বাড়ির সকলের জন্যেই খরচ করে, বাইরের কারো জন্যে করে না। নিজের কোন খেয়ালও ওর নেই। নেই শাড়ি, গয়না, থিয়েটার-সিনেমার শখ। ওর একমাত্র সুখ যে কিসে তা যে কোথায় তা কি মাধুরীর অজানা আছে? যে বোন তাদের জন্যে এতখানি ছাড়তে পেরেছে তার জন্যে মাধুরী কি একটু লজ্জা সরম ত্যাগ করতে পারবে না? একটু বেহায়া হতে পারবে না?

'অসীমদা, তোমার আজ কিছুতেই যাওয়া হবে না।'

অসীম বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না মাধুরী, আমার আজ সত্যিই কাজ রয়েছে।'

মাধুরী বলল, 'কিন্তু তুমি কাজ থেকে ছুটি নিয়ে তবে এসেছ। আবার কাজের কথা কেন। কলকাতায় যারা বারো মাস থাকে তারা বারো মাস কাজ করে। কিন্তু তুমি তো তা নও। তুমি এসেছ দু'দিনের ছুটিতে।'

অসীম হেসে বলল, 'দু'দিনেই তের পার্বণ সারতে বলছ?'

মাধুরী বলল, 'নিশ্চয়ই সারবে। তুমি মফঃস্বল থেকে এসেছ, তুমি থিয়েটার দেখবে, সিনেমা দেখবে।'

অসীম বলল, 'জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, মনুমেণ্ট। বলে যাও, বলে যাও

মাধুরী লক্ষ্য করল, অসীমের হাসিতে খুশীর আমেজ, দু' চোখে দুষ্টুমি

মাধুরী বুঝতে পারল আজ আর অসীমদা কোথাও নড়ছে না। যাই যাই করছে, কিন্তু যেতে পারবে না। মানসীকে গিয়ে সুখবরটা জানিয়ে আসতে হবে। সে যেন কোন চিন্তা না করে। শুধু আজ নয়, অসীমদার ছুটি যে ক'দিন আছে মাধুরী ওকে আটকে রাখবার ব্যবস্থা করবে। তারপর ছুটি ফুরিয়ে গেলেও অসীমদা এখানে দু'একদিন ওভার স্টে করতে চাইবে না যদি চায় মানসী যেন মাধুরীর নাম ফিরিয়ে রাখে।

উঠতে যাচ্ছিল মাধুরী, অসীম বাধা দিয়ে বলল, 'আমাকে থাকতে বলে তুমি চলে যাচ্ছ যে।'

মাধুরী মুখ টিপে হেসে বলল, 'আসছি, একজনকে একটা কথা বলে আসছি।

জবাবে অসীম কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কথা পালটে নিচু গলায় বলল, 'মেসোমশাই এসেছেন।'

মাধুরী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সত্যিই তাই। বাবা। গায়ে ফতুয়া। এত করে বলেছে, বাবা পাঞ্জাবি পরে যাও, কিছুতেই পরবেন না। হাতে লাঠি-টাঠি নেই। বয়স ষাট পার হয়ে গেলেও নিজে এখনো লাঠির মত শক্ত সোজা। গর্ব করে বলেন, প্রথম বয়সে ব্যায়াম করেছেন, আদা আর ভিজানো ছোলা খেয়েছেন, তারই ফল।

মনোমোহন একেবারে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'এই যে মাধুরী, এই যে অসীম।' অসীমের কাঁধে হাত রাখলেন তিনি।

বেশ একটু কেঁপে উঠেছে অসীমদা। ঘাবড়ে গেছে। বাব্বা কী ভীতু। এই সাহস নিয়ে তুমি দারোগাগিরি কর। এই সাহসের সম্বন্ধে অত সাধ, স্বপ্ন, জল্পনা-কল্পনা? মাধুরী নিজের মনে হাসল।

মনোমোহন বললেন, 'অসীম, আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি। তোমাকে এসে দেখতে পাই কি না পাই।'

অসীমদা বেশ লজ্জা পেয়েছে, ঠিক জবাবটি খুঁজে পাচ্ছে না। মাধুরী তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল। মনোমোহনের দিকে ফিরে তাকিয়ে সস্নেহ ধমকের সুরে বলল, 'বাবা, এই তোমার তাড়াতাড়ি ছুটে আসা? সাতটা বাজিয়ে দিয়ে তবে তুমি এলে? এদিকে মার চা খাওয়া হচ্ছে না। সকালে উঠে চা না খেলে মার মাথা ধরে তা জানো?'

মনোমোহন বললেন, 'কেন, তোর মা চা খায়নি কেন?'

মাধুরী বলল, 'কেন আবার। তুমি চা-টা খেলে না—'

মনোমোহন বললেন, 'ঈস, তোর মা যে সতীসাধ্বী গান্ধারীকেও ছাড়িয়ে গেল। আমি চোখ বুজলে তোর মা চোখে গামছা বেঁধে কানামাছি খেলবে।' হো-হো-হো করে হেসে উঠলেন মনোমোহন। অসীম আর মাধুরীও হাসল।

কিন্তু কথাটা যতই হেসে উড়িয়ে দিন না বাবা, ভিতরে ভিতরে যে খুব খুশী হয়েছেন তা মাধুরী জানে। মেয়েদের কষ্ট দিয়ে পুরুষে সুখ পায়। তা সেকালের পুরুষই হোক আর একালের পুরুষই হোক।

মনোমোহন বললেন, 'মাধুরী উঠছিস যে, বোস এখানে। জানিস জীবন-বাবুর সঙ্গে আজ ঘোর তর্ক হয়ে গেল। সত্যিকারের ধর্ম বস্তুটা কি। ধর্মাচরণ কি খোল-করতাল নিয়ে পাঁচজনকে দেখিয়ে করবার ব্যাপার, না নিজের ঘরে বসে ভিতরে ভিতরে—।'

মাধুরী তাড়াতাড়ি সরে যেতে যেতে বলল, 'তোমার চা করে নিয়ে আসি বাবা।'

বেচারা অসীমদা কিছুক্ষণ ধর্মতত্ত্ব শুনুক। যেমনি যাই যাই করে ছটফট করছিল তেমনি বুঝুক মজা। এই নিয়ে বাবা ঘণ্টা তিনেক দিব্যি

কাটিয়ে দিতে পারবেন। দেখা যাক একজনকে আটকে রাখার ব্যাপারে ধর্মের জোরই বেশি না অধর্মের। মাধুরী মনে মনে ফের একটু হাসল।

নন্দ বাজার নিয়ে এসেছে। মা আর মায়া তাই নিয়ে ব্যস্ত। থলি একেবারে উপুড় করে ঢেলে ফেলা হয়েছে। মায়া তরকারি কুটতে বসেছে। মা আঁশবটিতে মাছ কুটছে। নন্দ আজও ইলিশ মাছ এনেছে। বাব্বা, এমাসে বড্ড বেশি খরচ হয়ে যাবে। হোক, ছি ছি ছি, হোক।

'মায়া, কেটলিটা কোথায় রে? বাবার জন্যে চা করতে হবে।'

মায়া বলল, 'চায়ের জল আমি চাপিয়ে দিয়েছি মেজদি। তুমি একটু তেতলায় যাও।'

'কেন রে?'

'রমা বৌদি তোমাকে খবর দিয়েছে। কি নাকি জরুরি দরকার।'

'যাচ্ছি; মানসী কোথায় রে? তাকে একটা কথা বলে যাব।'

মায়া একটু হেসে বলল, 'ঘরেই আছে। সে নাকি আজ আরো সকালে বেরোবে।'

মাধুরী বলল, 'হুঁ।'

মানসীকে খুঁজতে হল না। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চুল খুলছে। পায়ের কাছে গন্ধতেলের শিশি।

মাধুরী গিয়ে হাসিমুখে তার সামনে দাঁড়াল, 'এত যে সাততাড়াতাড়ি, কী হল তোর?'

মানসী গম্ভীরভাবে বলল, 'দরকারী কাজ আছে। আগেই বেরোতে হবে।'

'কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিস। অসীমদা আজ আর যাচ্ছে না। আজ না, কাল না, পরশু না।'

মানসী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'তাতে আমার কি।'

'ওরে বাবা! তোর আজ হল কি বল তো। রাগে যে একেবারে টগবগ করে ফুটছিস।'

মানসী এবার একটু হাসল, 'দিদি, আমি কেটলির জল, টগবগ করেই ফুটি। কিন্তু তুই যে আজ ভোরে দিব্যি একটি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিস।'

মুহূর্তের জন্যে মাধুরী গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই একটু হেসে ছোট বোনের গালে সস্নেহে ছোট্ট একটি চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'যাঃ ফাজিল কোথাকার। আমি যদি ফুল হই, ঘেঁটু ফুল। তুই পদ্ম, অধুনা কুপিতা পদ্মিনী।—যাই দেখে আসি রমা বউদি কেন ডেকে পাঠাল।'

মানসী বিনুনী খুলতে খুলতে মাথা কাত করল, কথা বলল না।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে মাধুরী ভাবল, মানসী ওকথা বলল কেন। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্যে যেন তেমন গরজ নেই। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গৌণ প্রশ্ন এসে প্রধান জিজ্ঞাসাকে ঢেকে দিল—রমা বউদির কী দরকার?

ডাইনে-বাঁয়ে সারি সারি ফ্ল্যাট। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। কোন ঘরের দরজার সঙ্গে আঁটা চিঠির বাক্স, কোন দরজায় নেম-প্লেট আর গৃহস্বামী বাড়িতে আছেন কি নেই তার নির্দেশসূচী। কোন ঘরের দরজা আধখানা খোলা, কেউ হয়তো এইমাত্র ভিতরে ঢুকেছে, কোন দরজা একেবারেই বন্ধ। এ-বাড়ির সব ঘরের বাসিন্দাদের সঙ্গে মাধুরীর আলাপ নেই। তবে মেয়েদের প্রায় সবাইকেই চেনে। কাউকে শুধু মুখে, কাউকে নামে ও কারো কারো সঙ্গে আর একটু ঘনতর পরিচয় আছে। কিন্তু রমা বউদির সঙ্গে যেমন একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তেমন আর কারো সঙ্গেই হয়নি। অথচ ওঁরা ক'দিনই-বা এ-বাড়িতে এসেছেন, বোধহয় ছ'মাসও হবে না। কিন্তু মাধুরী জানে সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে সময়ের হিসাবটাই সবচেয়ে বড় নয়।

কড়া-নাড়ায় যতটুকু শব্দ হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি জোরালো শব্দে দরজা খুলে গেল। যিনি এসে দরজা খুললেন তিনি রমা বউদি নন, তাঁর স্বামী সমীর সরকার। পরনে পা-জামা। একমুখ সাবান মেখে বেশ একটু বিরক্ত হয়েই যে ভদ্রলোক এসে দোর খুলে দিলেন তা বেশ বোঝা গেল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফিসে সম্প্রতি অফিসার গ্রেডে প্রমোশন পেয়েছেন। সেই মেজাজটা চোখ-মুখে ফুটে উঠেছে। মাধুরী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'রমা বউদি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

কিন্তু সমীরের হাঁড়িপানা মুখে ততক্ষণে হাসি ফুটেছে, 'আরে তুমি মাধুরী, এসো এসো। দিন যাবে আজ ভালো।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আপনি কি ভেবেছিলেন? পাওনাদার?'

সমীর বলল, 'ওইরকমই একটা কিছু। কিন্তু এমন পাওনাদারও কেউ কেউ আছে, যারা নিজেদের প্রাপ্য আদায় করতে ভুলে যায়। দিতে চাইলেও তারা নিতে চায় না, এমনই উদাসিনী।'

দেখা হলেই সমীরবাবু এই ধরনের ঠাট্টা-তামাশা করেন। কোন কোন সময় বিরক্ত হয় মাধুরী। কিন্তু আজ তার ভালই লাগল। জবাবে হেসে

বলল, 'আমাকে তেমন মনে করবেন না। আমি আমার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিতে জানি।'

সমীরের পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকল মাধুরী।

শোবার ঘরের ভিতর থেকে রমা বেরিয়ে এসে তাকে এগিয়ে নিয়ে গেল, 'এদিকে এসো মাধুরী।'

সমীর হেসে বলল, 'এ যে একেবারে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেলে। মেয়েরা এমনি হিংসুটেই হয়।'

রমা ভ্রূ বাঁকিয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'তাই নাকি! আমাদের এই হিংসুটে বুদ্ধিটুকু আছে বলেই সমাজ সংসার রক্ষা পাচ্ছে। নইলে কোথায় তোমরা সব ভাসিয়ে নিতে।'

সমীর এবার জবাব না দিয়ে স্মিতমুখে রমার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে লাগল।

কিন্তু রমা তাকে স্থির হয়ে সেখানে দাঁড়াতে দেবে না। এক মিনিট যেতে না যেতেই বলল, 'শোন, তুমি ও-ঘরে গিয়ে শেভ কর। ওখানে ছোট্ট একখানা আয়না আছে। তাতেই তোমার হয়ে যাবে।'

সমীর বলল, 'আমাকে তাড়াচ্ছ কেন? তোমাদের টক্ কি এতই কনফিডেনশিয়াল?'

রমা বলল, 'তাছাড়া কি। পুরুষরা কি আমাদের সব কথা শোনার যোগ্য? নাকি সব কথা তারা বোঝে?—কি বল মাধুরী?'

মাধুরী বলল, 'বউদি, আমার কিন্তু বেশি সময় নেই। জরুরী কথা যদি কিছু থাকে তাহলে বল। আর যদি কম জরুরী হয় তাহলে স্কুল থেকে ফিরে এসে শুনব।'

রমা ধমক দিয়ে বলল, 'বোসো তো। এ যে একেবারে ঘোড়া চড়া লক্ষ্মীবাঈ। হাতে একখানা তরবারি থাকলেই বেশ মানাত।'

তারপর স্বামীকে ফের তাড়া দিয়ে বলল, 'তুমি এখনো গেলে না? মেয়েদের মত আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনবে? পুরুষ মানুষ যে এমন হয় তা আর দেখিনি।'

সমীর এবার বিরক্ত হয়ে বলল, 'নাঃ, জ্বালাতন করে ছাড়লে।'

তারপর শেভ করার জিনিসগুলি নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

মাধুরী বলল, 'খোকন কোথায়?'

রমা বলল, 'সে পদ্মর কাছে আছে।'

পদ্ম এদের রাঁধুনী। ঝি আর চাকরের কাজও রমা বউদি তাকে দিয়ে চালায়। আধবয়সী শক্ত-সমর্থ একটি বিধবা স্ত্রীলোকের চেহারা মাধুরীর চোখের সামনে ফুটে উঠল। তাকে খবর দিতে বোধহয় এই পদ্মই গিয়েছিল।

বেশ কাজের লোক। তাদের সংসারেও এমন একটি ঝি রাখতে পারলে মন্দ হত না। মার দু'খানা হাত একটু বিশ্রাম পেত। দাদা যদি একসঙ্গে থাকত, তাহলে সহজেই এই স্বাচ্ছন্দ্যটুকুর ব্যবস্থা হত। কিন্তু শুধু নিজেদের আয়ের ওপর নির্ভর করে আর খরচ বাড়াতে ভরসা পায় না মাধুরীরা। তাছাড়া বাবা হৈ-চৈ করবেন। ঠিকে ঝি রেখেছে বলে তাতেই টানাটানির সময় মাঝে মাঝে বলে বসেন, 'এতগুলি ঝি থাকতে আবার একটা আলাদা ঝিয়ের দরকার কি। হাতে হাতে সবাই যদি কিছু কিছু করে কাজ করে তাহলেই তো হয়।'

মাঝে মাঝে বাবার রুক্ষতা, রূঢ়তা বড় বেশি কঠিন লাগে মাধুরীর। জীবনে বেশি ঘা খেলে মানুষ বোধহয় ওইরকমই হয়। হঠাৎ ফের অসীমের কথা মনে পড়ল মাধুরীর। বাবার ধর্মতত্ত্বের পাল্লায় পড়ে বেচারা অসীমদা বোধহয় এতক্ষণে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে। মাধুরী ছাড়া তাকে উদ্ধার করবে কে?

'আমি উঠি বউদি। সত্যিই কাজ রয়েছে। ফিরে এসে গল্প করব।'

রমা মুখ ভার করে বলল, 'কাজ যে আছে তা জানি। তোমরা সবাই কাজের মেয়ে। আমিও একটা কাজের জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। শুধু গল্প করবার জন্যে সাত-সকালে ডেকে পাঠাইনি।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আচ্ছা, কাজটা আগে দেখি।'

রমা হাত বাড়িয়ে খাটের ওধার থেকে কাগজের দুটি চ্যাপ্টা বাক্স টেনে নিয়ে এল। ঢাকনি খুলে দু'খানা শাড়ি বার করল। হেসে বলল, 'কাল শ্যাম-বাজার থেকে নিয়ে এলাম। ভেবেছিলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। কিন্তু তা তো আর হল না। কাল তুমি মহাব্যস্ত। কাল তোমাকে কি ঘরের বার করবার জো ছিল।'

মাধুরী শাড়ি দু'খানা নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল, 'সে যাকগে। বেশ শাড়ি হয়েছে। দু'খানাই বেশ ভাল।'

রমা বলল, 'উহুঁ, অমন দায়সারা জবাব দেওয়ার জন্যে তোমাকে ডাকিনি। বেছে দাও। একখানা কাঞ্জিভরম আর একখানা মুর্শিদাবাদী। দু'খানাই সিল্ক। প্রায় একই কোয়ালিটির। আমার মাসতুতো বোন রীণা—তার বিয়ে, তাকে দেব। কোনখানা রাখি বল তো! একখানা তন্তুশ্রীতে আজই দশটার মধ্যে ফেরত পাঠাতে হবে।'

মাধুরী দু'খানা শাড়ির রঙ পরীক্ষা করল. জমি পরীক্ষা করল, পাড়ের নক্‌শা পরখ করে দেখল। তারপর একটু হেসে বলল, 'বিয়ের পক্ষে অবশ্য এই কাঞ্জিভরমখানাই ভালো। টুকটুকে লাল রঙ আছে, আর মঙ্গলশঙ্খ পাড়। রীণা তো ফরসা, বেশ মানাবে।'

রমা খুশী হয়ে বলল, 'ঠিক। আমিও তাই বলি। কিন্তু তোমার

সমীরদার কী-যে চোখ। তার কেবল নীল রঙের দিকে ঝোঁক। সেই যে মুখস্ত করে রেখেছে—চলে নীল শাড়ি নিঙারি নিঙাড়ি—। আরে তা কি সব সময় চলে?'

মাধুরী বলল, 'বেশ তো আমি সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি। লালখানা রীণাকে দাও, আর নীলখানা তুমি রাখ। যিনি নীল ভালোবাসেন তাঁর চোখ জুড়োবে।'

রমা ভিতরে ভিতরে বেশ খুশী। কিন্তু মুখে প্রতিবাদ করে বলল, 'ঈস্। আমার ঘরে বুঝি টাকার গাছ গজিয়েছে? এই সেদিন ম্যারেজ অ্যানি-ভার্সারিতে শাড়ি কিনেছি। আজ যদি আবার শাড়ি চাই, আর একজন এখনই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতে চাইবে, তা জানো?'

মাধুরী বলল, 'শাড়ি না পেলে তুমি আগে ছিন্ন করবার ভয় দেখাবে।'

'বিয়ে-টিয়ে তো হয়নি, এসব ট্যাকটিকস্ শিখলে কোত্থেকে?' রমা হেসে উঠল।

মাধুরীও হাসল, বলল,—'কেউ ঠেকে শেখে, কেউ দেখে শেখে। কেউ জিতে শেখে, কেউ ঠকে শেখে। সবাইর শেখার ধরন তো একরকম নয় বউদি।'

রমা ওর গাল টিপে দিয়ে বলল, 'আহা-হা, কী তত্ত্বকথাই শিখেছ। দেখে শেখাটা কোন কাজের নয়, ঠেকে শেখাটাই আসল। সেইটেই হল হাতে-কলমে শেখা।'

মাধুরী উঠতে যাচ্ছিল, গৃহরক্ষিণী পদ্ম এসে দোরের সামনে দাঁড়াল, তারপর কোল থেকে বছর দুয়েকের একটি শিশুকে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গা, কী আক্কেল তোমার বউদি। এই দামাল ছেলেকে তুমি আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছ। জলেই পড়ে না আগুনেই পড়ে। আমি তোমার ছেলে সামলাব না রান্না সামলাব।'

মাধুরীর সামনে ঝিয়ের ধমক খেয়ে রমা চটে উঠল। রাগ করে বলল, 'তোমার কিছু সামলাতে হবে না বাপু, তুমি চুপ কর। অফিসের রান্না তো প্রায় রোজ আমিই রাঁধি। আজ একটু রাঁধতে বলেছি, তাই মুখ দিয়ে খই ফুটছে। আর কথা বলতে হবে না। কাজে যাও।'

কড়া কর্ত্রীর মত হাতের ইশারায় রমা পদ্মকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল। তারপর মাধুরীর দিকে চেয়ে বলল, 'ওদের প্রশ্রয় দিতে নেই, প্রশ্রয় দিলেই পেয়ে বসে।'

পদ্ম চলে যেতে যেতে বলল, 'ঈস্, আবার অঙ্গভঙ্গি করা হচ্ছে। আমি কারো ভঙ্গি-টঙ্গির ধার ধারিনে। আমি যেখানে খাটব, সেখানে অন্ন।'

মাধুরী ততক্ষণে রমা বউদির ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়েছে। তুলতুলে দু'টি ঠোঁট ফুলিয়ে সে কান্নার উপক্রমণিকা সেরে ফেলেছিল।

কিন্তু মাধুরী তাকে কাঁদতে দিল না। তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে আদর করল।

রমা হেসে বলল, 'তোমার কাছে ও বেশ থাকে। বেশ মানিয়েছে কিন্তু।'

মাধুরী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহা।' তারপর হেসে বলল, 'যদি মানিয়ে থাকে সে তোমার ছেলের গুণে বউদি। এমন ফুটফুটে সুন্দর ছেলে এ-বাড়িতে আর নেই।'

ছেলের রূপ বর্ণনায় মায়ের মুখ উজ্জ্বল হল। রমা খুশী হয়ে বলল, 'তাও যে একটু সাজিয়ে-টাজিয়ে রাখব তার কি জো আছে। দারুণ অস্থির। গায়ে কিছুতেই জামা রাখবে না। চোখের কাজল পলক পড়তে না পড়তেই সারা মুখে ছড়িয়ে দেবে। দারুণ দুরন্ত।'

রমা বউদিকে তার ছেলে ফিরিয়ে দিতে দিতে মাধুরী বলল, 'এবার যাই বউদি, বেলা হয়ে গেল।'

রমা বাধা দিয়ে পথ আটকে বলল, 'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। আরো যে কী একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। হ্যাঁ মনে পড়েছে। কাল যারা তোমাকে দেখতে এসেছিল, তারা কী বলে গেল?'

সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর মুখের হাসি নিভে গেল। একটি অপ্রীতিকর অপমানকর দুঃখের স্মৃতি তার মনকে আচ্ছন্ন করে রইল। কিন্তু একটু বাদেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে হেসে বলল, 'ভাল্লুক কানে কানে কি বলিয়া গেল? না বউদি, তারা কিছুই বলে যায়নি। কিছু আর বলবেও না।'

রমা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম কাল তোমাদের ফ্ল্যাটে যাই। গিয়ে তোমাকে একটু সাজিয়ে-টাজিয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু তোমার বাবা বাড়িতে ছিলেন, সাহস পেলাম না। তাছাড়া শুনেছি তুমিও খুব মতলব করেছ। ভাল একখানা শাড়ি পর্যন্ত পরোনি। ছি, এ কিন্তু তোমার ভারি অন্যায় মাধুরী।'

মাধুরী চুপ করে রইল।

রমা বলল, 'বুঝি, তোমার মনের ভাবও বুঝি। বারবার এমন কা'র আর ভাল লাগে?'

তারপর একটু থেমে বলল, 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কি জানো? যারা তোমাকে অমন হঠাৎ দেখে যায় তারা কেউ তোমার মর্ম বুঝতে পারে না। কিন্তু আমার মত এমন কেউ যদি থাকত যে তোমাকে রোজ দেখে, রোজ তোমার সঙ্গে কথা বলে, রোজ তোমার মনের কথা শোনে—তাহলে সে তোমাকে পুরোপুরি চিনতে পারত, সে তোমার আদর না করে পারত না।'

মনে আবেগ এলে রমা বউদির চোখ ছল ছল করে, গা রোমাঞ্চিত হয়। এখনো তাই হল।

মাধুরী একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। স্বামী-সন্তান ঘর-সংসার আর শাড়ি-গয়নার মধ্যে ডুবে-থাকা তারই সমবয়সী বউটিকে মাধুরী মাঝে মাঝে বড় অনুকম্পা করে। বড় স্থূল আর সাধারণ বলে মনে হয় এই জীবন—যার কোন ব্যাপ্তিও নেই, গভীরতাও নেই, অপরিসর ছোট গণ্ডির মধ্যেই যে পরিতৃপ্ত। কিন্তু এই রমা বউদির মধ্যেও মাঝে মাঝে একেকটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ঝলসে ওঠে। সহানুভূতির একেকটি অশ্রুবিন্দু অকূল হৃদয়সিন্ধুর ইশারা দিয়ে যায়। মানুষের রহস্যের শেষ নেই।

রমার বাহুতে সস্নেহে একটু চাপ দিয়ে মাধুরী বলল, 'বউদি, এবার যাই।'

বড় আয়নার সামনে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। একটু মোটা হলেও মোটামুটি সুন্দর চেহারা রমার। ফরসা রঙ, ধারালো নাক-চোখ। আবার ছেলেপুলে হবে। মাধুরী টের পেল, রমা বউদি তাকে এবার জড়িয়ে ধরল, তারপর আরও গাঢ় আবেগে বলল, 'আমি যদি পুরুষ হতাম তাহলে তোমাকে আর কোথাও যেতে দিতাম না মাধুরী।'

মাধুরী হেসে ওর হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'ভাগ্যে হওনি। তাহলে আমার একটা গতি হয়ে গেলেও সমীরদার দুর্গতির সীমা থাকত না।'

বিদায় নেওয়ার জন্যে এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল মাধুরী, কাতরভাবে বলল, 'এবার ছেড়ে দাও বউদি। আমাকে স্কুলে যেতে হবে। সমীরদার যে কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে। তিনি গেলেন কোথায়? ধমক দিয়ে তাকে কি বাড়ি-ছাড়া করলে?'

রমা হেসে বলল, 'না। মুখ-টুখ ধোয়ার জন্যে বাথরুমে গেছে। অফিসে যাওয়ার আগে ওই তো কাজ। এক ঘণ্টা বসে দাড়ি কামানো আর মুখ ধোয়া। কামিয়ে কামিয়ে এত কড়া করে ফেলেছে দাড়ি।'

মাধুরী হেসে বলল, 'তাই নাকি? কি করে বুঝলে?'

রমা গা টিপে দিয়ে হেসে বলল, 'তুমিও বুঝবে।'

ঘর পেরিয়ে বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত রমা মাধুরীর সঙ্গে সঙ্গে এল, তারপর হঠাৎ কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আসল কথাটা জিজ্ঞেস করিনি। কাল বুঝি রাতদুপুরে ছাতে তোমরা হাওয়া খেতে উঠেছিলে?'

ইঙ্গিতটা বুঝে মাধুরী মুখ ফিরিয়ে গম্ভীরভাবে একটু রূঢ় গলায় বলল, 'হ্যাঁ উঠেছিলাম, তাই কি। কী দোষ হয়েছে।'

রমা বলল, 'আহা দোষ আবার কিসের। আমি কিছুই দোষের মনে

রিনে। কিন্তু জানো তো এ-বাড়ির ব্যাপার। অমনিতে কেউ কারো খোঁজও রাখে না। কিন্তু দু'টি ছেলে আর মেয়েকে যদি পাশাপাশি এক জায়গায় দেখল আর রক্ষা নেই। নাম করে দরকার কি। পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাট আর ছ-নম্বর ফ্ল্যাটে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি, চোখ চাওয়া-চাওয়ি চলছে।'

মাধুরী গম্ভীরভাবে বলল, 'চলুক না।'

সে দোরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। রমা এগিয়ে এসে বলল, 'রাগ কোরো না। আমি ওসব বিশ্বাস করিনে, এ নিয়ে কারো সঙ্গে কোন আলোচনা করতেও চাইনে। তোমাকে বলা দরকার তাই বললাম। আমাকে দিয়ে তোমাদের কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।'

মাধুরী বলল, 'তা জানি বউদি। এবার যাই। বড়ই দেরি হয়ে গেল।'

কিন্তু রমা বউদির ওই এক দোষ। ছেড়ে দিতে দিতেও দেয় না। আস্ত একটি জোঁক।

জরুরী আর একটা কথা বলবার জন্যে সে মাধুরীকে ফের কাছে টেনে নিল, তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে হেসে বলল, 'একটা সত্যি কথা বলবে?'

মাধুরী বলল, 'এতক্ষণ কোনটা অসত্য বলেছি?'

রমা বলল, 'তা তো ঠিকই। মানে, ভদ্রলোক কে?'

মাধুরী বলল, 'কোন্ ভদ্রলোক?'

'কাল থেকে যিনি এসে রয়েছেন।'

মাধুরী বলল, 'আমাদের বন্ধু।'

রমা হেসে বলল, 'গৌরবে বহুবচন হচ্ছে বুঝি? আমাদের মানে কার সেই কথাই জানতে চাইছি।'

মাধুরী ভাবল, মানসীকে ধরিয়ে দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। এ ব্যাপারে রমা বউদিকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। ও নিজেই হয়তো সাতখানা করে পাঁচ নম্বর আর ছ' নম্বরের কাছে লাগাবে। ঠিক ইচ্ছা করে নয়, অভ্যাস দোষে।

মাধুরী বলল, 'উনি আমাদের দাদার বন্ধু। তারপর বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে।'

রমা হেসে বলল, 'মানে কথাটা ভাঙতে চাও না। আচ্ছা পরে দেখা যাবে। উনি কি সেই রূপকথার আংটি? আংটি তুমি কার? হাতে আছি যার।'

মাধুরী বলল, 'তুমি বসে রূপকথার ছড়া আওড়াতে থাকো, আমি চললাম।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ছড়ার ছন্দটা মাধুরীর মনকেও দোলা দিতে লাগল। রূপকথার আংটি, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, আর স্পর্শমণি।

যা ছোঁয়, তাই সোনা হয়। সেও কি কোনদিন সোনা হবে, কারো ভাবনা বাসনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সোনা করবে? কে সেই অজ্ঞাতনামা অজ্ঞাতপরিচয় পরদেশী?

'এই যে মাধুরী। কোথায় গিয়েছিলে? দেখা হয়ে গেল।'

মাধুরী একটু চমকে উঠল। এক বুড়ো ভদ্রলোক ওপরে উঠে আসছেন। চিনতে দেরি হল না। ব্রজবাবু, ব্রজবল্লভ রায়। বাড়ির মালিকের প্রতিভূ। মাধুরী নিজের মনেই হাসল। তার ভাগ্যে অচিন দেশের রাজপুত্র কি ইনিই?

তাঁকে পাশ ছেড়ে দিয়ে মাধুরী হেসে বলল, 'যাচ্ছি, একটু তাড়া আছে।'

ব্রজবাবু বললেন, 'তোমার তো সব সময় তাড়া। বিজি। সেই যে একটা পদ্য আছে—মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি, দাঁড়াও না একবার ভাই। ওই ফুল ফোটে বনে—'

মাধুরী আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সর্বনাশ, উনি গোটা কবিতাটাই আবৃত্তি করে শোনাবেন নাকি? এই সিঁড়ির ওপরে আর পাঁচজনের চলাচলের পথ বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে কবিতা শোনানো। লোকে দেখলে কি ভাববে।

মনে মনে বিরক্ত হলেও মাধুরী মুখে হাসি টেনে বলল, 'যাই, সত্যি কাজ আছে। আর এক সময় এসে বরং—। আজ আবার তাড়াতাড়ি স্কুলে বেরোতে হবে।'

ব্রজবাবু বললেন, 'ও, স্কুলের তাড়া আছে তোমার? তাই বল। তাহলে আর তোমাকে আটকে রাখব না। জানো, আমাদের গাঁয়ের স্কুলে আমিও এক সময় মাস্টারী করেছি। এদিক থেকে তোমার সঙ্গে বেশ একটা মিল আছে আমার। হে হে হে।'

ভদ্রলোক হাসলেন। তাঁর তোবড়ানো গাল নিষ্প্রভদৃষ্টি চোখ অপূর্ব প্রসন্নতায় ভরে উঠল।

মাধুরী অবাক। মিল আছে? আশ্চর্য! তুমি মাস্টারী কর, আমিও মাস্টারী করেছি। তোমার সঙ্গে আমার এইটুকু মিল। আমার যৌবন ছিল, তোমার যৌবন আছে, তোমার সঙ্গে আমার এইটুকু মিল। ভদ্রলোক কি এই-ভাবেই মিল খুঁজে খুঁজে নিজের মনে একটি মিলন-মন্দির গড়তে চান নাকি?

মাধুরী হাসল, কিন্তু পরিহাসের হাসি নয়। এক অদ্ভুত সহানুভূতিতে তার মন ভরে উঠল। আশ্চর্য, এমন কতজন আছে যারা তার রূপের যাচাই করতে এসে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়। আবার এমন মানুষও আছে, তার দিকে তাকিয়ে যাদের চোখের পলক পড়ে না। বিড়ম্বনা কোনটাতেই কম নয়। তবু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শকদের সব সময় ব্যঙ্গ করতে পারে না মাধুরী। নিজে বার বার আঘাত পেয়েছে বলেই যারা দুর্বল তাদের ঘা দিতে মন সরে না। তার এই সহনশীলতার অপব্যাখ্যা অনেকেই করে। আড়ালে

আবডালে বলে, মাধুরী এদের প্রশ্রয় দেয়। প্রশ্রয় ঠিক নয়। প্রশ্রয়ও দেয় না, আশ্রয়ও দেয় না। এদের উৎপাত হাসিমুখে সহ্য করে। অনেক সময় বরং হাসির ভান করে তবু সরাসরি অপমান করে না।

সে ওপরে উঠবে না জেনে ব্রজবাবু তার পিছনে পিছনে নেমে আসছেন তা সে টের পেয়েছে।

মাধুরী ফিরে না তাকিয়েই বলল, 'আপনি কি আর কোথাও যাবেন?'

ব্রজবাবু বললেন, 'না। চল, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। মাধুরী, তোমার হাতে সময় নেই, কিন্তু আমার হাতে অনেক সময়। এত সময় নিয়ে কী যে করি ভেবে পাইনে। তাই বার বার ঘর-বার করি, উঠি আর নামি।'

মাধুরী বলল, 'কিন্তু আপনার এই রোগা শরীর নিয়ে এমন অনিয়ম করা তো ঠিক নয়।'

ব্রজবাবু বললেন, 'ডাক্তারের ধমকে মাঝে মাঝে নিজের শরীরের তোয়াজ করি। ওষুধ খাই পথ্য খাই। কিন্তু একেক সময় বড় বিরক্তি ধরে যায়। দূর ছাই, কার জন্যে এই তোয়াজ। এই শরীর দিয়ে কি হবে। তিনকুলে কেউ নেই; শুধু নিজের হাত-পা চোখ-মুখ নিয়ে নিজের গৃহস্থালী। একি আর সব সময় ভালো লাগে?'

মাধুরী বলল, 'তবুও শরীরের যত্ন নেবেন।'

ব্রজবাবু বললেন, 'নেব মাধুরী। দেখ, এই সারা বাড়ির মধ্যে একথাটা আর কেউ বলে না। তুমি ছাড়া—।'

মাধুরী সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছিল, মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বলল, 'এবার যাই।'

ব্রজবাবু যেন এই আকস্মিক বিদায় প্রত্যাশা করেননি। আস্তে আস্তে বললেন, 'আচ্ছা এসো। হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোমাদের বাড়িতে গেস্ট এসেছেন। ঘর-দোরের অসুবিধে। যদি দরকার হয় আমাকে বোলো। আমি ব্যবস্থা করে দেব। আমার কাছে কোন সংকোচ কোরো না।'

মাধুরী বলল, 'আপনার কাছে সংকোচ কিসের। দরকার হলে আপনাকে জানাব।'

এ-কথা শুনে ব্রজবাবু খুব খুশী হলেন। রোগা লম্বা চেহারা। গায়ের রঙ বেশ ফরসা। বয়স চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন হবে। কিন্তু জরার চেয়েও যেন অজীর্ণতা রোগ দেহকে জীর্ণ করেছে বেশি।

ব্রজবাবুকে বিদায় দেওয়ার পরেও তার শীর্ণ চোয়াল-জাগা অথচ পরম প্রসন্নতা ভরা মুখখানি মাধুরীর চোখের সামনে আর এক মুহূর্ত ভেসে রইল। মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই অথচ সেই মানুষই একেক সময় কত অল্পেই খুশী হয়ে ওঠে। এই ব্রজবাবুকে সবাই খিটখিটে মেজাজের মানুষ

বলেই জানে। ভাড়া আদায় করে রসিদ দেওয়া আর ভাড়ার তাগিদ দেওয়া এই ওঁর কাজ। বাড়ির কোথাও মেরামত কি চুনকামের কথা উঠলে ব্রজবাবু তাঁর ভগ্নীপতির দোহাই দেবেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের মায়ায় এখনো পাকিস্তানেই পড়ে আছেন। তাঁর নাগাল পাওয়া সহজ নয়। তাই ব্রজবাবুর সঙ্গেই ভাড়াটের যত ঝগড়া-ঝাটি ঘাত-সংঘাত। কিন্তু মাধুরীর সামনে এসে ভদ্রলোকের যেন রূপ বদলে যায়, স্বভাব বদলে যায়। ভগ্নীপতির স্টেটের তশীলদার সৌজন্যে দাক্ষিণ্যে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে ওঠেন। কোন কোন সময় ওঁর অতি গদ্‌গদভাবে মাধুরী বিরক্ত হয়, লজ্জিত হয়; নিজের জন্যে নয়, ওঁরই জন্যে, বিশ্রী একটা অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু কোন কোন মুহূর্তে দুঃখ আর মায়াই হয় বেশি। সহানুভূতিতে মন ভরে যায়। এই মুহূর্তে যেমন হল। ব্রজবাবু যখন পিছন পিছন কথা বলতে বলতে আসছিলেন মাধুরীর মনে হচ্ছিল শুধু এক নিরবয়ব স্বর, আর কিছু নয়। এক বিমূর্ত অনুরাগ, আর কিছু নয়। শুধু তাই যদি হত, তাহলে কিছু দুঃখের থাকত না। তা তো নয়। ভদ্রলোককে কষ্ট পেতেও মাধুরী দেখেছে। অম্লশূলের মত আর এক শূল। অম্ল তিক্ত কষায়-ত্রিশূল। পার্বতীর ত্রিশূলে বিদ্ধ মহিষাসুরের ছটফটানি মাধুরী দেখেছে। শুধু কি দেখা? মাধুরী কি নিজেও অনুভব করেনি? আশ্চর্য, তনুর তৃষ্ণাকে উল্টো করে বলা হয় অতনু। অতনু যদি সত্যিই অতনু হতো, শুধু মনোময় মনোজীবী মনোবাসী হয়ে থাকত তাহলে মানুষের তনু অনেক দুঃখ লজ্জা পীড়ন লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু কেউ যদি মাধুরীকে বর দিতে আসে তোমার শরীর বলে কিছু থাকবে না, তুমি শুধু হবে মনোময়ী, শুধু একটি আইডিয়া, যাকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না, যে ধরা চায় না ছোঁয়া চায় না, যে পোড়ে না পোড়ায় না জ্বলে না জ্বালায় না! মাধুরী কি সেই বর নেবে? না না না। মাধুরী যেন শিউরে উঠল। অমন অলক্ষণে বর সে চায় না। আধার ছাড়া আধেয় দিয়ে কি হবে? তার যা আছে তাই ভালো। এমন কি মন্দটুকু তার নিজস্ব সম্পদ।

বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই ভিতরের শোরগোল শুনে মাধুরী অবাক হয়ে গেল। ব্যাপার কি। এই তো একটু আগে সে ওপরে গেছে। এরই মধ্যে কী হল। বাবার চড়া গলাটাই বেশি করে কানে আসছে। তখন তো দিব্যি শান্তভাবে অসীমদাকে ধর্মতত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন, কিন্তু এখন এত অশান্তির কোন্ কারণ ঘটল।

দরজা খোলাই ছিল। মাধুরী সেই প্যাসেজের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বাবা উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছেন। সেই চায়ের টেবিল চেয়ার বেঞ্চ অসীমদা সব ঠিক আছে। শুধু ধর্মক্ষেত্র এখন কুরুক্ষেত্র হয়েছে।

একটু বাদে শঙ্করের দিকে চোখ পড়ল মাধুরীর। সে দেয়াল ঘেঁষে শক্ত একটি পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে ছাই রঙের ট্রাউজার, গায়ে ফেন-শুভ্র শার্ট, চমৎকার মানিয়েছে।

মাধুরী এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে ডাকল, 'দাদা, তুমি কখন এলে? এসো এসো ঘরে এসো।'

কিন্তু তার সেই সাদর-সম্ভাষণ মনোমোহনের উঁচু গলার কটু ভাষণের নিচে তলিয়ে গেল।

মনোমোহন তারস্বরে চেঁচিয়ে হাত নেড়ে মুখ বিকৃত করে বলতে লাগলেন, 'হতভাগা হারামজাদা শুয়োর! তুমি এসেছ আমাকে নেমন্তন্ন করতে। লজ্জা করে না—আমার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে তোর লজ্জা করে না? কত বড় স্পর্ধা তুই আমার বাড়িতে এসেছিস! নিজের বাপ-মার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের চূড়ান্ত করে ছেলের জন্মদিনে লোক দেখানো নেমন্তন্ন করতে এসেছিস। কেউ যাবে না। আমার গোষ্ঠীর আমার রক্তে যাদের জন্ম তারা কেউ যাবে না। যদি কেউ যায় সে বেজন্মা।'

অসীম বলল, 'ছি ছি ছি, মেসোমশাই থামুন, থামুন। এসব কী হচ্ছে। এমন দিনে আপনি আরো কোথায় ওকে আশীর্বাদ করবেন।'

'আশীর্বাদ!' মনোমোহন যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'আমাকে ঠাট্টা করছ অসীম? আশীর্বাদ তো শুধু মুখের বচন নয় বাবা, সে অন্তরের জিনিস। সেই অন্তর ও আমার ছিঁড়ে দিয়েছে। এখন এসেছে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে। সেই বেনো জলে মূল ওপড়ানো গাছ বাঁচে না অসীম, ডালপালা লতাপাতাসুদ্ধ ভেসে যায়। আমিও অকূল সাগরে ভেসে চলেছি।'

মাধুরী এগিয়ে এসে অনুনয়ের সুরে বলল, 'বাবা, একটু থামো। ব্যাপারটা কী হয়েছে শুনতে দাও।'

কিন্তু মনোমোহন কাউকে কিছু বলতেও দেবেন না, শুনতেও দেবেন না। তিনি সমানে চীৎকার করতে লাগলেন, 'খবরদার ওই কুলাঙ্গারের পক্ষ নিয়ে কেউ আমাকে কোন কথা বলতে এসো না। আমি তা রাখতে পারব না, কিছুতেই পারব না।'

মাধুরী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, বাড়ির সবাই সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। মঞ্জু আর মিনু স্কুল থেকে এখনো ফেরেনি। ওরা দু'জন ছাড়া আর সবাই আছে। মা, মায়া, নন্দু। কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। এই রঙ্গমঞ্চে বাবা আর দাদা দু'জনে শুধু নট। আর বাকি সব বিমূঢ় মূক মানবীয় পশ্চাৎপট। কিন্তু দেখতে না দেখতে এঁটো হাতে এঁটো মুখে মানসী এসে দাঁড়াল। সবাইকে ঠেলে সরিয়ে বাবার সামনে এসে তাঁকে ধমক দিয়ে বলল, 'কী শুরু করেছ তোমরা ছিঃ। যেতে হয় যাবে, না হয় না যাবে।

কিন্তু এ কী চেঁচামেচি শুরু করেছ। বাড়িটা যেন একটা বস্তিবাড়ি হয়ে উঠেছে। হাটে-বাজারেও এমন বিশ্রী গোলমাল শোনা যায় না।'

তারপর শঙ্করের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আর দাদা, তোমাকেও বলি, তোমাদের মধ্যে কি রিলেশন গড়ে উঠেছে তা তো জানোই। সব জেনে-শুনে কেন এই ফার্স করতে আসা।'

মাধুরী বোনকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, 'ছিঃ, ও কি বলছিস মানু। ফার্স কেন হবে।'

মানসী বলল, 'নিশ্চয়ই ফার্স।' তারপর একটু হাসল, 'অবশ্য তোমরা যদি একে ট্রাজেডীর মহিমা দিতে চাও দিতে পার, আমার আপত্তি নেই।' সেখানে আর দাঁড়াল না মানসী। এঁটো হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

মনোমোহন এতক্ষণ কোন কথা বলেননি, এবার ফের শুরু করলেন। অসীমকে সাক্ষী মেনে বলতে লাগলেন, 'জানো অসীম, ওই শুয়োর আমাকে আমার নাতির অন্নপ্রাশন করতে দেয়নি। তখন আমার সঙ্গে ওর মহাবিবাদ। আর আজ সেই ছেলের জন্মদিনে আমাকে বলতে এসেছে। আরে পাঁঠা, তোর ছেলের জন্মদিনের সমারোহ তুই করবি না আমি করব? জানো, ওই পাঁঠা যখন জন্মাল তার দু'বছরের মধ্যে আমি আমার বাবার মুখের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারিনি। তিনি ওকে আদর করেছেন যত্ন করেছেন, ঘটা করে অন্নপ্রাশন দিয়েছেন। আমরা জানি এই রীতি। আর আজ ও নিজেই সর্বে-সর্বা হয়েছে! নিজের হাতেই সব করছে, নিজের মুখেই সব বলছে। লজ্জা বলে কোন পদার্থ যদি শরীরে থাকত—।'

বাবার কথা শুনে মাধুরীর হাসিও পায় আবার দুঃখও হয়। দুঃখ কার জন্যেই-বা না হয়ে পারে? শঙ্কর পাশ কাটিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে মাধুরী তাড়াতাড়ি ওর পিছনে পিছনে গেল। কাছে গিয়ে বলল, 'দাদা, চলে যাচ্ছ কেন, ঘরে এসো।'

শঙ্কর বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'না মাধুরী, ঘরে আর যাব না।'

শঙ্কর রাস্তায় নেমে পড়ল। ঘর আর পথের ব্যবধান তো সামান্যই।

মাধুরী লক্ষ্য করেছে, দাদা সারাক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বাবার একটি কথার জবাবও সে দেয়নি অথচ কাটাকাটা কথা বলে মানুষের মর্ম ছিঁড়ে দিতে দাদা কারো চেয়ে কম পারে না। কিন্তু যে জন্যেই হোক কারো কথারই আজ সে প্রতিবাদ করেনি। বাবারও না, মানসীরও না। এই মুহূর্তেও তার মুখে রাগের তেমন কোন লক্ষণ নেই, চোখে জ্বালাও নেই, জলও নেই। কিন্তু ওই যে একটি কথা, 'মাধুরী, ঘরে আর যাব না,' ও কথা শুনলে কারো

হৃদয় না কেঁদে পারে? চোখের জল বাধা মানতে চায়? যে মানুষ অভিমান করে বলে, আর যাব না, সে ভাই হোক বন্ধু হোক, গৃহী হোক সন্ন্যাসী হোক, কোন মেয়ে তাকে কি ফিরিয়ে আনবার জন্যে না সেধে পারে?

মাধুরী শঙ্করের হাতখানা ধরে বলল, 'চল দাদা, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আজ বুঝি পিলুর জন্মদিন?'

শঙ্কর বলল, 'হ্যাঁ, কলেজে একটা ক্লাস আজ নিতে হল না। সেই ফাঁকে চলে এলাম। ভাবলাম সন্ধ্যার পর এই উপলক্ষে এক সঙ্গে সব মীট করা যাবে। কিন্তু এসে তো এই কাণ্ড। বাবা-মাকে বলিনি, জানি ওরা যাবেন না। আমি তোদের বলতেই এসেছিলাম। যাই, ওই আমার বাস এসে গেছে। অসীমকে কালই বলে রেখেছি। যদি যায় যেতে পারে। আর তোদের যদি কারো প্রবৃত্তি হয়—'

কথা শেষ না করে শঙ্কর ছুটে গিয়ে শ্যামবাজারগামী চলন্ত বাসটার হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলল।

বাসটা তাকে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অনেক দূরে চলে গেল।

মাধুরী একটুকাল অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। দাদা সেই ছেলে-মানুষই রয়ে গেছে। গোঁয়ার্তুমি আর গেল না। অত রিস্ক নিয়ে কেউ বাস ধরে? যেন ওতেই যত বাহাদুরী।

মুখ ফিরিয়ে মাধুরী আস্তে আস্তে ঘরের দিকে পা বাড়াল।

ফিরে এসে মাধুরী দেখল মনোমোহন যেভাবে বসেছিলেন সেইভাবেই বসে আছেন। যে কথা বলছিলেন তাই বলে চলেছেন। ছেলের উদ্দেশ্যে গালাগাল, নিন্দামন্দ এখনো শেষ হয়নি।

'জানো অসীম, ওর মত স্বার্থপর, ওর মত মতলববাজ আমি আর কাউকে দেখিনি। আমার এতখানি বয়স হল, কতরকমের কত মানুষ দেখলাম। কিন্তু ওর মত ক্রূর ওর মত খল—'

অসীম বলল, 'আপনি মিথ্যে রাগ করছেন মেসোমশাই। ছেলের জন্ম-দিনে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে এতে তার কি মতলব থাকতে পারে!'

মনোমোহন বললেন, 'তুমি জানো না অসীম। তুমি তোমার বন্ধুকে চেন না। ওর মাথার মধ্যে দাবার চাল। ও এক স্টেপ এগোবার আগে পরের দশ স্টেপের কথা ভেবে রাখে। ও আলাদা হয়ে গেছে কেন জানো। নিজের নামে বাড়ি করবে, গাড়ি করবে। সেই হল আসল উদ্দেশ্য। একসঙ্গে থেকে গোষ্ঠী পালন করে তো আর তা হবে না।'

মাধুরী চলে যাচ্ছিল, মনোমোহন তাকে ডেকে বললেন, 'এই শোন, ও তোকে গোপনে গোপনে কী বলে গেল।'

মাধুরী থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী আবার বলবে।'

'যেতে বলে গেল তো? খবরদার যেতে পারবিনে। আমি বলে দিচ্ছি কেউ যেতে পারবিনে।'

মাধুরী একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'সে-কথা তো হয়েই গেছে বাবা। বারবার বলে লাভ কি।'

মাধুরী আর সেখানে দাঁড়াল না। তারও এবার বেরোবার উদ্যোগ-আয়োজন করতে হবে। যেতে যেতে শুনল, বাবা বলছেন, 'আমার নিজের ঘরেই এককেটি বিভীষণ। সব আমার খাবে আমার পরবে, কিন্তু যত টান দাদার দিকে। আমার পিছনে দাঁড়াবার মত কেউ নেই অসীম, পাশে দাঁড়াবার মত কেউ নেই। জীবনভর আমাকে একাই লড়তে হয়েছে, একাই লড়তে হবে।'

বাবার এই সব আক্ষেপ শুনে মাঝে মাঝে হাসিই পায় মাধুরীর। ছেলেমেয়ে নিয়ে নিজের সংসারে থেকেও কেন উনি নিজেকে অত নিঃসঙ্গ মনে করেন, নিঃসহায় ভাবেন? একটু আগে প্রায় বাবার বয়সী ব্রজবাবুও নিঃসঙ্গতার কথা বলছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই, কেউ নেই সংসারে। তাঁর নিঃসঙ্গতার একটা মানে হয়। কিন্তু বাবা নিঃসঙ্গ হবেন কেন। ব্রজবাবু বলছিলেন আর কাউকে না পেয়ে নিজের হাত-পা নিয়ে ঘরসংসার করেন। আর বাবা করেন নিজের মত, নিজের রুচি, নিজের দম্ভ অহংকারকে নিয়ে। আর কারো অস্তিত্ব বাবা সহ্য করতে পারেন না, দেখতে পান না, দেখতে চান না; হয়তো সেইজন্যেই এই নিঃসঙ্গতা। নির্জীব বস্তু তো আর মানুষকে সঙ্গ দেয় না, মানুষই মানুষকে সঙ্গ দেয়।

একটু এগিয়েই মাধুরী দেখতে পেল মানসী বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে নিয়েছে। চাঁপা রঙের সেই শাড়িখানা পরেছে মানসী। গায়ে সবুজ রঙের ব্লাউস। কপালে ছোট একটি কুঙ্কুমের টিপ। সব মিলিয়ে বেশ লাগছে দেখতে। দৃঢ় তীক্ষ্ন বপু। অথচ একটু স্নিগ্ধতাও আছে। রজনীগন্ধার ডাঁটার মত। অন্য কোনদিন তো এত সাজে না। সাজলেও এত সুন্দর দেখায় না। মানসী যে কেন আজ এমন বেশবাসের দিকে মন দিয়েছে তা অনুমান করা কঠিন নয়। মাধুরী মনে মনে হাসল। মাধুরী বলল, 'কি রে, তোর এরই মধ্যে সময় হয়ে গেল। আজ যে এত তাড়াতাড়ি।'

মানসী বলল, 'তাড়াতাড়ি কই দিদি। আমি তো এই সময়েই বেরোই। মিনিট দশ-পনের আগে যাচ্ছি। বাসে যা ভিড়।'

মাধুরী মুখ টিপে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, একটু আগে বেরোনই ভালো।'

তারপর বোনের আরো কাছে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'আজ কিন্তু তোকে বেশ লাগছে দেখতে।'

মানসী বলল, 'অন্য দিন বুঝি লাগে না।'

মাধুরী বলল, 'লাগে। আজ আরো ভালো লাগছে। তাছাড়া আজ

আমি আরো একজনের চোখে দেখতে চেষ্টা করছি কিনা। একসঙ্গে দু'জনের দেখা দেখছি।'

মানসী আজ যেন কোন ঠাট্টা-তামাশা বুঝবে না বলে পণ করে বসেছে। নইলে যে কথায় ওর হাসবার কথা তাতে ওর মুখ ভার হবে কেন।

পরক্ষণেই মানসী অবশ্য হাসল। হেসে খোঁচা দিয়ে বলল, 'দিদি, তোর তো এসব বিদ্যে ছিল না। কারো চোখের ভালো চশমা জোড়াও তো তুই ছুঁয়ে দেখিস নে। আজ একেবারে আর একজনের চোখ নিয়ে টানাটানি।'

মাধুরী বলল, 'ভয় নেই, চোখ নিলেও সে অন্ধ হবে না। অন্ধ যদি হয়ে থাকে আগেই হয়েছে।'

মানসী একথার কোন জবাব না দিয়ে দোরের দিকে এগিয়ে গেল। চমৎকার করে বড় একটি বিড়ে খোঁপা বেঁধেছে। ওর চুলের গোছ মাধুরীর চেয়ে বড়। কোন মাসিক কাগজে যেন একটি কবিতা পড়েছিল—কবি তাঁর প্রিয়ার চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে চান। অসীমদাও ওর চুল নিয়ে কম কবিত্ব করেননি। মাধুরী হাসল। গোড়ার দিকের দু'-একখানা চিঠি চুরি করে পড়েছিল। এখন আর পড়ে না। হয়তো মাধুরী নিজেই লজ্জা পাবে। প্রেমিকরা কি কবি হয়! মূক বাচাল হয়ে ওঠে?

এবার মাধুরীকেও নাইতে যেতে হয়। বেলা হয়ে গেছে। কাল ওঁদের চক্রান্তে পড়ে স্কুল কামাই করতে হল। আজ একটু তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো।

'মা, আমি নাইতে চললাম।'

মাধুরী রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ছোট ঘরটুকুর মধ্যে সুহাসিনী রেঁধে চলেছেন। গরমে আর আগুনের তাপে শীর্ণ শরীরকে আরো শীর্ণ দেখাচ্ছে।

সুহাসিনী বললেন, 'যাও। আমার বেশির ভাগ রান্নাই হয়ে গেছে। এই তো মানুও খেয়ে গেল।'

কেমন যেন লজ্জা করে মাধুরীর। এই বয়সে মা রোজ তাদের অফিসের রান্না রাঁধবেন ভাবতে বড় বিশ্রী লাগে। যদিও ছেলের মতই মাধুরীরা আজকাল চাকরি করে, বলতে গেলে তাদের টাকাতেই সংসার চলে, তবু রান্নাবাড়ার কাজে মার ব্যস্ততা দেখে, তাঁর পরিশ্রম দেখে কেমন যেন একেক দিন সংকোচ হয়। সত্যি, কত বয়স হয়ে গেছে মার। অনেক ছেলেমেয়ে হওয়ায় স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে। তবু রোজ দু'বেলা রেঁধে যাচ্ছেন তো রেঁধেই যাচ্ছেন। শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই, আলস্য-অসুখ রোদ-বৃষ্টি নেই।

বউদির সঙ্গে এই রান্না নিয়েই তো লাগতো। বউদি বড়লোকের মেয়ে। দু'-একটা শৌখীন রান্না ছাড়া রান্না-বান্না তেমন জানে না। এসব কাজে তার

কৌতূহলও নেই ঔৎসুক্যও নেই। সে চা করতে, গল্প করতে, খবরের কাগজ সামনে নিয়ে যত রাজ্যের তর্ক করতে ভালোবাসে। রান্নার কাছে কিছুতেই আসতে চায় না। এই নিয়ে মা খোঁটা দিতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দাদার মুখভার। দাদারও ইচ্ছা নয় তার বউ ওসব দিকে বেশি যায়। তার সুন্দরী বউয়ের গায়ে আগুনের আঁচ লাগে, কালি-ঝুলি লেগে সোনার অঙ্গ মলিন হয়। খোঁটা খেয়ে খেয়ে যদি-বা বউদি দু'-একদিন যেত তার রান্না কিছুতেই মার পছন্দ হত না। তার হাতের ভাত হয় বেশি ফুটে যেত, না হয় শক্ত থাকত, তার হাতের ঝোল তরকারিতে কোন স্বাদ আসত না। ফের খোঁটা চলত। বউদির হয়ে দাদা লড়ত, 'এ তো মজা মন্দ নয়, রাঁধতে গেলে দোষ, না গেলেও দোষ। আসলে কোন-না-কোন ছলে দোষ দেওয়াটাই উদ্দেশ্য। আর সব উপলক্ষ।'

কখনো বলত, 'দরকার কি অত সতের পদ রান্না করে। শুধু দুটো পদ হলেই যথেষ্ট।'

মা বলতেন, 'কেন, তোর বউ রাঁধতে জানে না বলে আমাদের ভাতে ভাত খেতে হবে নাকি। আমার দুটো হাত নেই? গায়ে শক্তি নেই?'

দাদা বলত, 'তোমার গলার শক্তিও কম নয়।'

মাধুরী লক্ষ্য করেছে, মা রান্নাঘরের সাম্রাজ্য কাউকে ছেড়ে দিতে রাজী নন। তবে কেউ যদি এসে জোগান দেয়, সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহলে খুব খুশী! কিন্তু আজকালকার লেখাপড়া জানা বউ রান্নাঘরকে গোটা পৃথিবী কেন করবে। সে চাকরি করুক আর নাই করুক, কেন রান্নাঘরে দেড় ঘণ্টা দু' ঘণ্টার বেশি থাকতে চাইবে। তাদের মনে ঘর-সংসারের প্যাটার্ন যে আলাদা হয়ে গেছে তা মা বুঝতে পারেন না। তিনি বউয়ের কাজ থেকে সেকেলে আদর্শে যে আনুগত্য, যে বশ্যতা চান তা পাবেন কি করে। দু'জনের রুচি বুদ্ধি শখ সুখ যে আলাদা আলাদা। মা চাইলেন ছেলের বউ অবিকল তাঁর মত হবে। সে হবে তাঁরই প্রতিমূর্তি। কিন্তু বউ তা চাইল না, ছেলে তা চাইল না। মার শুধু ঘরখানাই ঘর-সংসার। কিন্তু দাদা-বউদির সংসার ঘরে-বাইরে ছড়ানো। তাদের থিয়েটার-সিনেমা, পার্টি, পিকনিক, বন্ধু-বান্ধব, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ সব চাই। মা যা চান আর ওরা যা চায় এই দু'পক্ষের চাওয়ায় কেবলই ঠোকাঠুকি লাগতে লাগল। অনেক ছেলে আপোস করে। ভাবে, বাবা-মা ক'দিনই-বা আছেন। তাঁদের জন্যে কিছু না হয় ছেড়ে দিলাম, সহ্য করলাম। কিন্তু দাদা সে পথে গেল না। অনেক বাপ-মা আপোস করেন, ভাবেন হাজার হোক নিজেরই তো ছেলে—বলতে গেলে নিজেরই প্রত্যঙ্গ। স্নেহে কৌতুকে তার অবাধ্যতা, বিরোধিতা, স্বার্থপরতা সব উড়িয়ে দেন। কিন্তু বাবা-মা সে পথে গেলেন না। ছেলে যেন প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী। ছেলে বড় হলে তাকে

সমকক্ষ বলেই ভাব, তাকে ভাই বলে মনে কর, বন্ধু বলে মনে কর। না হলে সে পরের চেয়েও পর। মানসী শুধু দাদা-বউদির ঘাড়ে দোষ চাপায়, মাধুরী তা পারে না। কিছুকাল আগেও দাদার স্নেহ-ভালোবাসার, বন্ধুত্বের কথা মাধুরীর মনে পড়ে যায়। এই সেদিন পর্যন্ত কি হৈ-চৈ হুটোপুটি ছুটোছুটোই না তারা তিনজনে মিলে করেছে। সে, মানসী আর দাদা। এখন যেমন তারা তিনজন। মানসী আর—। যাঃ, কী যে সব আবোল-তাবোল ভাবছে মাধুরী, কোন মানে হয় না।

'আচ্ছা মা, আজ আবার এতগুলি পদ কেন রাঁধতে শুরু করেছ বলতো।'

মার আরো কাছে এগিয়ে এসে মাধুরী জিজ্ঞাসা করল।

যে কথার মানে হয়, সেই কথাই বলল এবার।

সুহাসিনী একটু হেসে বললেন, 'ওমা, অসীম যে আজও খাবে এখানে।'

মার মুখে শব্দটা বড় মিষ্টি শোনাল। অসীম।

মাঝে মাঝে একেকজনের মুখে একেকটা কথা যেন নতুন ব্যঞ্জনা, নতুন মাধুর্য পায়।

মাধুরী হেসে বলল, 'তা খেলই বা। তোমার অসীম যে কত খেতে পারে, তা তো দেখছি। সবই তো পাতে পড়ে থাকে। তোমার কেবল কষ্টই সার।'

সুহাসিনী বললেন, 'থাক। আমার কষ্টের কথা তোমাকে আর ভাবতে হবে না বাপু। নাইতে যাবে তো যাও। শেষে যে নাকে-মুখে গুঁজে পাঁচ মিনিটের মধ্যে একেবারে রুদ্ধশ্বাসে—।'

মাধুরী হেসে বলল, 'রুদ্ধশ্বাস নয় মা, ওটা ঊর্ধ্বশ্বাস।'

শাড়ি সায়া তোয়ালে নিয়ে মাধুরী হাসিমুখে এবার বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। দেয়াল-আলনায় সেগুলি ঝুলিয়ে রেখে মাধুরী চৌবাচ্চার কাছে এসে জলের দিকে তাকাল। মানসী জল বেশি খরচ করে যায়নি। এখনো প্রায় পুরো চৌবাচ্চাই ভরা। দেখে মাধুরীর মন প্রসন্ন হল। অবশ্য সব জলই তার নয়। বাড়ির প্রায় সবাই এখন বাকি। হিসেব করে, বিবেচনা করে তাকে এ-জল খরচ করতে হবে। তবু দেখতে ভালো লাগে। ভরা চৌবাচ্চা দেখতে ভালো লাগে। 'শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে 'অতল জলের আহ্বান।' কিন্তু আহ্বানই সার। কোথায় সেই অতল সমুদ্র। এই চৌবাচ্চার মধ্যেই তাকে কল্পনা করে নিতে হয়। কিংবা কল্পনার দরকার হয় না। চৌবাচ্চাটাই আপনা-আপনি সিন্ধু হয়ে ওঠে। আর মন রঙীন একছিটে মাছ হয়ে তার মধ্যে ডোবে ভাসে সাঁতার কাটে। জল-ভরা কাঁচের বৈয়মের মধ্যে রঙীন মাছের খেলা, মাছের সেই রঙের খেলা মাধুরী দেখেছে। মুহূর্তের জন্যে

সেই মৎস্য-জন্ম নিতে সাধ যায় মাধুরীর। একটি রঙীন মুহূর্ত, একটি রঙীন মুহূর্তময় জীবন।

রঙ, শুধু রঙ। এই সাদা-মাঠা বাথরুমেও আজ রঙ চোখে পড়ল মাধুরীর। তেলের শিশিতে রঙ, সবুজ সাবানদানি আর সাবানে রঙ। সাবানখানা ভিজে। এইমাত্র মানসী গায়ে মেখে গেছে। নতুন সাবান বের করেছে। ক্ষয়ে-যাওয়া পুরোন সাবানটুকু সোপ-কেসের সঙ্গেই লেগে আছে। মাধুরী আস্ত সাবানখানাই হাতে তুলে নিল। আস্তই তো। একবার গায়ে মাখলেও আস্ত। সাবানখানা হাতে নিতে ভালো লাগছে। দেখতে ভালো লাগছে। গায়ে-মুখে মাখতে ভালো লাগছে। মগে করে জল ঢালল মাধুরী। শীতের দিনে এক মগ জলকে মনে হয় যেন একখানা ধারালো ছুরির ফলা। কিন্তু ঋতু বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই জল রূপ বদলায়। সেই জল আর বিদ্ধ করে না, আদর করে। মুখে গলায় বুকে সর্বাঙ্গে। আগে আগে নেবুতলার বাসায় মানসী আর মাধুরী একসঙ্গে নাইতে আসত। মনে পড়ে বাথরুমটা তাদের হুটোপুটি দাপাদাপিতে সত্যিই উত্তাল সমুদ্র হত। সেই সমুদ্রে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠত। জলতরঙ্গ, হাসিতরঙ্গ, স্বরতরঙ্গ, সুরতরঙ্গ; মাধুরী বোনের গায়ে-পিঠে সাবান মেখে দিত, মানসীও দিত দিদিকে। তারপর অনেকদিন—অনেকদিন হল তারা একসঙ্গে নাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এখন লজ্জা করে। আর একজনের সামনে এমন করে নাইতে লজ্জা করে। যদিও সবই জানা, সবই পরিচিত, তবু এক অজানা রহস্য যেন প্রতিটি অঙ্গে, প্রতিটি প্রত্যঙ্গে এসে বাসা বেঁধেছে। সে-বাসাকে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হয়। পাতার আড়ালে বাসা। বাসার আড়ালে বাসনা। শুধু সাবানের ফেনায় মাথা, জলের ধারায় ঢাকা এই দেহের দিকে মাধুরী নিজেও তাকায় না। তাকাবার দরকারই-বা কি। না তাকিয়েও নিজের প্রতিটি অঙ্গকে সে অনুভব করতে পারে। প্রত্যেকের যেন আলাদা সত্তা আছে, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, বিমুখতা-উন্মুখতা। এমন অনেক দিন যায়, অনেক রাত্রি কাটে নিজের দেহের অস্তিত্ব যখন আলাদা করে টের পাওয়া যায় না। দেহ তখন সাধারণ একটা যন্ত্র। যন্ত্র কি নিজের সত্তাকে টের পায়? নিজের যন্ত্রণাকে, আনন্দকে? দেহ তখন প্রাণহীন, বাসনাহীন এক বাহন মাত্র। ব্যস্ততার সময় যখন ট্রামে কি বাসে মাধুরী যায়, তখন যে কিসে চড়ে গেল, কোন্ পথে গেল মনেই থাকে না, তখন গমনটাই সব। এও যেন তেমনি। কিন্তু অসুখের সময় দেহটাই সব। হাতে-পায়ে চোখে-কানে কোথাও কিছু ঘটুক, তখন সেই প্রত্যঙ্গই সর্বাঙ্গ হয়ে ওঠে। সেই অঙ্গের দুঃখই পৃথিবীর সব দুঃখের বড়। সুখের সময়েও কি তাই। এই দেহের আধারে তখন লক্ষ শিখা জ্বলে ওঠে, প্রতিটি প্রত্যঙ্গ সাড়া দেয়, কথা বলে, উচ্ছল হয়ে ওঠে। মন তখন তন্ময়, মানে তনুময়। কিন্তু এত

সুখ কিসের মাধুরীর। এমন কি কাণ্ড ঘটল, যাতে নাইতে এসে সুখের সাগরে নেমে পড়েছে। কিছুই ঘটেনি। সুখ যখন আসে, তখন কোন ঘটনার অপেক্ষা রাখে না। একটি ফুল দেখলে সুখ, দু'টি চোখ দেখলে সুখ, একজনকে হাসতে দেখলে সুখ। সুখ যে কিসে নেই, কোথায় নেই, তাই তখন খুঁজে পাওয়া যায় না। আজ রমা বউদি তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই স্পর্শ যেন এখনো গায়ে লেগে আছে। বলেছিল, 'যদি পুরুষ হতাম।' ভারি অসভ্য রমা বউদি। আর একদিন বলেছিল, 'তোমাকে যে পাবে, মানে এমনি করে জড়িয়ে ধরবার জন্যে পাবে, তার সুখের সীমা থাকবে না।'

ভারি অসভ্য রমা বউদি। সুখ মানে কি শুধু এই। তোয়ালে দিয়ে গা মোছা শেষ করল মাধুরী। শুকনো শাড়ি পরল, ব্রেসিয়ার পরল, ব্লাউসের বোতাম আটকাল। মনে মনে হাসল। মানসীর কোন কিছু তার আর গায়ে লাগে না। আগে অদল-বদল হয়ে যেত। এখন আর তা হয় না। কে যেন বলেছিল—অসীমই বুঝি, বলেছিল, 'তোমরা একবৃন্তে দু'টি ফুল।' ফুল তারা অনেকগুলি। তবে দু'টিতে কাছাকাছি পিঠাপিঠি, তবু দু'জনে এক নয়। একজনকে আর একজন বলে ভুল হয় না। তারা একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে শোয়, একই ধরনের শাড়ি-ব্লাউস পরে, একই ধরনের বইয়ের প্রায় একই জায়গায় এসে বিরক্ত, উত্ত্যক্ত কিংবা উচ্ছ্বসিত, উল্লসিত হয়। তবু তারা এক নয়, তবু তারা বিভিন্ন। মাধুরী যেন নিজের স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তা নতুন করে আবিষ্কার করল, অনুভব করল। 'কী আনন্দ, আমি আলাদা। ভালো হই, মন্দ হই—আমি স্বতন্ত্র, আমি অনন্যা। আমার আলাদা সুখ-দুঃখ সাধ-স্বপ্ন আনন্দ-বেদনা নিয়ে ঠিক অবিকল আমার মত কেউ কোনদিন আসেনি, কেউ কোনদিন আসবে না। আমার সঙ্গে বাইরের পাঁচজনের যে মিল, সে মিল শুধু জাতিগত, শ্রেণীগত, তাই কিছুটা চেহারাগত। কিন্তু ব্যক্তিত্বের যে স্বাদ তাতে কোন মিল নেই। সে স্বাদ আমার একার। সেই স্বাদেই আমি সম্পূর্ণ। কিন্তু অমিলে-অমিলে যে মিল তা কি আরো বিস্ময়কর নয়? আরো পূর্ণতর নয়?'

কী যা-তা ভাবছে মাধুরী। হ্যাঁ, মানসীর সঙ্গে অসীমদার একটু খিটিমিটি বোধহয় হয়েছে। অমন হয়, হয়েই থাকে। কী নিয়ে যে হয়েছে, তা অবশ্য মাধুরী জানে না। শুধু মানসীর মেজাজ দেখে আন্দাজ করছে। কিন্তু সে মনোমালিন্য মানসী নিশ্চয়ই নতুন সাবান মেখে ধুয়ে ফেলেছে। ওর সাজসজ্জায়, খোঁপা বাঁধার ধরন দেখে তাইতো মনে হল। মানসী যে পনের মিনিট আগে বেরিয়েছে হয়তো এইজন্যেই। অসীম সঙ্গে যাবে বলে। বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়, ঠিক পাড়ার মধ্যে বাড়ির ধারের বাস-স্টপে প্রত্যেকের লক্ষ্যস্থল হয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলবার মত কাঁচা মেয়ে মানসী

নয়। অসীম নিশ্চয়ই নিঃশব্দে ওর অনুসরণ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাসে উঠে পাশে গিয়ে বসেছে। একজন অফিসে যাচ্ছে, আর একজন অভিসারে। নাকি দু'জনই অভিসারে। মানসী কি আজ অফিস করবে? মনে তো হয় না। কালকের কামাইটা ওর বিফলে গেছে। আজকের কামাইতে ফল ফলবে। শুধু পনের মিনিট সময় একসঙ্গে গল্প করে মানসী নিশ্চয়ই ক্ষান্ত হবে না। পুরো একটি জীবনের পরিকল্পনা সিকি ঘণ্টায়, আধা ঘণ্টায় কি সারা যায়? ওরা নিশ্চয়ই আজ সারাদিন ঘুরে বেড়াবে। আহা ঘুরুক। 'যেথায় সুখে তরুণ যুগল পাগল হয়ে বেড়ায়', মাধুরী সেখানে তার সমস্ত স্নেহ-প্রীতি, শুভেচ্ছা, সহায়তা পাঠিয়ে দেবে।

বাথরুমের দরজা খুলে মাধুরী এবার বেরিয়ে পড়ল। হাতে ভিজে শাড়ি তোয়ালে।

সুহাসিনী বললেন, 'বাবা, সেই কখন ঢুকেছিস। ওগুলি দে। আমি মেলে দেব। তাড়াতাড়ি কর নইলে নির্ঘাত লেট হবি। অসীম বসে আছে নাইবে বলে।'

মাধুরী বিস্মিত হয়ে বলল, 'বসে আছে! সে চলে যায়নি?'

সুহাসিনী বললেন, 'অবাক করলি। না নেয়ে, না খেয়ে এত বেলায় কোথায় বেরোবে। তারও নাকি তাড়া আছে। কাজ আছে অফিস অঞ্চলে।' তারপর মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'অসীম, তুমি তাহলে চট করে চান করে নাও। তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দিচ্ছি।'

নিজের মনে মাধুরী শেষ কথাটির প্রতিধ্বনি শুনল, 'দু'জনকে একসঙ্গে দিচ্ছি।'

মাধুরী লক্ষ্য করল, অসীম চেয়ারে হেলান দিয়ে বই পড়ছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। এই কি জরুরী কাজ থাকার লক্ষণ!

মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, 'মানসী কোথায় মা?'

সুহাসিনী বললেন, 'তোর আজ হয়েছে কি বলতো? এত অন্যমনস্ক? মানু তোর চোখের ওপর দিয়ে অফিসে বেরিয়ে গেল না? বোধহয় এতক্ষণে পৌঁছেও গেছে।'

মানসী গেছে, অসীমদা যায়নি। আশ্চর্য! মাধুরী ঘরের মধ্যে যেতে যেতে ভাবল, অহলে ওরা বোধহয় অন্য প্ল্যান করেছে। সবার চোখের সামনে একসঙ্গে না বেরিয়ে সকলের চোখের আড়ালে একসঙ্গে হবে। আজকালকার কবিরা তো হাওয়া খেয়ে বাঁচে না। কবিরাও না, প্রেমিকরাও না। তাই অসীম বোধহয় ধীরে-সুস্থে খেয়ে-দেয়ে বেরোবে। কিন্তু কৌশলে মার হাত এড়িয়ে অসীম তো আজ হোটেলেও খেতে পারত। সেখানে পর্দা-ঢাকা ঘরে বসে একজন খেত আর একজন খাওয়াত। নাকি শেষে দু'জনেই খেত। তেমন

খাওয়া কি ওরা এর আগেও খায়নি। স্পষ্ট করে না বললেও আভাসে-ইঙ্গিতে মানসী যা বলেছে, শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে যেসব গল্প করেছে, মাধুরী কি তা শুনে কিছু বুঝতে পারেনি? মাধুরী শুধু শুনেছে আর পড়েছে আর কল্পনা করেছে। মানসী যে গল্পের নায়িকা মাধুরী তার পাঠিকা, তার শ্রোত্রী। শুধু মানসীর নয়, আরো অনেক বন্ধুর জীবন-কাহিনী মাধুরী শুনেছে, আধা কল্পনায়, আধা বাস্তবে গড়া দেশী-বিদেশী অনেক মেয়ের কথা সে পড়েছে। ঐসব যে কী মাধুরী জানে। আর সেই জানাই যথেষ্ট। সেই জানার ভিতর দিয়ে শোনার ভিতর দিয়ে পড়ার ভিতর দিয়ে হওয়া আর পাওয়াই যথেষ্ট। মাধুরী আর কিছু চায় না।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাধুরী চুল বাঁধতে লাগল। অসীম ততক্ষণে নেয়ে নিক। মঞ্জু আর মিনু স্কুল থেকে ফিরে এসেই রান্নাঘরের সামনে খেতে বসেছে। মাছ নিয়ে ওদের কোঁদল শোনা যাচ্ছে। এই অসময়ে না নেয়ে খাওয়া ওদের অভ্যাস। এখন খেয়ে দুপুরে আর ভালো করে খেতে পারে না। দুপুরের পর থেকে আবার খাই-খাই শুরু হয়। নন্দু কোথায় আড্ডা দিতে বেরিয়েছে তার ঠিক কি। বড় আড্ডাবাজ হয়েছে ছেলেটা। বাড়িতে তার আর মন টেঁকে না। শুধু খাওয়া আর শোওয়ার সময় ছাড়া সে বাইরে বাইরেই থাকে। পরীক্ষার আগে যে মাস দুই গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল তার শোধ নিচ্ছে। বাবাও বাড়িতে নেই। নেই যে, বাড়িটা নিঃশব্দ হওয়ায় তা বোঝা যাচ্ছে। হয়তো ঝগড়াঝাটির পর এবার বেরিয়ে পড়েছেন। কোথায় আর যাবেন। বসেছেন গিয়ে মোড়ের ওই বাজে চায়ের দোকানটায়। সবচেয়ে পিছনের বেঞ্চে কোণা-ভাঙা একটা কাপ সামনে নিয়ে হয়তো রাস্তার জনস্রোতের দিকে চুপ করে চেয়ে বসে আছেন। এমনভাবে বসে থাকতে বাবাকে আরো অনেকদিন দেখেছে মাধুরী। সাময়িক সন্ন্যাস। তবু বাবার ওই ঝুলে-পড়া গোঁফ আর উদাস চোখের দৃষ্টি দেখলে বড় মায়া হয় মাধুরীর। সেই মুহূর্তে মনে হয়, বাবার কোন দোষ নেই। এই বয়সে ওঁর শুধু স্নেহ ভালোবাসা আর সহানুভূতিই প্রাপ্য। শিশুর মত শুধু আদর আর আহ্লাদ দিয়ে ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কোন আঘাত ওঁর সইবে না। কিন্তু সবরকম দুঃখ আর আঘাতের হাত থেকে কেউ কি কাউকে বাঁচাতে পারে? ঘুরপাক খাওয়ার জন্যে মানুষ নিজের আবর্ত নিজেই সৃষ্টি করে। বাবাও তাই করেছেন। উনি তো পারলেন না—দাদার ওপর সংসারের সব ভার ছেড়ে দিতে পারলেন না। অথচ এই বাবাই একদিন বলেছিলেন, 'পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলে বনে যাও তো ভালো, নইলে এই সংসারই অরণ্য হয়ে ওঠে।'

বাবা বোঝেন সব, জানেন সব, কিন্তু কাজের বেলায় যেন অন্য মানুষ হয়ে ওঠেন।

চুল বাঁধতে-বাঁধতে মাধুরী আয়নার দিকে তাকাল। মুখের প্রতিবিম্ব আয়নায় পড়ে, চিন্তার প্রতিবিম্ব পড়ে মুখে। কোন কোন সময় আয়নায় নিজের মুখ দেখতে বড় লজ্জা হয়, ভয় হয়। অথচ কিসের এক দুর্বার আকর্ষণে সে মুখের দিকে না তাকিয়েও পারা যায় না। এখন পারিবারিক চিন্তার আশ্রয়ে সে আবার নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে। এখানে শান্তি, এখানে স্বস্তি। যেখানে দশজনে মিলে আছে সেখানে কোন ভয় নেই। মাধুরী মানসীর দিদি, তার বন্ধু, তার হিতৈষিণী। এছাড়া তার আর কোন পরিচয় নেই। সমাজ আর পরিবার মানুষের ল্যাটিচুড লঙ্গিচুড। তাছাড়া মানচিত্রে তার স্থান নির্ণয় সম্ভব নয়।

'মাধুরী, তোর হোলো?'

'হ্যাঁ মা, হয়েছে।'

চুল আঁচড়ে সদ্য ইস্ত্রি-ভাঙা জামা-কাপড় পরে অসীমদা তৈরী হয়ে এসেছে। খুব প্রসন্ন, প্রফুল্ল দেখাচ্ছে ওকে। মুখ দেখে কিন্তু মনে হয় না মানসীর সঙ্গে ওর কোন মনোমালিন্য হয়েছে। এ মালিন্য বোধহয় মাধুরীর নিজেরই মনের।

দেখ কাণ্ড। মায়া ওদের দু'জনের আসন পাশাপাশি পেতেছে।

মাধুরী বলল, 'একি মায়া। এভাবে জায়গা করেছিস যে।'

মায়া বলল, 'তাতে কি হয়েছে দিদি। আর তো কেউ এখন খাবে না। তাই অল্প জায়গার মধ্যে—।'

মঞ্জু সামনেই ছিল। সে হেসে বলল, 'কেন মেজদি, মুখোমুখি দিলে তো তোমাদের আরো লজ্জা করত। তোমারও পেট ভরত না, অসীমদারও পেট ভরত না।'

অসীম স্মিতমুখে খেয়ে যেতে লাগল।

মাধুরী বলল, 'দেখেছ মা, মঞ্জুটা কি ফাজিল হয়ে গেছে, দেখেছ? ওর এবার একটা বিয়ে-টিয়ে দিয়ে দাও।'

সুহাসিনী বললেন, 'হ্যাঁ, তাই দিতে হবে। বড়দের যখন কিছু হয়ে উঠছে না, ছোটদের দিয়েই শুরু করতে হবে।'

মঞ্জু বলল, 'তাহলেও তো মা মিনুর চান্স আগে।'

সুহাসিনী ওকে তাড়া দিয়ে বললেন, 'গেলি এখান থেকে মুখপুড়ী; লঘু-গুরু জ্ঞান নেই, সবাইর সঙ্গেই যেন ইয়ার্কির সম্বন্ধ।'

খেতে দিতে দিতে সুহাসিনী আবার শঙ্করের কথা তুললেন, 'জানো অসীম, আমার নাতির জন্মদিন। আমার চেয়ে আজ কার বেশি আনন্দ! কিন্তু সেই আনন্দ আমাকে কেউ করতে দিল না। নবাব-নন্দিনী তো একবার এদিকে আসতেই পারলেন না। আমার মেয়েরা তার বাড়িতে কেন যাবে?'

অসীম একটু হেসে বলল, 'আপনাদের তো সামাজিক সম্পর্ক নয় মাসীমা। ছেলের সঙ্গে বাপ-মায়ের সম্বন্ধ। আপনারাই তো বলেন রক্তের সম্বন্ধের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।'

সুহাসিনী বললেন, 'আমি আর এখন তা বলিনে। রক্ত যদি একবার পচে যায় বাবা, তখন আর কিছু বাকি থাকে না। আমার রক্ত পচে গেছে। আমার আপন চেয়ে পর ভালো।'

অসীম বলল, 'আমার তো মনে হয়, আপন যাতে পর হয়ে না যায় সে চেষ্টা সব সময় রাখতে হয়। কখনো তা ছাড়তে নেই।'

মাধুরী হঠাৎ বলে উঠল, 'ঠিক বলেছ অসীমদা, আমিও সেই কথাই ওঁদের বলি। তোমার সঙ্গে আমার অবিকল মিল আছে।'

অসীম তার দিকে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে দেখে মাধুরী একটু লজ্জিত হল। মুখ নিচু করে বাটি থেকে মাছের ঝোল ঢেলে নিয়ে আরো খানিকটা ভাত মাখতে মাখতে বলল, 'মানে তোমার মতের সঙ্গে, তোমার চিন্তার সঙ্গে।''

অসীম অস্ফুট স্বরে বলল, 'সেই মিলই তো বড় মিল মাধুরী।'

ছি ছি ছি। অসীমদার যেন কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। সবারই সামনে অমন নিচু গলায় কথা বলে? যে কথা সবাই শুনতে পাবে তা জোর গলায় বলা ভালো। উঁচু পর্দার স্বরে কোন সংকোচ নেই।

তবু অসীমের এই যে একান্তে বলা, চিন্তার মিলকে বড় মিল বলে স্বীকার করা তা' ভারি ভালো লাগল মাধুরীর। কিন্তু মনের মিল মানে কি শুধু চিন্তার মিল? মতের মিল? মাধুরী মাছের কাঁটা বাছতে গিয়ে আঙুলে খোঁচা খেল।

অসীম বলে চলেছে, 'রক্তের সম্বন্ধই হোক আর অন্য যে-কোন সম্বন্ধই হোক, তা' সিন্দুকে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা চলে না। এ তো ব্যাঙ্কের টাকা নয় যে আপনা-আপনি সুদে বাড়বে। আমরা যদি সচেতন না হই, তাকে সযত্নে রক্ষা না করি, রোজ ব্যবহার না করি, তাহলে সেই সম্পর্কে মরচে পড়ে যায়। কর্পূরের মত উবে কখন যে শেষ হয়ে যায় আমরা টেরও পাইনে।'

মাধুরী চমকে উঠল। এ কোন্ সম্পর্কের কথা বলছে অসীমদা? শুধু কি দাদার সঙ্গে বাবা-মার সম্পর্কের কথা না আরো কোন সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে এর মধ্যে?

অসীম না না করলেও সুহাসিনী আরো এক হাতা গরম ভাত তার পাতে ঢেলে দিলেন। সুহাসিনী তারপর একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু অসীম, ওসব কথা তোমাদের বইয়েই মানায়। সংসারের মানুষ কি দিনরাত অমন হিসেব করে চলতে পারে? এ কি আমার জমা-খরচের খাতা? সে খাতাতেও সব খরচ সমানে লিখে রাখতে পারিনে—উনি যতই রাগ করুন। না না,

ফেলে রাখলে চলবে না অসীম, ভাত দু'টি মেখে নাও।—ও মায়া, আর একটু ঝোল এনে দেতো তোর অসীমদাকে।—কুটুম্বিতার বেলায় ও-কথা চলতে পারে অসীম। সেখানে পোশাকী সম্পর্ক। তারাও তত্ত্ব পাঠাল আমরাও তত্ত্ব পাঠালাম, তারাও নিমন্ত্রণ করল আমরাও নিমন্ত্রণ করলাম—।'

মঞ্জু বলল, 'বউদির বাপের বাড়ি থেকে কিন্তু আমাদের নিমন্ত্রণ করেনি মা। তার এক খুড়তুতো ভাইয়ের বিয়ে হল—।'

সুহাসিনী ধমক দিয়ে বললেন, 'থাম তো। তোর সব কথার মধ্যে আসতে হবে না।—কুটুম্বিতার বেলায় ওসব মানায়। মনের মধ্যে যাই থাকুক তারাও হেসে কথা বলল, আমরাও মিষ্টি করে হেসে কথা বললাম, বাস, ফুরিয়ে গেল। তাও নতুন কুটুম্বিতার বেলায়। চেনা-জানা হয়ে যাওয়ার পর কুটুম্বিতা ওভাবে রাখা যায় না। কিন্তু আপনজনের বেলায় মানুষ কি অমন হিসেব করে চলতে পারে? মেপে মেপে কথা বলতে পারে? ভেবে দেখ অসীম আমার এতগুলি ছেলেমেয়ের প্রত্যেকের সঙ্গে যদি অমন করে সম্পর্ক বজায় রাখতে হত তাহলে আমি কি আর সংসারের কোন কাজ করতে পারতাম?'

খেতে খেতে মাধুরী অবাক হয়ে মার মুখের দিকে তাকাল। দরকার হলে মাও যে বেশ গুছিয়ে মনের কথা বলতে পারেন তা' যেন সে লক্ষ্য করেনি মাধুরী, মানসী লাইব্রেরী থেকে যত বাংলা বই আনে, কি দু'চারখানা করে যা কেনে, মা সব পড়ে শেষ করে ফেলেন। সেই বই-পড়া বিদ্যা নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে মা কথা বলেন। তাই অত ভালো লাগে। বাবার কথা পুঁথিপত্রের কোটেশন আর তার ব্যাখ্যায় ভরা, মার কথায় রান্নাবান্না ঘর-সংসারের গন্ধ। সে গন্ধ তাঁর গায়ে কাপড়ে, সে রঙ তাঁর হাতের হলুদে ভাষার নামও মাতৃভাষা। মুখে স্তন দেওয়ার মত প্রথম কথাও মা-ই গুঁজে দিয়েছেন। দুই-ই অমৃত। শুধু যে মহাভারতের কথাই অমৃতসমান তাই নয়, মানুষের অন্তরের কথা মাত্রেই অমৃত। ফের রমা বউদির কথা মনে পড়ল মাধুরীর। কী যে সব বিশ্রী বিশ্রী কথাই বলে রমা বউদি। তার মুখের কোন আগল নেই। অমৃত নাকি শুধু কথার মধ্যেই নেই, যে নির্বাক দু'টি ঠোঁট কথা বলে না, কথা বলবার ফুরসত পায় না, তাও নাকি মধুতে মাখামাখি অমৃত নাকি শুধু মায়ের বুকেই নেই, অমৃতের কাঙাল নাকি শুধু শিশুরাই নয়—।

'মাধুরী, তোকে আর দু'টি ভাত দিই?'

'না না মা, দিও না, দিও না।'

অসীমদা সমানে উপদেশ দিয়ে চলেছে, 'ছোট ছেলেমেয়েদের যেমন ভালোবাসেন, তাদের উৎপাত উপদ্রব সহ্য করেন, বড়দের বেলায়ও যদি তাই করতে পারেন, তাহলে আমার মনে হয় অনেক সমস্যা মেটে। একথা যদি

মনে রাখেন আপনার ছেলে যত বড়ই হোক সে আপনার চেয়ে কিছুতেই বড় নয়—না বয়সে, না অভিজ্ঞতায়, না ঔদার্যে, না ভালোবাসায়। সেই দৃষ্টিতে যদি দেখতে পারেন তাহলে তার চরম নিষ্ঠুরতায়ও আপনি বেশি দুঃখ পাবেন না। তার হাতের মর্মান্তিক আঘাতকেও আপনি শিশুর হাতের মার বলে ভাবতে পারবেন।'

সুহাসিনী বললেন, 'তাই কি আর হয় অসীম? ওসব তোমাদের কল্পনাতেই সাজে। ছেলে যতদিন পেটে থাকে ততদিন তার কাছে কোন প্রত্যাশাই থাকে না। তারপর সে কোলে আসে, কোল থেকে মাটিতে নামে, আস্তে আস্তে বড় হয়, তার ওপর আশা-ভরসাও বাড়তে থাকে। সেই আশা যদি না মেটে, আকাঙ্ক্ষা যদি পূরণ না হয়, সে যে কি দুঃখ তুমি তা বুঝবে না বাবা।'

অসীম বলল, 'বোঝা কঠিন নয় মাসীমা—কিন্তু।'

সুহাসিনী বলতে লাগলেন, 'আচ্ছা অসীম, তার ওপরই আমার যত কর্তব্য আছে, আমার ওপর তার কোন কর্তব্য নেই? তুমি সম্পর্ক রাখা না রাখার কথা বলছিলে অসীম, সম্পর্ক রাখব বললেই রাখা যায় না। মানুষ যদি যে যার কর্তব্য করে তাহলে সম্পর্ক আপনিই থেকে যায়। মানুষ যদি ভালোমানুষ হয় তাহলে চারদিকের মানুষ তার সঙ্গে আঁঠার মত লেগে থাকে। সে আঁঠা কিছুতেই ধুয়ে-মুছে যায় না।'

অসীমের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে উঠতে উঠতে বলল, 'আজকাল ভালোমানুষ হওয়া বড় শক্ত ব্যাপার মাসীমা। আগে ভালো কথাটার মানে ছিল সহজ, সরল, বোকা-বোকা। এখন সেই ভালত্ব আমাদের শ্রদ্ধাও পায় না প্রীতিও পায় না। এখন ভালোমানুষ মানে একই সঙ্গে সোজা মানুষ আর শক্ত মানুষ। একই সঙ্গে বুদ্ধিমান, সামর্থ্যবান আর হৃদয়বান মানুষ। সে মানুষ আপনি ঘরে ঘরে পাবেন না, জনে জনেও নয়। কারো কারো মধ্যে কোন কোন ক্ষণে পেতে পারেন। কেউ আজকাল আর নিখাদ ভালো নেই। রাশ রাশ ছাইয়ের মধ্যে আগুনের ফুলকির মত তার ভালত্ব শুধু কোন কোন নিমেষে জ্বলে ওঠার জন্যে।'

মাধুরীরও অনেকক্ষণ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লেট হবার ভয় থাকা সত্ত্বেও উঠি-উঠি করেও উঠতে পারছিল না। খালি থালার ওপর আঙুলের ডগা দিয়ে দাগ কেটে যাচ্ছিল। সে রেখা কখনো সরল কখনো কুটিল। মানুষের দুর্বোধ্য কর-কোষ্ঠীর মত। মাধুরী বিস্মিত হয়ে ভাবছিল, অসীমদা এসব কথা কি শুধু মাকে শোনাচ্ছে, না আর কাউকেই? না শুধু তাকেই? এই বাগবিভূতি বাগবৈভব দিয়ে অসীমদা কা'কে কা'কে আবৃত করতে চাইছে? আর কা'কে? ওর গলার স্বর তেমন সুরেলা নয়, উত্থান-

পতনের বৈচিত্র্য কম, উচ্চারণ নিখুঁত নয়। কিন্তু কথা যখন বলে, ওসব দোষের কথা মনে থাকে না। ওর সব কথাই যেন উপলব্ধি আর অনুভূতির রসে জড়ানো। তাই ওর কথার বিশেষ একটা রূপ আছে। বাক্যের রূপ। মানুষ যখন কায়মনোবাক্যে এক, তখন তিনে মিলে একরকমের রূপ। আবার শুধু বাক্যেরও যেন আলাদা চেহারা আছে। তা কি শুধু ধ্বনি না কি আরো কিছুর প্রতিধ্বনি ?

দশটা বেজে দশ। মাধুরী তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে একটু পাউডারের পাফ বুলিয়ে কুমকুমের ফোঁটা দিয়ে আটপৌরে শাড়িটা পাল্টে পরতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নিল না।

মঞ্জু বলল, 'মেজদি, তোমাদের স্কুলে কি আজ আবার থিয়েটার-টিয়েটার আছে ?'

মাধুরী বলল, 'যা ফাজিল কোথাকার। স্কুলে আবার থিয়েটার হয় নাকি ?'

'আহা, সেবার তো হয়েছিল। তুমি পার্ট করেছিলে। চমৎকার করেছিলে কিন্তু।'

'যা, তোর আর পাকামো করতে হবে না।'

সুহাসিনী এলেন পিছনে পিছনে, 'মাধুরী শোন।'

'কি বলছ মা।'

মাও যেন মঞ্জুর মত হয়েছে।

'তোকে দিব্যি মানিয়েছে কিন্তু। এই কলাপাতা রঙের শাড়িখানা সেই পরা আজ তো পরলি বাপু। কাল যদি পরতি—'

মাধুরী লজ্জিত হয়ে বলল, 'তা হলেই একেবারে—। কী যে তুমি বল মা।'

সুহাসিনী আরো কাছে এগিয়ে এসে চারদিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'যাবি নাকি ওদের ওখানে ?'

মাধুরী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বাবার কথা তো শুনলে ?'

'তাঁর কথা তো জীবনভরই শুনে এলাম। যদি যাস, দুইবোনে মিলে দেখে আসিস। শ্যামবাজার থেকে ভালো একটা খেলনা-টেলনা কি রঙিন দেখে একটা জামা কিনে নিয়ে যাস যেন। টাকা আছে সঙ্গে? না দেব ?'

মাধুরী বলল, 'আছে মা।'

দ্রুত পায়ে দোরের দিকে এগিয়ে গেল মাধুরী। অসীম মিনিট কয়েক আগেই বেরিয়েছে। তার নাকি আজ বিষম তাড়া। মাধুরী নিজের মনেই একটু হাসল। তাড়া যে কিসের তা যেন তার কিছু বুঝতে বাকি আছে! কিন্তু এতক্ষণই যখন কাটল, দু' মিনিট দেরি করলে কি ক্ষতি ছিল!

ঘর থেকে নামলেই ডানদিকে একটা খোলা গ্যারেজ। বিকল বিগড়ে-যাওয়া বাসগুলি এখানে এসে দাঁড়ায়। তাদের ধোয়া-মোছা মেরামত চলে। এখন বাস একটাও নেই, কিন্তু জায়গাটা জল-কাদায় একাকার হয়ে আছে। শহরতলীর এই অঞ্চলটা ভারি নোংরা। সামনে বস্তি, পিছনে বস্তি, পান-বিড়ি, সোডা-লেমনেডের দোকান। ফুটপাতের ওপর শাক-সব্জী, আনাজ-তরকারির বেসাতি বসেছে।

কিন্তু আরো দু'পা এগোতেই সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন দৃশ্য চোখে পড়ল মাধুরীর। রোদে-বৃষ্টিতে মাথা বাঁচাবার জন্যে ওপারে যে শেডটা রয়েছে তার ঠিক সামনেই অসীম দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যই বটে, অসীম একাই এক দৃশ্য। আশেপাশে কি পিছনে যারা আছে তাদের মধ্যে ওর দিকেই আগে চোখ পড়ে। সে চোখ সরে আসতে চায় না।

চোখে চোখ পড়তে অসীম হাসল।

রাস্তা পার হয়ে মাধুরী ওর পাশে এসে দাঁড়াল, মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি যাওনি!'

অসীম বলল, 'গেলাম আর কই। বাসটায় বড় ভিড় ছিল। আমাকে ফেলে রেখে চলে গেল। এখন দেখছি তাতে লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি।'

'আহা, লাভ আবার কিসের।'

অসীম একথার কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল।

মাধুরী এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ এই অঞ্চলটার চেহারা যেন বদলে গেছে। নাকি দৃশ্যপট ঠিকই আছে, বদল হয়েছে দৃষ্টির। সেই দৃষ্টিই যেন তুলি হয়ে নতুন রং বুলিয়ে চলেছে। গ্যারেজ, বস্তির বাড়িগুলি, তুচ্ছ অপরিচ্ছন্ন দোকান-পাটেও যেন স্বপ্নের ছোঁয়া লেগেছে। ওই যে একটা দোকানে বালতি আর নারকেলের দড়িগুলি জড়ো হয়ে রয়েছে তারও যেন শোভার শেষ নেই। মোড়ের রোদে-পোড়া পাতামোড়া নাম-না-জানা গাছটাও যেন নতুন রূপ, নতুন অস্তিত্ব নিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

শ্যামবাজারগামী আর একটা বাস এসে স্টপে দাঁড়াল। যাত্রীরা নামতে-না-নামতেই বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা উদগ্র আগ্রহে এগিয়ে গেল।

অসীম মাধুরীর দিকে চেয়ে বলল, 'চল।'

মাধুরী বলল, 'ওমা আমি এ বাসে কোথায় যাব। ও বাসে উঠলে আমি আমবাটায় গিয়ে পৌঁছব। সে পৌঁছনোটা পৌঁছনোই নয়।'

অসীম বলল, 'নাই-বা পৌঁছোলে। একদিন না হয় পথে-পথেই রইলে।'

মাধুরী একথার জবাব না দিয়ে বলল, 'গেল তো বাসটা চলে! তুমি

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবিত্ব কর। আমি যাই। কাল মিছিমিছি স্কুলটা কামাই হয়ে গেল, আজ হাজির না হলে চলবে না। দু'জন টিচার ছুটিতে আছে।

অসীম বলল, 'আচ্ছা চল, আমিই তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি। আমার তো আর লেট হবার ভয় নেই। হাজিরা দেবারও গরজ নেই।'

মাধুরী হাসল, 'একেবারেই নেই? কোথাও নেই?'

বাঁ দিকের ফুটপাত দিয়ে এগিয়ে মোড় ঘুরে কয়েক পা যেতেই আর একটি বাস-স্টপ। এই বিরামস্থলে আপাতত আর কোন অপেক্ষমান যাত্রী নেই। শুধু অসীমই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মাধুরী কথা না বলে তার দিকে না তাকিয়ে তার অস্তিত্বকে অনুভব করতে লাগল।

রাস্তার ওপারের দক্ষিণ দিকে সারি সারি দোকান। তার পিছনে বেলগাছিয়ার বিস্তীর্ণ বস্তি অঞ্চল। মাধুরী অন্য দিন এসব দিকে তাকায় না। বাসটা কখন আসবে শুধু সেই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। কিন্তু আজ চারদিকের আশেপাশের জগৎ যেন হঠাৎ অস্তিত্বময় হয়ে উঠেছে। লোক-জন যানবাহন খুঁটিনাটি যেন এক নতুন অর্থগৌরব বহন করে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওই যে মাংসের দোকানটিতে চামড়া ছাড়ানো একটি পাঁঠাকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, আর খোলা গায়ে লুঙ্গিপরা একটি লোক সেই জন্তুটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারালো ছুরিতে কেটে কেটে খদ্দেরদের কাছে বিক্রি করছে এই দৃশ্যও চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার মত নয়, চোখ মেলে দেখবার মত। জন্তুটি মসৃণ ওই ত্বকের রং এই মুহূর্তে দেখতে অদ্ভুত লাগছে মাধুরীর। অঙ্গহীন শ্রীহীন ওই জন্তুটি সেই রঙে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত কুশ্রীতা নিষ্ঠুরতা দৃশ্যটি থেকে ঝরে পড়ে গেছে। কিংবা এ যেন আসল দৃশ্য নয় আসল পৃথিবী নয়, শিল্পীর হাতের আঁকা এক ছবির পৃথিবী। পরম নিষ্ঠুরতার ছবিও শিল্পী পরম মমতায় এঁকে চলেছেন। পরম বিরূপতাকেও শিল্পী রঙে আর রূপে উদ্ভাসিত করে তুলছেন। যাতে কোন শ্রী নেই, যা স্থূল তাতেও লাগিয়েছেন অনুরাগের রঙ।

দেখতে দেখতে আর একটা বাস এসে পড়ল।' নাইনটিওয়ান বেশ ভালো নম্বর। বাসের গায়ে নতুন করে সবুজ রঙ লাগানো হয়েছে। সবুজ রঙটাই বেশ সবচেয়ে মানানসই।

মাধুরী অসীমের দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তাহলে যাই এবার বেশ দেরি হয়ে গেল। বেলাদি বকে আর রাখবেন না।'

ফুটবোর্ড থেকে ভিতরে যেতে-না-যেতেই মনে হল পিছন থেকে কে যেন হুড়মুড় করে উঠে পড়েছে। একটু বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরাতেই সে বিরাগ মাধুরীর বিস্ময়ে আর আনন্দে ঢেকে গেল।

'তুমি!'

অসীম বলল, 'এগিয়ে চল। একেবারে সামনের বেঞ্চটা খালি আছে।'

পিছন থেকে একজন যাত্রী মন্তব্য করল, 'মশাই দেখে শুনে উঠতে হয়। মেয়েছেলের গায়ের ওপর! ছি ছি ছি।'

তার পাশের লোকটি হেসে বলল, 'আরে বুঝতে পারছেন না! নিজের মেয়েছেলে।'

'হলোই-বা নিজের মেয়েছেলে। তাই বলে পথ-ঘাট বিচার নেই!'

মন্তব্যগুলি শুনি না শুনি না করে মাধুরী সামনের দিকে এগিয়ে গেল। বাঁ দিকের সীটটি খালি রয়েছে। মাধুরী জানলার ধার ঘেঁষে বসল। অসীম যাতে আসনের আধখানারও বেশি জায়গা পায় আর খানিকটা ফাঁক রেখে বসতে পারে। অসীম পাশে এসে বসল।

মাধুরী মৃদুস্বরে বলল, 'এসব বাসে ওঠা যায় না। এমন বিশ্রী সব—।'

অসীম কৈফিয়তের সুরে বলল, 'উঠব কি উঠব না মনস্থির করতে একটু সময় নিল। আর একটু হলে বাসটা মিস করতাম, তাই তাড়াতাড়ি—।'

মাধুরী কোন জবাব দিল না। তার বুঝতে বাকি নেই অসীম সব মিথ্যে কথা বলছে। সব এখন বানিয়ে বানিয়ে বলছে সে। ওর কয়েক মিনিট আগে বেরিয়ে আসা, বাস-স্টপে দেরি করা, মাধুরীকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে পিছনে পিছনে আসা, শেষ পর্যন্ত এই বাসে উঠে পাশে এসে আসন নেওয়া, কোনটাই আকস্মিক নয়, সবই অসীম আগে থেকে ভেবে রেখেছে। এখনকার অনেক কথাই ওর বানানো। কিন্তু একটি কথা সত্য। মাধুরীর সান্নিধ্য, সাহচর্য যে অসীম কামনা করছে তার মধ্যে কোন অসত্য কিছু নেই। কিন্তু কেন? তাতে অসীমের লাভ কি?

অসীম বলল, 'আমার সহযাত্রীরা যেভাবে সমালোচনা শুরু করেছিল তাতে আশঙ্কা হয়েছিল ওদের হাতে প্রাণটাই বুঝি যায়। কিন্তু যেত না। তুমি বাঁচিয়ে দিতে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আমি কী করে তোমাকে বাঁচাতাম?'

অসীম বলল, 'ওদের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে, শোন ভাইসব, বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।'

মাধুরী স্তব্ধ হয়ে রইল। যদিও কথাটা তামাশা ছাড়া কিছু নয়, আর এধরনের ঠাট্টা-তামাশা করবার অধিকার অসীমের আছেও, তবু মুহূর্তের জন্যে মাধুরীর যেন রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে গেল। তারা অবশ্য খুবই আস্তে আস্তে কথা বলছে। তবু যদি কারো কানে যায়, কী ভাববে। তা ছাড়া অসীম তো কোনদিন এমন উচ্ছলতার পরিচয় দেয়নি। আজ তার কী হল। এমন মত্ততা তার এলো কিসে।

তার এই ব্যবহার, এই চাঞ্চল্য, চাপল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া মাধুরীর মোটেই

উচিত নয়। ধমকে না দিক একটু নিস্পৃহ থেকে তার আপত্তিটা ওকে বুঝতে দেওয়া উচিত। কিন্তু ওকে আঘাত না দিয়ে অসন্তুষ্ট না করে কিভাবে যে তা বলা যায় মাধুরী খুঁজে পেল না।

ভোটারিনারী কলেজের পাশ দিয়ে বাসটা এগিয়ে চলল। পুকুর আর গাছপালায় ভরা কলেজটাকে মনে হয় যেন বাগান-বাড়ি। বেড়াবার রাস্তা আছে। বসে থাকবার মত সিঁড়ির অভাব নেই। কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে বইখাতা হাতে হাসতে হাসতে ভিতের গিয়ে ঢুকল। হঠাৎ মাধুরীর মনে হল সমস্ত ব্যাপারটাই অসীমের পরিহাস। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। পরিহাসকে আরো জোরালো পরিহাস দিয়েই উড়িয়ে দিতে হয়। না হলে তা আরো ভারি হয়ে মনের ওপর চেপে বসে। যার মূল নেই সেও ডালপালা ছড়িয়ে চারদিকে আঁধার করে রাখে।

কণ্ডাক্টর এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

অসীম ব্যাগ থেকে একটা টাকা বের করে মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথাকার টিকিট কাটব।'

মাধুরী বলল, 'বীরনগর। কিন্তু তুমি করবে কেন, আমি নিচ্ছি।'

অসীম বলল, 'আমার কাছ থেকে তুমি তো কিছুই আর নেবে না। বাসের টিকিটখানা অন্তত নাও।'

কণ্ডাক্টর একবার হেঁকে উঠল—দত্তবাগান। বাসটা সেখানে দাঁড়াল।

অসীম বলল, 'দুটো স্টপ এগিয়ে দিলাম তোমাকে। এবার নেমে যাব নাকি?'

মাধুরী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'নেমেই যদি যাবে বেশি দামের টিকিট করলে কেন।'

অসীম হেসে বলল, 'তাহলে টিকিটটা নষ্ট করে লাভ নেই কি বল।'

মাধুরী ভাবল, পরিহাসের প্রতিযোগিতায় তার আর একবার হার হল। বললেই হত, 'হ্যাঁ নেমে যাও, তোমার জরুরী কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

তাহলেই কি অসীম নামত? নিশ্চয়ই নামত না। বেশ জব্দ হত। নামতে ও পারত না, উঠতেও পারত না। ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হবার সুযোগটা মাধুরী হেলায় হারাল।

স্টপ ছেড়ে বাসটা আবার চলতে শুরু করেছে। দোকান-পাট বাজার। এক ভদ্রলোক দোকান থেকে বরফ কিনে রঙীন রুমাল দিয়ে বেঁধে চলেছেন। রাস্তার টিউবওয়েল থেকে একটি মেয়ে কলসীতে জল ভরতে শুরু করেছে। চলন্ত বাসের জানলায় জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো ছবি। জোড়া যায় কি? জুড়লে কি কোন মানে দাঁড়ায়? সঙ্গতি আর সামঞ্জস্য থাকে? না থাকুক। দেখতে বড় ভালো লাগছে মাধুরীর। রোজই তো এসব দেখতে দেখতে যায়।

কিন্তু ঠিক যেন দেখার মত করে দেখা হয় না। চোখ থাকে কিন্তু দৃষ্টি থাকে না। তা ছাড়া প্রায়ই একখানা করে নভেল কি গল্পের বই নিয়ে আসে মাধুরী। বাসে যাতায়াতের পথে পড়ে। দুদিকের দোকান-পাট বাড়ি-ঘর গাছপালা চোখেই পড়ে না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, বইয়ের অক্ষরের চেয়ে নারকেল গাছগুলির সবুজ পাতার ঝিলিমিলি কম উপভোগ্য নয়। বাতাসের মৃদু আন্দোলনে পাতায় পাতায় যে জীবনলীলা নিত্য লিপিবদ্ধ হয়ে চলেছে মাঝে মাঝে তাও পড়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না।

'মাধুরী, তুমি কি রাগ করেছ?'

অসীমের কথা শুনে মাধুরী ফিরে তাকাল, 'বাঃ রে, রাগ করব কেন।'

অসীম বলল, 'তা নয় তো কি। এলাম কথা বলবার জন্যে, তুমি বাইরের দিকে চেয়ে আছ তো আছই। শেষ পর্যন্ত নারকেল গাছগুলিই কি আমার রাইভ্যাল হয়ে দাঁড়াল? নেমে গিয়ে ওদের সঙ্গে ডুয়েল লড়ে আসব নাকি?'

মাধুরী হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তাই যাও। আমার জন্যে ডুয়েল লড়তে হলে তোমাকে গাছের সঙ্গেই লড়তে হবে।'

অসীম বলল, 'শুনে বাঁচলাম। মনুষ্যলোকে আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।'

মাধুরী বলল, 'কিন্তু আমার বেলায় তো আর তা নয়। আমাকে নিশ্চয়ই—।'

বলতে বলতে মাধুরী থেমে গেল। ছি ছি ছি। কী অকথ্য কথাই না বলতে যাচ্ছিল। পরিহাসছলে ও কথা বলা চলে না। মনের কোণে আনা চলে না। মানসী তার নিজের বোন। শুধু বোন নয়—বোন, বন্ধু সব। মানসী তার দ্বিতীয় সত্তা। কিন্তু আশ্চর্য, মানসী এতক্ষণ কোথায় ছিল—বাসে নয়, ধারে-কাছে কোথাও নয়, এমনকি মনের দূরতম প্রদেশেও তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। যেমন এই বাস-ভরতি লোক থেকেও মাধুরীর কাছে তারা শুধু ছায়া হয়ে আছে। মানসীর সেই ছায়াময় অস্তিত্বও এতক্ষণ ছিল না। মাধুরীর একান্ত যে আপন সেও তার জগৎ থেকে, জীবন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছিল। ছি ছি ছি, কী করে এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হল! পরম লজ্জার মধ্যে, বেদনার মধ্যে মাধুরীর অনুভবে মানসী পুনর্জন্ম নিল। তার করুণ বিষণ্ণ মুখখানা মাধুরীর চোখের সামনে ভেসে উঠল। মানসীর দু'টি চোখে যেন ঈষৎ ঈর্ষা আর তিরস্কারের আভাস। না, মাধুরী দিদি হয়ে তাকে ঠকাতে পারবে না, কিছুতেই না।

একটু চুপ করে থেকে অসীম মাধুরীর কথার জের টেনে হেসে বলল, 'তা ঠিক। আমার জন্যে যাদের সঙ্গে তোমার প্রতিযোগিতায় নামতে হবে তারা সবাই লতা নয়। দেবী দানবী মানবী সংখ্যায় শ' খানেক হবে।'

মাধুরী হেসে বলতে গেল, 'তাদের মধ্যে আদিবাসিনীরাও দু' চারজন আছেন নিশ্চয়ই।' কিন্তু হাসি আর কথা দুই-ই অস্ফুট হয়ে রইল।

দু'টি রেল ব্রীজের তলা দিয়ে পাতিপুকুরের উঠে-যাওয়া রেল স্টেশন ছাড়িয়ে বাস এগিয়ে চলল। ড্রাইভার কি নতুন? বড় ঝাঁকুনি দিতে দিতে বাস চালাচ্ছে। এত ঝাঁকুনিতে পাশাপাশি বসে যেতে বড় অসুবিধে হয়। বারবার এমন মেশামেশি হলে কেমন যেন লজ্জা করে। অথচ বলাও যায় না 'একটু সরে বোসো।' তাতে আরো লজ্জা। কোথায়-বা সরে বসবে। অসীম যথেষ্ট ফাঁক রেখেই বসেছে। তবু যে বারবার—। তার জন্যে দোষ ড্রাইভারের।

মাধুরী বলল, 'তোমার বোধহয় দেরি হয়ে গেল।'

অসীম বলল, 'কিসের দেরি।'

'ও তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে না?'

অসীম বলল, 'ও মানে?'

মাধুরী হেসে বলল, 'আহা এখন একেবারে নামসুদ্ধ ভুলে গেলে। ও মানে বেলভেডিয়ারে যিনি চাকরি করতে গেছেন তিনি। শুধু ও নন, এ ঐ ও ঔ। একেবারে পুরো একটি স্বরবর্ণমালা।'

অসীম বলল, 'আর তুমি বুঝি ব্যঞ্জনবর্ণের রত্নহার?'

মাধুরী ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'বাজে কথা রাখো। সত্যি, তুমি কি মানসীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করোনি?'

অসীম বলল, 'না তো। তার সময় কোথায়। অফিসে আজ সে দারুণ ব্যস্ত। আমিও তাই। এলামই যখন, কর্তাদের সঙ্গে একটু দেখাসাক্ষাৎ করেই যাই। দেখি, লালদিঘির চারদিকেই সাতপাক দিই, না কি নেমেই সাঁতার কাটি।'

মাধুরী হেসে বলল, 'তোমার কেবল কথার বাহার। কথা দিয়ে যদি রাজ্য গড়া যেত তুমি তা পারতে। কিন্তু এদিকে কোথায় যাচ্ছ? এদিকে তো লালদিঘি নেই।'

অসীম মাধুরীর চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'লালদিঘি নাই-বা হল, একজোড়া কালো দিঘি তো দেখতে পাচ্ছি। শান্ত, স্বচ্ছ, অতল গভীর।'

মাধুরী চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। এসব কথার মানে কি? অসীমের এসব কথার মানে কি? তার কৌতুকের কি কোন সীমা নেই। সীমা নেই নিষ্ঠুরতার? তার চোখ তেমন বড় নয় সুন্দর নয়, তাই বলে অত ঠাট্টা। কিন্তু ওর কথার ভঙ্গিতে চোখের দৃষ্টিতে তো সবই পরিহাস বলে মনে হয় না। তবে এ কী!

একটু বাদে মাধুরী বলল, 'একজোড়া কেন, আমার সঙ্গে বীরনগরে চল,

তোমাকে চারটে দিঘি দেখাতে পারব। একটা ট্যাঙ্ক একেবারে আমাদের স্কুলের সামনে। ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েদের নিয়ে একটু ভয় হয়।—ভালো কথা, দাদার ছেলের জন্মদিনে যাবে তো? তোমাকেও তো নিমন্ত্রণ করেছে।'

অসীম বলল, 'হ্যাঁ, আমি একদিন আগেই নিমন্ত্রণ পেয়েছি। ছেলের বাবা-মা একসঙ্গে বলেছে। তাতে কোন ত্রুটি হয়নি। কিন্তু যেতে কি সময় পাব?'

মাধুরী বলল, 'কেন, সময় না পাওয়ার কি হয়েছে। রাত্রে তো আর চাকরির তদ্বির করবে না।'

অসীম বলল, 'তদ্বিরের দিনও নেই রাতও নেই। তা নয়। আরো তো বন্ধুবান্ধব আছে। তাদের কারো কারো খোঁজখবর নেওয়া উচিত। কেউ থাকে ভবানীপুরে, কেউ বালিগঞ্জে, কেউ বড়িষা। অত ঘোরাঘুরির পর কি বরানগরে ফের আসতে পারব?'

মাধুরী বলল, 'ও বাবা। তুমি যে এমন জগদ্বন্ধু তা তো জানা ছিল না। ঘোরাঘুরিটা আজ বাদ দাও। যেখানেই থাকো, সন্ধ্যার পর দাদার ওখানে আজ এসো। নইলে দাদা বড় দুঃখ পাবে।'

অসীম বলল, 'দেখা যাক কতদূর কি করে উঠতে পারি। তুমি যাবে তো?'

'ভাবছি। মাও তো যেতেই বললেন। কেউ না গেলে সেটা কেমন হবে বলো?'

অসীম বলল, 'ভালো হবে না। তাছাড়া আসায়-যাওয়ায় তোমাদের চেষ্টায় পিতা-পুত্রের মিলন একদিন হলেও হতে পারে। একেবারে যদি মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দাও তাহলে হৃদয়-দুয়ার চিরদিনের জন্যেই রুদ্ধ হয়ে যাবে।'

কথাটা মনে লাগল মাধুরীর। সেও ঠিক ওই ধারায় ভাবে। দাদাকে একেবারে হাতছাড়া করা বাবা-মার উচিত নয়। তাছাড়া দাদা তো সম্পর্ক ছাড়েনি। পঞ্চাশ হোক ষাট হোক, কোন কোন মাসে আরো বেশি—মাধুরীর হাতে সে পাঠিয়ে দেয়। মানসী রাগ করে। ওই ক'টা টাকায় কি হয়। মিছিমিছি কেন হাত নষ্ট করা। কিন্তু মাধুরীর যুক্তি অন্য রকম। টাকার পরিমাণটাই একমাত্র বিচার্য নয়। এই উপলক্ষে আদান-প্রদানের সম্পর্কটা থাকুক। আজ যে পঞ্চাশ দিচ্ছে কাল সে পাঁচশও দিতে পারে। কিন্তু নেব না বলে তাকে ফিরিয়ে দিলে দেওয়ার তাগিদ তারও ফুরিয়ে যেতে পারে।

মাধুরী বলল, 'আমি যাব। মানসীকেও সঙ্গে নিতে চেষ্টা করব। ও যদিও দাদার ওপর প্রসন্ন নয়। তবু এসব ব্যাপারে যাওয়াই ভালো। এক কাজ কর না। তুমিই বরং ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো।'

অসীম বলল, 'আমিই যেতে পারি কি না তার ঠিক নেই, তার ওপর আবার সঙ্গিনীর ভার। তার চেয়ে তোমার সহোদরার দায়িত্বটা তোমার ওপরই থাকুক।'

মাধুরী হেসে বলল, 'বেশ তো। যতদিন না হস্তান্তরিত হয়, আমার বোনের ভার আমার হাতেই রইল।'

'আমার বোন'—নিজের কানেই কথাটা একটু যেন নতুন লাগল। অসীমকে শোনাবার জন্যেই কি বলেছে? যদি বলে থাকে তাতেই বা দোষ কি। অসীমের শুনে রাখা ভালো। তাহলে সে নিজেও সাবধান হতে পারবে। বেশি বাড়াবাড়ি করতে সাহস পাবে না। অবশ্য সবই ওর হাসি-ঠাট্টা। কিন্তু ঠাট্টারও বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়। ঠাট্টা ছাড়া কি! মাধুরী তো পাগল নয়, সরলা ষোড়শীও নয় যে পুরুষের ফ্লার্টিংকে সে এক সত্য সম্পর্কের মর্যাদা দেবে।

'আমার বোন' কথাটা মনে মনে আবৃত্তি করে মাধুরী বড় নিশ্চিন্ত হল। আশ্বস্ত হল। যেন এর চেয়ে বড় রক্ষাকবচ আর নেই। মাধুরী নিজের বোনের কাছে কোন অপরাধ করতে পারে না। তার ওপর কোন অন্যায় করতে পারে না। তাকে আঘাত দিতে পারে না। না, মনে মনে গোপনে গোপনেও নয়। গোপন আসক্তি, গোপন বাসনা তো চিরকাল লুকিয়ে রাখা যায় না। তা ধরা পড়বেই। তখন আর দুঃখ লজ্জা কেলেঙ্কারীর সীমা থাকবে না।

কিন্তু নিজের চিন্তাধারার তীরে তীরে হেঁটে মাধুরীর এক সময় নিজেরই হাসি পেল। এত আত্মশাসন অনুশাসনেরই বা কি হয়েছে। কী এমন দোষ করেছে সে? মাধুরী তো আর অসীমকে আসতে বলেনি। সে নিজেই এসেছে। এসে ঠাট্টা-তামাশা করছে। মানসীর হয়তো সেই মেজাজ নেই। মাধুরীকেই তামাশার সঙ্গিনী করেছে। তা নিয়ে অত আতঙ্ক অত আশঙ্কা কেন মাধুরীর? তার এই সংকোচ এই ভয় যদি অসীম টের পেয়ে থাকে সে নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছে। আর হাসছে বলে বাড়াবাড়িও করছে। আচ্ছা, সুযোগ আসুক। ভয় দেখিয়ে ঘাবড়ে দিতে মাধুরীও কম জানে না। তখন দেখা যাবে কতখানি সাহস রাখে দারোগা সাহেব। মুরদ কতখানি।

বাগজলার পর আরো দুটো স্টপ। তৃতীয় বিরতি বীরনগরে।

কণ্ডাক্টর উঁচুগলায় নাম ঘোষণা করল।

মাধুরী তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। অসীমও নেমে এসে পাশে দাঁড়াল।

মাধুরী বলল, 'নামলে যে। মিটে গেল বেড়াবার শখ?'

অসীম বলল, 'মিটবে কেন? তুমি কি আমাকে একা একা নিরুদ্দেশ-যাত্রায় পাঠাতে চাইছিলে?'

এই সুযোগ।

মাধুরী মিষ্টি হেসে বলল, 'তুমি কি একা একা এসেছ যে, তোমাকে একা একা পাঠাতাম? মুখ ফুটে তো বলতে পারলে না, মাধুরী, আজ তোমার স্কুল থাক। চল, বাস যত দূরে যায় আমরাও তত দূরে যাই। বলতে তো পারলে না, চল, চোখ যত দূরে যায় আমরাও তত দূরে যাই।'

কি রকম চকচক করছে অসীমের চোখ। লাগবে আর মাধুরীর সঙ্গে? সারাটা পথ ছিল অসীমের দখলে। মুহূর্তে মাধুরী জগৎ কিনে নিয়েছে। এবার পথে বসুক অসীম। মাধুরী ততক্ষণে নিজের স্কুলে পেঁাছে যাবে।

কিন্তু দেখা গেল অসীম অত সহজে ঘাবড়াবার পাত্র নয়। সে মাধুরীর চোখে দু'টি উজ্জ্বল চোখ রেখে বলল, 'আমি যা বলতাম, তুমি তাই বললে। তাহলে চল এবার যাওয়া যাক। একটা বাস চলে গেলেও আরো অনেক বাস আসছে। চল তার যে-কোন একটায় উঠে পড়ি।'

মাধুরী হেসে বলল, 'ক্ষেপেছ! বেলাদি তাহলে রক্ষে রাখবেন না।'

অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখ কি সুন্দর মেঘ করেছে। এতক্ষণ পালা করে মেঘ আর রোদের খেলা চলছিল। এখন শুধু মেঘ। আজ অন্তত বিকেল পর্যন্ত তোমার বেলাদি ওই মেঘে ঢাকা পড়ে থাকবেন। চল সেই ফাঁকে আমরা খানিকক্ষণ ঘুরে আসি।'

পূব দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্যে মাধুরীও প্রলুব্ধ হল। রোদ নেই, সূর্যের দেখা নেই, মেঘে মেঘে দিগন্ত জোড়া। এ মেঘ এক্ষুনি হয়তো বৃষ্টি ঝরাবে না, কিন্তু মনকে সঙ্গী করে নিয়ে যাবে। বিনা মন নিয়ে বিমনা হয়ে আজ কি ভালো করে ক্লাস নিতে পারবে মাধুরী?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রলোভন জয় করল মাধুরী। অসীমের দিকে চেয়ে বলল, 'আজ থাক। আজ আমার স্কুলে না গেলেই চলবে না।'

অসীম বলল, 'তোমার স্কুলে না গেলে চলবে না, আর একজনের অফিসে না গেলে চলবে না। তোমরা সবাই মিলে বড় কাজের মেয়ে হয়ে উঠেছ আজকাল। মেয়েরা যদি এত কাজ করে তাহলে কথা বলবে কে, কথা শুনবেই বা কে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'তোমার মত পুরুষের উপযুক্ত কথাই বটে। কিন্তু আমি এবার যাই। এখান থেকে স্কুল পাঁচ-সাত মিনিটের পথ।' হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মাধুরী বলল, 'দশ-বার মিনিট লেট হতে হবে। এর পর যদি বৃষ্টি এসে যায় তাহলেই হয়েছে।'

অসীম বলল, 'চল তোমাদের প্রমীলা-রাজ্যের প্রান্ত অবধি যাই। ভয় নেই, বর্ডার লাইন ক্রস করব না। তার আগেই চলে আসব।'

মাধুরী বলল, 'ভয় আবার কিসের।'

বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নিচে নেমে সরু পথ ধরে এগোতে লাগল

মাধুরী। খানিক দূরে দেখা যাচ্ছে নবনগর বীরনগর। সারি সারি ছোট ছোট বাড়ি। মাথা-উঁচু দোতলা বাড়িও আছে দু'টি-একটি। ডান দিকে একটা শুকনো ডোবা। একটি ঝাপটানো কুলগাছ তার ওপর ঝুঁকে পড়ে যেন তার সব শূন্যতা ঢেকে রাখতে চাইছে। আর একটু দক্ষিণে ছোট একখানি ঘর। মাটির ভিত টিনের চালা বাখারির বেড়া। কিন্তু ঘরখানি দেখতে বড় সুন্দর। ছোট উঠানের এক কোণে একটি ঝোপের মত গোটা কয়েক রক্তরঙা ফুল তার আড়াল থেকে মুখ বার করেছে।

অসীম বলল, 'ফুলগুলি তো দেখতে বেশ। কী ফুল ওগুলি।'

মাধুরী বলল, 'নাম জানিনে। বুনো ফুল-টুল হবে। কোন গন্ধ নেই।'

অসীম বলল, 'সেইজন্যেই বুঝি নাম জানবার আগ্রহ নেই তোমার? গোটা দুই ফুল তুলে নিয়ে আসব?'

মাধুরী বাধা দিয়ে বলল, 'না না। আমাদের স্কুলের দপ্তরী নির্মলা, তার বাড়ি। আমি টিচার হয়ে দপ্তরীর বাড়ির ফুল চুরি করেছি একথা রটে গেলে জাত থাকবে না। তা ছাড়া অত লোভই-বা কেন। ফুল দেখলেই বুঝি তোমাদের ছিঁড়তে ইচ্ছে করে?'

অসীম স্বীকার করে বলল, 'নিশ্চয়ই। ছিঁড়ে এনে বুক-পকেটে না রাখা পর্যন্ত মনেই হয় না ও-ফুলের কোন সার্থকতা আছে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'কী স্বার্থপর!'

অসীম বলল, 'তোমাদের নির্মলা দপ্তরী তো বেশ শৌখিন বলে মনে হচ্ছে। বাড়িটি বেশ লেপে-পুছে ছবির মত করে রেখেছে। বারান্দায় যে ভিজে শাড়িখানা শুকুতে দেওয়া হয়েছে তাও তো বেশ রঙীন।'

মাধুরী বলল, 'এতও চোখে পড়ে।—ওর মনে যে এত রঙ কোত্থেকে আসে তাই ভাবি। স্বামীর বয়স হয়েছে। কাজকর্ম তেমন করতে পারে না। হাঁপানিতে ভোগে। বলতে গেলে নির্মলাই সংসার চালায়। স্কুলে আর ক'টা টাকা পায়। টিচারদের বাড়ির কাজকর্ম করে। তাতে কিছু কিছু হয়। কানাঘুষো, নির্মলা নাকি ভালোবেসে বিয়ে করেছে। কী দেখে ভালোবাসল ওই জানে। বনমালী দেখতেও যে ভালো তা নয়।'

অসীম হঠাৎ বলল, 'আশ্চর্য। এতক্ষণ ধরে এই কথাটাই তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। কিন্তু নানা বাজে কথায় তা চাপা পড়ে গেছে। আচ্ছা মাধুরী, তুমি কি ভালোবাসার কোন আলাদা মূল্য আছে বলে বিশ্বাস করো? না কি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে নিমেষে নিমেষে রূপ গুণ খ্যাতি কীর্তির রসদ জোগাতে হয়? ভালোবাসা কি আলাদা একটি গাছ, না কি নিতান্ত তুচ্ছ এক পরগাছা মাত্র?'

অসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তকাল বিস্মিত হয়ে রইল মাধুরী।

সারাটা পথ ঠাট্টা আর কৌতুক করতে করতে এই গভীর প্রশ্নটিকেই আড়াল করে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে অসীম? এই ভাবনাই কি তার আজ বড় ভাবনা? হতে পারে, অসম্ভব নয়, হতে পারে। মানুষের সারা জীবনের লুকিয়ে রাখা ভাবনা বেদনা হঠাৎ এমনি কোন কোন অভাবিত মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে।

ট্যাঙ্কের পাড় দিয়ে দু'জন ভদ্রলোক এদিকে এগিয়ে আসছিলেন। মাধুরী বুঝতে পারল, তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে তাদের লক্ষ্য করছেন। কী যেন বলাবলি করছেন নিজেদের মধ্যে। মাধুরী সতর্ক হয়ে বলল, 'এ কথার আলোচনা আরেক দিন হবে। এখন তো আর সময় নেই। বৃষ্টি বোধহয় এসে পড়ল। তুমি কি বাস-স্টপ পর্যন্ত যেতে পারবে? নাকি আমাদের স্কুলে আসবে? ট্যাঙ্কের ওপারেই স্কুল। ওই যে দেখা যাচ্ছে।'

অসীম বলল, 'না, আমি ফিরেই যাই।' আর না দাঁড়িয়ে অসীম দ্রুত পায়ে পশ্চিমমুখে হাঁটতে শুরু করল। উল্টোদিকে মাধুরীও জোরে জোরে হেঁটে চলল। ভদ্রলোক দু'জন একটা বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়েছেন। মাধুরী একবার ভাবল, মুখ ফিরিয়ে দেখে, অসীম কতদূর গিয়েছে। কিন্তু সাহস হল না, যদি চোখাচোখি হয়ে যায়। ভয়ও হল, যদি চোখাচোখি না হয়!

স্কুল কম্পাউন্ডে এসে পৌঁছবার আগেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। ট্যাঙ্কের জলে ছোট ছোট ফোঁটায় বৃত্ত রচনা দেখল মাধুরী। কপালে গালে জলের মৃদু আর মধুর স্পর্শ অনুভব করল। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতেই সে বৃষ্টি একেবারে ধারাকারে নেমে পড়ল। আর একটু হলেই মাধুরী ভিজে যেত। ভেজেনি। সেরে আসতে পেরেছে। কিন্তু অসীম কি পারবে? বাসে উঠতে না উঠতেই সে হয়তো ভিজে একেবারে চুপসে যাবে। বুদ্ধি করে যদি রোয়াকেও দাঁড়ায়—এ বৃষ্টি গাছের পাতায় আটকাবে না—যদি কোন বাড়ি-টাড়ির নীচে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে বেঁচে যাবে। কিন্তু সে বুদ্ধি কি অসীমের হবে? যা মুখচোরা মানুষ। মুখচোরা! মাধুরী মুখ টিপে হাসল। মুখচোরা। বাসে তার পাশে বসে আসতে আসতে আজ তো অসীমের খুব মুখ ফুটেছিল।

'এই যে মাধুরীদি, এলেন তাহলে। আমরা ভেবেছিলাম আজও আপনি আসবেন না। এলেন তো এলেন, একেবারে গলদ্ধারা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এলেন।'

টিচার্স রুমের সামনে দপ্তরী নির্মলা তাকে অভ্যর্থনা করল। বছর তিরিশেক বয়স হবে ওর। ফর্সা, বেঁটে, মুখখানা চ্যাপ্টা, নাক-চোখের গড়ন

চীনে ধরনের। একেবারে খাঁটি মঙ্গোলিয়ান টাইপ। মাধুরী একটু হাসল।

'হ্যাঁ, তোমার বাড়ির সামনে দিয়েই এলাম নির্মলা। ঈস্ কী বৃষ্টি! আর একটু হ'লে একেবারে ভিজে যেতাম।'

টিচার্স রুমের মধ্যে ঢুকে পড়ল মাধুরী। চেয়ারগুলি খালি। হেড-মিস্ট্রেস বেলাদির চেয়ারের গদিটা ডেবে আছে, একটু আগে যে বসেছিলেন বেশ বোঝা যায়।

মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁরা সবাই ক্লাস নিতে গেছেন বুঝি?'

নির্মলা বলল, 'হ্যাঁ। আপনি আজ দারুণ লেট হয়ে গেলেন। হেড-মিস্ট্রেস বলছিলেন, আপনি আজও এলেন না। যেদিন আসবেন না আগে একটা খবর পাঠাবেন। নইলে—'

মাধুরী হাসল, 'চাকরি যাবে? ক্লাস নাইনের রেজিস্ট্রারটা দাও তো, আর চকখড়িখানা। আমার ক্লাসে কেউ গেছে নাকি?'

নির্মলা খাতা, চক, পেন্সিল আর পাটিগণিতখানা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কে আর যাবেন? সুমিত্রাদি এসেছেন, কিন্তু বাণীদি আজও আসেননি। থার্ড ক্লাস আর সেকেন্ড ক্লাস—দুই ক্লাসের মেয়েরা একসঙ্গে জুটে গোলমাল করছে।'

মাধুরী একটু হেসে বলল, 'আজ তো গোলমাল করবারই দিন। তবে যতই গোলমাল করুক, স্কুলের বাইরে কারো কানে যাবে না। সেক্রেটারী নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবেন।'

খোলা বারান্দা। ঘুরে যেতে যেতে বৃষ্টির ছাট এসে লাগল মাধুরীর গায়ে। টিনের চালের ওপর ঝম ঝম ঝম ঝম বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। দরজা-জানলা বন্ধ করে ক্লাসে ক্লাসে টিচাররা পড়াচ্ছেন। কিন্তু সত্যিই কি আর পড়াতে পারছেন? মাধুরী ভাবল।

ক্লাস নাইনের সামনে এসে মাধুরী দেখল, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। মেয়েদের ছুটোছুটি, গান আর হাসিহল্লার শব্দ শোনা যাচ্ছে। চেয়ার-বেঞ্চগুলি আজ আস্ত থাকলে হয়। কোন কিছু লোকসান হলে সেক্রেটারী দায়ী করবেন হেডমিস্ট্রেসকে, হেডমিস্ট্রেস দোষ চাপাবেন টিচারদের ওপর।

মাধুরী জোরে জোরে দরজায় ঘা দিল। একটি মেয়ে খিল খুলে দিয়ে সামনে তাকে দেখতে পেয়ে জিভ কেটে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

মেয়েরা যার যার সীটে গিয়ে বসল। তবু একটু গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল।

মাধুরী ভারি গলায় আদেশ দিল, 'সাইলেন্স। ছি ছি ছি, তোমরা উঁচু ক্লাসের মেয়েরা যদি এমন গোলমাল কর, চেয়ার-বেঞ্চ ভাঙা শুরু করে দাও তাহলে কী করে চলে বলতো।'

মাধুরী চেয়ারে বসল। খাতা, গণিত আর চক পেন্সিলটা সশব্দে রাখল টেবিলের ওপর। আকাশের মেঘের মত ওর মুখখানা যেন থম থম করছে। কিন্তু মনের মধ্যে চাপা হাসির হিল্লোল খেলে যাচ্ছে। ঠিক মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতই। আসলে মাধুরী আজ চটেনি। আজ কি ওর চটবার দিন! চেয়ার-বেঞ্চ ভাঙা তো দূরের কথা, স্কুলটা সুদ্ধ উড়িয়ে দিলেও তো আজ মনে সত্যিকারের রৌদ্ররস আনা শক্ত হতো। কিন্তু মেয়েদের গোলমাল করতে দেখলে ভারি গলায় ধমক-টমক না দিলে চলে না। ভালো পড়ানো আর ভালো ক্লাস ম্যানেজ করা—সাক্‌সেস্‌ফুল টিচারের এই দুই গুণই চাই।

বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে, কিন্তু ঘরে কোন সাড়া শব্দ নেই। মেয়েদের এই বাধ্যতায় মাধুরী ভারি খুশী। আবার একটু দুঃখও হল। আহা, বেচারা মেয়েগুলি কীরকম মুখ ভার করে আছে দেখ। গুটি পঁচিশেক আনন্দের ঝরনাকে মাধুরী একটিমাত্র শব্দে স্তব্ধ করে দিয়েছে। সাইলেন্স।

আত্মশক্তির পরীক্ষা হয়ে গেছে। শৃঙ্খলার শিকল এবার একটু শিথিল করা যায়।

ফার্স্ট বেঞ্চের এক কোণে বসা লম্বাপানা মেয়েটিকে মাধুরী এবার হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'শিপ্রা, কাল তোমাদের অঙ্কের ক্লাস হয়েছিল?'

শিপ্রা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না মাধুরীদি। আপনি কাল এলেন না। কে আর ক্লাস নেবেন?'

মাধুরী বলল, 'কালও তোমরা এমনি হৈ চৈ করেছিলে?'

তার পাশের মেয়ে বীণা বলল, 'না মাধুরীদি, আমরা কাল খুব শান্ত ছিলাম।'

মাধুরী বলল, 'আজকে হঠাৎ সবাই মিলে এমন দুরন্ত হয়ে উঠলে যে! বৃষ্টি দেখে!'

হাসি গোপন করল না মাধুরী।

বীণা তা দেখে ভরসা পেয়ে বলল, 'শিপ্রা দুঃখ করছিল মাধুরীদি, বৃষ্টিটা আধ ঘণ্টা আগে এমন চেপে এলে আমাদের আজ রেইনি ডে হয়ে যেত। স্কুলে আর আসতে হতো না।'

শিপ্রা ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, 'যাঃ।'

নিজের কৈশোরের কথা মাধুরীর মনে পড়ে গেল। বৃষ্টির দিনে সে আর মানসীও তো এই কামনাই করত। স্কুলের ঠিক আগের মুহূর্তে জোরে বৃষ্টিটা চেপে আসুক। স্কুলে যেন আর যেতে না হয়। কোন কোনদিন ভিজে ভিজে বাড়ি আসত। কলেজেও এমন করেছে। চুল থেকে জল ঝরত, শাড়ি থেকে জল ঝরত। মা রাগ করে বলতেন, 'নির্ঘাৎ জ্বর হবে। তোদের আর কি, যত দুর্ভোগ আমার।'

চকখড়ি নিয়ে বোর্ডে অঙ্ক লিখতে লাগল মাধুরী। অঙ্ক আবার কি অঙ্ক, সুদকষা।

শিপ্রা বলল, 'মাধুরীদি, বীণা বলছে, আজ ইণ্টারেস্টে ওর নাকি ইণ্টারেস্ট নেই।'

মাধুরী ফিরে তাকাল, 'কে বলল একথা? বীণা, স্ট্যাণ্ড আপ। উঠে দাঁড়াও।'

বীণা উঠে দাঁড়াল।

মাধুরী গম্ভীর মুখে বলল, 'তোমার পান্‌টা উপভোগ করলাম। কিন্তু কালও তোমাদের অঙ্কের ক্লাস হয়নি, আজও যদি কিছু না হয়, কী করে আমি কোর্স শেষ করব বলতো।'

কয়েকটি মেয়ে বলল, 'না, মাধুরীদি, আপনি অঙ্ক দিন আমরা করছি। এখন তেমন প্রোগ্রেস না হলে শেষে পরীক্ষার সময় তাড়াহুড়া পড়ে যাবে।'

মাধুরী বলল, 'এই তো লক্ষ্মীমেয়ের মত কথা।'

বোর্ডে লিখে লিখে মাধুরী ক্লাসের মেয়েদের অঙ্ক বোঝাতে লাগল। অঙ্কের ক্লাসে একটু কড়া না হলে হয় না। এতো আর ইংরেজী বাংলা ইতিহাসের ক্লাস নয় যে গল্পচ্ছলে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া যায়। এখানে একটু শক্ত হওয়া দরকার। অমনিতেই মেয়েরা অঙ্ক করতে চায় না। ম্যাথা-ম্যাটিকস্ নিয়েছে এমন মেয়ের সংখ্যা কম। বেশির ভাগই গণিত আর গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। নিজে একটু শক্ত না হলে সেই অ্যারিথমেটিকটা ওদের শেখানো যাবে না।

ক্লাস শেষ করে তাড়াতাড়ি রোল-কলটা সেরে নেয় মাধুরী। মেয়েদের আনুগত্যে খুশী হয়। যতটুকু কাজ হয়েছে ভালই হয়েছে। ক্লাস থেকে চলে যাওয়ার সময় ছাত্রীদের দিকে চেয়ে বলে, 'রেইনি ডে না হলেও তোমরা যাতে দু' ঘণ্টা, অন্তত এক ঘণ্টা আগে ছুটি পেয়ে যাও তার জন্যে হেড-মিস্ট্রেসকে বলে দেখব।'

ওরা খুশী হয়ে বলল, 'বলবেন মাধুরীদি? সত্যি বলবেন?'

মাধুরী হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু ধর ছুটি যদি পাওই, এই বৃষ্টির মধ্যে তোমরা যাবে কী করে?'

শিপ্রা বলল, 'বৃষ্টি অতক্ষণ থাকবে না। যদি থাকেই ভিজে ভিজে যাব। আপনি সেজন্য ভাববেন না মাধুরীদি।'

মাধুরী হাসতে হাসতে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এল। ছুটির কাঙাল সব। এক ঘণ্টা আগে ছুটি পেলেও যেন হাতে স্বর্গ পায়। ওরা কি ভাবতে পারে, মাধুরীও ওদের মতই ছিল? ঠিক ওদের মতই ছুটির কাঙাল, ওদের মতই বৃষ্টিতে ভিজবার জন্যে উৎসুক? ওরা বোধহয় কল্পনাও করতে পারে

না। ওরা বোধহয় ভাবে, ওদের মাধুরীদি মায়ের পেট থেকে পড়েই এমনি অঙ্কের টিচার মাধুরীদি হয়েছে। মাধুরী কিন্তু মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়—তার ক্লাসের এই কিশোরী মেয়েদের সঙ্গে। নিজের কৈশোরকে মনে পড়ে। সে দিনগুলি খুব যে বেশি দূরে ফেলে এসেছে তা নয়। পিছন ফিরে দিগন্তে তাকাতে হয় না তাদের জন্যে। প্রায় পিঠের কাছেই তাদের দেখা মেলে। সেই নানা রঙের দিনগুলি। তবু মনে হয়, স্কুল-জীবনের, এমনকি সেদিনের কলেজ-জীবনের সেই মেয়েটি যেন আরেকজন। তার সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাসনা-কামনা নিয়ে সে একেবারে আলাদা, যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখনকার মাধুরীর সঙ্গে যেন তার কোন যোগ নেই। এই যেমন তার ছাত্রীরা—শিপ্রা, বীণা, সুলেখারা—তেমনি নিজের অতীত থেকে প্রত্যেক বছরের, প্রত্যেক বয়সের মাধুরীকে যেন আলাদা করা যায়। তারা একই স্কুলের ছাত্রী, কিন্তু এক এবং অভিন্ন নয়।

টিচার্স-রুমে এসে সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গেও চোখাচোখি হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্লাস কি হয়েছিল? আজও তো খুব লেট করে এলে।'

মাধুরী ভাবল, কোন্ কৈফিয়তটা আগে দেয়। কালকের কামাইয়ের না আজকের লেট হওয়ার। তার ছাত্রীদের মত দুটোই তো মিথ্যে কথা বলতে হবে। মাথাধরা কি পেটের অসুখের দোহাই। কালকের সত্যিকারের অসুখের কথাটা বলা যাবে না, আজকের সুখের কথাটাও নয়।

মাধুরী বলল, 'বিশেষ একটা দরকার ছিল।'

হেডমিস্ট্রেস গম্ভীরভাবে বললেন, 'হুঁ, একটা দরকারের জন্যে একদিন কামাই আর চারদিন লেট। জানো যে স্টাফ কম, অসুবিধে হয়। ক্লাসে টিচার না গেলে মেয়েরা হৈ চৈ করে আশেপাশের ক্লাসগুলিও করতে দেয় না। আগে যদি একটু ইন্টিমেট করে রাখ, হয়তো একটা ব্যবস্থা করা যায়।'

হেডমিস্ট্রেস বেলা রায় চেয়ারে বসে উপদেশ বর্ষণ করতে থাকেন। মাধুরীরা যেমন ছাত্রীদের ক্লাস নেয়, হেডমিস্ট্রেস তেমনি টিচারদের ক্লাস নেন। মাধুরী মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হয়। একদিন তো মোটে কামাই। তার জন্যে এত। বিশেষ করে অন্য টিচারদের সামনে। মনে যাই থাকুক, মাধুরী মুখে মুখে কোন জবাব দেয় না। জানে, জবাব দিলে বেলাদি আরো চটে যাবেন। হয়তো যা-তা বলতে শুরু করবেন। তখন নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্যে মাধুরীকেও—।

মাধুরী পরের ক্লাস নেবার জন্যে তৈরী হয়। এই পিরিয়ডে বাংলা পড়াতে হবে ফার্স্ট ক্লাসে। ইংরেজী বাংলা অঙ্ক সবই সে পড়ায়। তার মত

টিচার খুব বেশি নেই স্কুলে। সে সব বিষয় পড়ায়, খেটে পড়ায়, ফাঁকি দেয় না। বেলাদি এসব জানেন, তবু একটু খুঁত পেলেই বকবেন।

টিচাররা দু' তিন মিনিট দম নিয়ে ফের যে যার ক্লাসে চলে গেল। অরুণা সেন বারান্দা দিয়ে মাধুরীর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। থার্ড ক্লাসে সে ইংরেজী পড়াতে যাচ্ছে। তার বয়সও চব্বিশ-পঁচিশ। এখনো বিয়ে হয়নি।

অরুণা ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'কি মাধুরীদি, মন খারাপ হয়ে গেল নাকি। হেডমিস্ট্রেসের মুখ তো নয়, একখানা ক্ষুর। পান থেকে চুন খসলে গজগজ গজগজ। কী যে স্বভাব।'

মাধুরী বলল, 'হুঁ।'

অরুণা এবার কানের কাছে মুখ নিয়ে হেসে বলল, 'ব্যাপারখানা কি। কাল কি পাকা দেখা-টেখা ছিল নাকি।'

মাধুরী বলল, 'যাঃ। ক্লাসে যাও এখন। হেডমিস্ট্রেস যদি দেখতে পান আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছি, ফের এক কাণ্ড বাঁধাবেন।'

মাধুরী নিজের ক্লাসের দিকে এগোতে লাগল। মনে মনে ভাবল, বেলাদির গুণ আছে যথেষ্ট। ইংরেজী ভাল বলেন, ভাল লেখেন, পড়ানও ভাল; স্কুল কি করে চালাতে হয় তাও জানেন, কিন্তু মেজাজ বড় কড়া, ভাষা বড় রূঢ়। বয়স চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন তো হবেই। চেহারা যেন ডিস্পেপসিয়ার রোগী। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যৌবনে বেশ সুন্দরী ছিলেন। কিংবদন্তী, তখন অনেকের নাকি মাথা ঘুরিয়েছেন। এখন নিজের মাথারই ঠিক নেই। মাঝে মাঝে ছিট্টা বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। কেউ বলেন, অবিবাহিতা, কেউ বলেন, বহুবিবাহিতা। এখন পাড়ওয়ালা শাড়ি পড়েন, মাঝে মাঝে গয়না পরেন, মাঝে মাঝে পরেন না। কিন্তু সিঁথি একেবারে সাদা। অবশ্য সিঁথিতে সিঁদুর না পরেও মেয়েরা আজকাল সীমন্তিনী হতে পারে। কিন্তু বেলাদি এখন একা থাকেন। স্কুল কমিটি ছোট একটা কোয়ার্টার্স দিয়েছে। সেখানে বইপত্র নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। অনেকে বলছে, এটা ওঁর স্বেচ্ছাকৃত অজ্ঞাতবাস। অনেকে বলেন, এই স্কুলেও বেলাদি বেশিদিন থাকবেন না। খেয়াল হলেই অন্য কোথাও চলে যাবেন। সেইজন্যেই তিনি কারো পরোয়া করেন না। না কমিটির প্রেসিডেন্টের, না সেক্রেটারীর। আর স্কুলের কমবয়সী টিচাররা তো তাঁর কাছে থ্রি-ফোরের ছাত্রীর মত। যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে হেডমিস্ট্রেসের। আছে স্বেচ্ছাচার আর স্বেচ্ছাবিচরণের ক্ষমতা। কিন্তু এই স্বাধীনতা যে খুব সুখের তা তো মনে হয় না। নিঃসঙ্গ জীবনে যে বেলাদি খুব শান্তিতে আছেন, ওঁর চালচলন, কথাবার্তা তার পরিচয় দেয় না। মাঝে মাঝে বেলাদির জন্যে বড় দুঃখ হয় মাধুরীর। ইচ্ছা

হয়, ওঁর কাছে বসে ওঁর সব কথা শোনে, সাধ্যমত ও'র সেবা পরিচর্যা করে। ওই দোর্দণ্ড প্রতাপের অন্তরালে যে একটি ক্ষতবিক্ষত নারীহৃদয় রয়েছে, তার একটু শুশ্রূষা করতে সাধ যায়। কিন্তু ওঁর কাছে ঘেঁষবার জো নেই। বেলাদি তাঁর কোয়ার্টার্স যেমন কাঁটাতারের বেড়ায় ঘিরে রেখেছেন তেমনি নিজেকেও রেখেছেন আত্মমর্যাদা আর অহমিকার বেড়ার আড়ালে। তিনি সবাইকে এড়িয়ে যান, তাঁকেও সবাই এড়িয়ে চলে। হেডমিস্ট্রেস আর কেয়ার-টেকার ব্রজবাবুকে দেখে মাধুরীর মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা ভয় হয়, আশঙ্কা হয়। কিসের ভয় তা ঠিক পরিষ্কার করে বোঝা যায় না। বেলাদি বিদুষী, আর ব্রজবাবু সাধারণ লেখাপড়া জানা মানুষ। দুজনেরই নিঃসঙ্গ একক জীবন। কিন্তু কেউ যেন ঠিক সুখী নন, সুস্থ নন। তবে কি মানুষের সঙ্গ কামনা ভিতরে ভিতরে থেকেই যায়? তবে কি মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না? তার সুখের জন্যে অন্তত আর একজন কি অপরিহার্য?

ক্লাসে ঢুকতেই ক্লাসের মেয়েরা উঠে দাঁড়াল। এদের মধ্যে দু' চারজন বেশি বয়সী মেয়েও আছে। জনতিনেক আছে বিবাহিতা। তাদের মধ্যে একজন লতা। মাধুরী ক্লাসে এলে ও বড় লজ্জা পায়। ওর যে বর তার সঙ্গে মাধুরীর আগে সম্বন্ধ এসেছিল। দেখাদেখিও হয়েছিল। মাধুরীকে দেখে তাদের পছন্দ হয়নি। লতাকে ওর বর নিজে দেখে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। বাপের বাড়িতে থেকে এই কয়েকটা মাস এই স্কুলে পড়ে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতিও দিয়েছে। কি করে যেন চালু হয়ে গেছে কথাটা। হয়তো ওর বরই বলে থাকবে। পুরুষের অসাধ্য তো কোন কাজ নেই। তাই লতা মাধুরীকে দেখে বড় লজ্জা পায়। চোখের দিকে তাকায় না। মুখ তুলে কথা বলে না। কিন্তু শুধু কি লজ্জা? ওর মনে এর জন্যে গর্বও কি নেই? তার টিচার তার কাছে হেরে গেছে সেই গর্ব? মাধুরী নিজের মনেই একটু হাসল। তারপর বই খুলে পড়াতে আরম্ভ করল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার একটি অংশ পর্ষদ তাঁদের পাঠসংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পড়াতে পড়াতে মাধুরী বেলাদির বকুনির কথা ভুলে গেল, তাঁর নিঃসঙ্গতার দুঃখের কথা ভুলল, লতার লজ্জা আর গৌরবের কারণের কথাও তার আর মনে রইল না। পঁয়তাল্লিশ মিনিট কিভাবে যে কেটে গেল তা যেন টেরই পেল না মাধুরী। ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে আসবার পর তার খেয়াল হল। হ্যাঁ, এই ভাল। কাজই সবচেয়ে ভাল। নিজের কাজে নিবিষ্টতার মধ্যেই সুখ। এ ছাড়া সুখের আর কোন অর্থ নেই, অস্তিত্ব নেই। বাবা আগে আগে কোন্ এক পুরোন যাত্রার পালা থেকে—বোধ হয় মরুৎযজ্ঞই হবে নাম—পার্ট আবৃত্তি করতেন, তার মধ্যে দুটো লাইন ছিল 'কর্ম সুতোয় দুখানা ঘুড়ি। ভক্তি আর

জ্ঞান বেড়ায় উড়ি।' মাধুরী হাসল। পদ্যটা ভাল না, কিন্তু ভিতরের কথাটা ভাল।

বৃষ্টির ধারা অনেকক্ষণ আগেই ক্ষীণ হয়েছে। আকাশের মেঘ কাটেনি। এখন চিক চিক করছে রোদ। ক্লাস নাইনের মেয়েদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল তা বোধ হয় আর রাখা গেল না। হেডমিস্ট্রেসের কাছে আর সুপারিশ করতে যাওয়া যাবে না। আজ তো আর পুরো বৃষ্টির দিন নয়, রোদ আর বৃষ্টি মেশানো দিন। তিনি পুরো স্কুলই করবেন।

টিফিন পিরিয়ডে হেডমিস্ট্রেস নিজের কোয়ার্টারে চলে গেলেন। নির্মলা মাথায় ছাতা ধরে তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এল। টিচার্স-রুমে টিচাররা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বেলাদি সব সময় যে বকেন কি উপদেশ দেন তা নয়। কিন্তু তিনি শুধু তাঁর চেয়ারখানায় বসে থাকলেও তরুণী শিক্ষিকারা কেমন যেন একটু আড়ষ্টতা বোধ করে। তাঁর দৃষ্টিতে ভয়, তাঁর হাসিতেও ভয়। মানুষের হাসি যা ফুলের মত তাকেও মানুষ ভয় করে। কিন্তু গাছের ফুল? তাকেও কি ভয় করে কেউ? মাধুরীর জানা নেই। তবে শুনেছে, ফুলের ঘায়ে কেউ কেউ নাকি মূর্ছা যায়। সে ফুলের মানে অবশ্য অন্য। পুষ্পশর, পুষ্পধনু। প্রেমের দেবতার কত নামই যে মানুষ দিয়েছে। আরো তো দিতে পারত। শ্রীকৃষ্ণের একশ আট নাম না হয়ে মদনেরই অষ্টোত্তর শতনাম থাকা উচিত ছিল।

স্কুলের আটজন টিচারকে এবার একসঙ্গে জড় হতে দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে এই কলোনীরই আছেন তিনজন। তাঁরা ফের নিজেদের ঘর-সংসারের খবর নিতে গেলেন। অনুপমাদি আর রমলাদি পাশাপাশি দুখানা চেয়ারে বসে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি আলাপ করতে লাগলেন। অনুপমাদির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। স্বাস্থ্য ভাল না। আবার ছেলেপুলে হবে। কয়েক মাস পরেই দীর্ঘদিনের ছুটি নিতে হবে তাঁকে। এই নিয়ে হেডমিস্ট্রেস বেশ একটু বিরক্ত। তিনি নিজে তো মেয়ে হয়েও মেয়েদের এই সুখ-দুঃখের মর্ম বুঝলেন না। অনুপমাদি নিজেও খুব একটা স্বস্তি বোধ করেন না। সহকর্মীদের সামনে তাঁর কেমন যেন একটু লজ্জা লজ্জা করে। মাধুরী ও অরুণারা তাঁর সামনে কিছু বলে না। আড়ালে আবডালে ঠাট্টা-তামাশা করে। বেশ টিপ্পনি কাটে। মাধুরী নিজে অবশ্য তেমন মন্তব্য করে না। শোনেই বেশি। আচ্ছা, ওই অবস্থা নিয়ে ছোট ছোট ছাত্রীদের সামনে কী করে বসে বসে পড়ান অনুপমাদি? লজ্জা করে না? মাধুরী হলে তো লজ্জায় মরে যেত। সে ভাবতেও পারে না। ছি ছি ছি। কিন্তু বাড়ির অবস্থায় বাধ্য হয়েই বোধ হয় ওঁকে এই দশা নিয়েও আসতে হয়। আর কত দূর থেকে, সেই উল্টোডাঙা থেকে ওঁকে এখানে আসতে হয়। ধারে কাছে যে সব স্কুল আছে তাতে ওঁর চাকরি হয়নি। হয়েছিল, চলে গেছে। কার দোষে কে জানে।

অনুপমাদি তা ভাল করে বলেন না। মাধুরীরও ওসব খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করে। তিনি নিজে থেকে যা বলেন তাই শুধু শুনে যায় মাধুরী। একদিন অনুপমাদি কথায় কথায় বলেছিলেন, 'মাধুরী, আমিও প্রথম প্রথম শখ করেই একাজে নেমেছিলাম। যে স্কুলে ছাত্রী ছিলাম, সেই স্কুলেই একজন টিচারের বদলীতে কাজ আরম্ভ করি। তখন কী গর্ব, কী আনন্দ! সেই একই স্কুলে যাই। কিন্তু যাওয়ার ধরনটা পালটে গেছে। যাদের ভয় করতাম, তাঁদের পাশাপাশি বসি, তাঁদের সঙ্গে সমবয়সীর মত অসঙ্কোচে আলাপ করি। এর চেয়ে বড় দিগ্বিজয় যেন আর কেউ কখনো করেনি। তার পর ওই মাস্টারী করতে করতেই বিয়ে-থা হয়ে গেল। আমার এক প্রিয় ছাত্রীর দাদার সঙ্গে। ছাত্রীই ছিল যোগাযোগের সেতু। বিয়ে হল, চাকরি কিন্তু খসল না। স্বামীর সে অবস্থা নয়। তা ছাড়া দুটো পয়সা বেশি এলে দুঃখের সংসারে একফোঁটা সুখ বেশি মেলে। তারপর কত স্কুল পালটালাম, কিন্তু মাস্টারীটা রয়েই গেল। এখন মাঝে মাঝে বিরক্তি লাগে। ছাড়তে পারি না, আবার রাখাও শক্ত। নইলে একদিন আমিও তোমাদের মতই ছিলাম।'

অনুপমাদিকে দেখে মাধুরীর সেই কথাগুলি আজ ফের মনে পড়ে গেল। এখন অবশ্য তিনি অন্য মুডে আছেন। টিফিন খেতে খেতে রমলাদির সঙ্গে স্কুল-কমিটির মধ্যে যে পার্টি পলিটিকস্ ঢুকেছে, আর সেই জন্যেই স্কুলটার উন্নতি হচ্ছে না, পাকা বাড়ি হচ্ছে না—এখন এইসবই অনুপমাদির আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সেই একদিনের অনুপমাদি মাধুরীর মনে যেন গাঁথা হয়ে রয়েছে। সেদিন ওঁকে যেমন করে পেয়েছিল তার পরে আর ওঁকে সেভাবে পায়নি। তার পরেও না তার আগেও না। সেদিনও ছিল এমনি এক বৃষ্টির দিন। ঘরে আর কেউ ছিল না। মাধুরীর মুখোমুখি বসে সেদিন কথাগুলি বলেছিলেন অনুপমাদি। বলেছিলেন, 'মাধুরী, একদিন আমিও তোমাদের মতই ছিলাম।' মাধুরীও কি একদিন তার ছাত্রীদের, কমবয়সী টিচারদের ডেকে বলবে, 'আমিও একদিন তোমাদের মতই ছিলাম।' আর তারা সে কথা বিশ্বাস করতে চাইবে? ভাবতেও যেন গা শির-শির করে মাধুরীর। ভবিষ্যতে কার মত হবে সে? ওই অনুপমাদির মত, না হেডমিস্ট্রেস বেলাদির মত? জীবনের কোন্ প্যাটার্নটা তার জন্যে অপেক্ষা করছে?

না, কোন প্যাটার্নই না, মাধুরী ওঁদের কোন প্যাটার্নই পছন্দ করে না। শুধু ওঁদের কেন, এখানে যত টিচার আছেন—বিবাহিতা, অবিবাহিতা, বিধবা, স্বামীত্যাগিনী কি পরিত্যক্তা—কারো মতই হতে চায় না সে। মাধুরী তার নিজের মত হবে। নিজের হাতে যেমন পুলওভার বোনে, স্কার্ফ বোনে, তেমনি নিজের জীবনটাকে মাধুরী নিজের হাতে বুনে নেবে। কিন্তু সেও

তো আরো পাঁচজনের আরো পাঁচটা স্কার্ফের মতই হবে। তা হোক। তবু তা মাধুরীর নিজের। নিজের শ্রমের, নিজের স্বপ্নের, নিজের সাধের। ওই স্কার্ফের মত সবাইর জীবনই দেখতে একরকম। বরণে ধরনে, সুখে দুঃখে, আশা আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু সেই জীবন যারা যাপন করে, বহন করে, তারা জানে যে এক নয়। প্যাটার্নটা বাইরে থেকে দেখতে এক। কিন্তু ভাবে, অনুভবে, স্বাদে আলাদা।

অরুণা জানলার ধার থেকে হাতের ইশারায় তাকে ডাকল।

মাধুরী উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে তার পাশে দাঁড়াল, 'কী ব্যাপার।'

অরুণা বলল, 'কী বুড়িদের কাছে ভূতের মত বসে আছ মাধুরীদি। এদিকে এসো। চেয়ে দেখ, আকাশে কি সুন্দর রামধনু উঠেছে।'

'ওমা, তাই তো।'

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল মাধুরী। মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে বলল, 'বাঃ!'

মেঘের কোলে সপ্তবর্ণের লীলাধনু একেবারে আকাশ জুড়ে আসন পেতেছে। এত বড় রামধনু শিগ্‌গির আর দেখেনি মাধুরী। আশ্চর্য, এই রামধনুর নামই তো হওয়া উচিত পুষ্পধনু। আকাশের ফুল।

অরুণা মাধুরীর গায়ে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বলল, 'ঈস, একেবারে ভাবেই বিভোর। ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না? তারপর, কাল কি হল ব্যাপারটা শুনি।'

মাধুরী তার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'ব্যাপার কিছু নয়। কাল সত্যিই বড় মাথা ধরেছিল। শুয়েছিলাম সারাদিন।'

তারপর ফের মাধুরী রামধনুর দিকে তাকাল। আচ্ছা, অসীম কোথায় আছে এখন? ডালহৌসি স্কোয়ারে? নাকি একেবারে স্ট্রান্ড রোডে নিউ সেক্রেটারিয়েটে চলে গেছে? উঠেছে গিয়ে সেই তেরতলার ওপর? সেখানে জানলায় দাঁড়িয়ে মাধুরীর মত এই একই রামধনু দেখতে পাচ্ছে অসীম? একতলা আর তেরতলা এক হয়ে গেছে?

আশ্চর্য, রামধনু দেখে হঠাৎ অসীমের কথা এমন করে মনে পড়ল কেন মাধুরীর? পড়বার তো কোন কথা নয়। আর অসীম যে এখন ডালহৌসি স্কোয়ারেই থাকবে তার কি মানে আছে? ওখানকার কাজকর্ম সেরে সে হয়তো এতক্ষণ বেলভেডিয়ারে চলে গেছে। সেখানে দুজনে মিলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখছে একই রামধনুর রঙ। আলিপুরের আকাশ এতক্ষণে নিশ্চয়ই রঙে রঙে ছেয়ে গেছে। হঠাৎ বুকের মধ্যে ছোট একটু আঁচড় পড়ল মাধুরীর। একটি মিনিয়েচার রামধনু। রামধনু নয়, রক্তধনু।

সঙ্গে সঙ্গে মাধুরী নিজের মনকে চোখ রাঙাল। ছি ছি ছি, ছি ছি ছি।

সে না তার আপন বোন! সে যে তার আপন বোন। তাকেও হিংসা! তার হাতের পুতুল ছেলেবেলায় কেড়ে নিত বলে আজও নেবে!

নির্মলা ঘণ্টা পিটিয়ে জানাল টিফিন শেষ হয়েছে। তারপর আরো তিনটে ক্লাস। হেডমিস্ট্রেস আর এলেন না। তাঁর শরীর নাকি ভাল নেই। ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেণ্ড ক্লাসকে একসঙ্গে মিলিয়ে মাধুরী গ্রামার পড়াল। গ্রামারই আসল। ভাষায় গ্রামার, আর জীবনে নীতি, কর্তব্য। তাতে যেন কোন ভুল না হয়।

চারটেয় ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা পড়ল। যেন সোনার ঘণ্টা।

সে ধ্বনি শুধু ছাত্রীদের কানে নয়, মাধুরীদের কানেও বড় মধুর সুরে বাজতে লাগল।

ছুটির পরেও একটু কাজ আছে মাধুরীর। একটি টুইশন। এই কলোনীরই দু' নম্বর ট্যাঙ্কের ধারে থাকেন শীতাংশু নন্দী। মুন্সেফ। তাঁর মেয়ে পুতুলকে পড়ায় মাধুরী। এই তো সবে স্কুল ছুটি হল। পড়াবার সময় এখনো হয়নি। মেয়ে নিশ্চয়ই এখন খাবে-দাবে, তারপর বেড়াতে বেরোবে। সমবয়সীদের সঙ্গে হেসে-খেলে গল্প করে ঘরে ফিরবে। ওই থার্ড ক্লাসে পড়া বয়স তো মাধুরীরও একদিন ছিল। ও-বয়সে সন্ধ্যার পরেই পড়তে মন বসে না, আর তো তার আগে। কিন্তু সন্ধ্যার পরে যদি দেড় ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় মাধুরী—কাল আসেনি বলে আরো আধ ঘণ্টা বেশিই তার ছাত্রীকে পড়ানো উচিত—তা যদি পড়ায় তাহলে বরানগরে পৌঁছতে বড় দেরি হয়ে যাবে। দাদা-বউদি ভাববে, শুধু নিমন্ত্রণ খেতে এসেছে। তাই কি যাওয়া যায়? তার চেয়ে না যাওয়া ভাল। কিন্তু না গেলে আবার দাদার মন খারাপ হয়ে যাবে। সম্পর্ক যদি স্বাভাবিক থাকত তাহলে না গেলেও হতো। একটা জন্মদিন বইতো নয়। আজ না গিয়ে পরে অন্য একদিন গেলেও পারত মাধুরী। কিন্তু সম্পর্কটা যখন একটু অন্যরকম হয়েই গেছে সেই ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। তবে কি এখনই যাবে শীতাংশুবাবুদের বাড়িতে? কিন্তু তাই কি ভাল দেখাবে? স্কুলে পনের মিনিট লেট করে আসায় যে লজ্জা, ছাত্রীর বাড়িতে নির্দিষ্ট সময় থেকে দু ঘণ্টা আগে যাওয়ায় তার চেয়ে লজ্জা বেশি ছাড়া কম নয়।

খানিকদূর অবধি সঙ্গে সঙ্গে এসে একটু আগে অরুণাও বিদায় নিয়েছে। সে বলেছে, 'তোমার তো আবার টুইশন আছে মাধুরীদি। তোমার ভাগ্য ভাল। থার্ড ক্লাসের মেয়ে। তিন বছর পড়াতে পারবে। আর এঁরা যদি

দয়া করে এলেভেনথ্‌ ক্লাস পর্যন্ত খোলেন তাহলে চার বছর। ভাল টুইশন মানে পার্ট টাইম চাকরি।'

মাধুরী অন্যমনস্কের মত বলেছে, 'তা ঠিক।'

অরুণা বলেছে, 'আমারও একটা টুইশন হলে সুবিধে হয় মাধুরীদি। সংসারের খরচ যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। ভাইটি বি-এ পাশ করে বসে আছে। এখন পর্যন্ত একটা চাকরি-বাকরির সংস্থান হল না। কী যে হবে। তোমার তো অনেক সোর্স আছে মাধুরীদি, পরেশটার জন্যে তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো তো।'

বেকার কি শুধু অরুণারই ভাই! তাদের সংখ্যা কি দু'চারজন! তবু ওকে নিরাশ না করে মাধুরী বলেছে, 'করব'। যদিও জানে, চেষ্টা করবার মত বিশেষ কোন সাধ্য তার নেই। সামান্য আলাপ-পরিচয়ের সূত্র ধরে চেষ্টা করলে কোন লাভও হয় না। তার ভাই নন্দু তো এবার আই.এস-সি. দিয়েছে। পাশ করলে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বে বলে লাফাচ্ছে। কিন্তু মাধুরী খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে, ওসব কলেজে ভর্তি হওয়া বড় শক্ত। খরচ চালানো আরো কঠিন। দাদাকে বললে সে কি আর নন্দুর খরচটা আলাদা করে দেবে না? দেবে—যদি তার সঙ্গে সেইরকম সম্পর্ক মাধুরীরা রাখতে পারে। আলাদা অন্নে থাকলেই যে লাঠালাঠি করতে হবে, কি মুখ দেখাদেখি বন্ধ করতে হবে তার কি মানে আছে! এত দূরদর্শিতা বাবার, কিন্তু এইটুকু ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি নেই। ছেলের সঙ্গে দেখা হলেই কেবল ঝগড়া করবেন, ঝগড়া যাতে মেটে তার কোন উপায় বের করবেন না।

এত আগে শীতাংশুবাবুর বাড়িতে যাওয়া ঠিক হবে না। মাধুরী ট্যাঙ্কের বাঁধানো ঘাটের ওপর এসে বসল। দুদিকে দুটি লাল রঙের ঘাটলা। মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে জলের ধার পর্যন্ত। মাধুরী ডানদিকের ঘাটের এক প্রান্তে এসে পা ঝুলিয়ে বসল। দীঘির কালো জল টলটল করছে। 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো এসো মোর হৃদয়নীরে।' এই চোখ-জুড়ানো প্রাণ-জুড়ানো জলকে হৃদয়নীর বলা যায়। এ দীঘির জলে গাগরী ভরতে কেউ কি আসে? এ পর্যন্ত কোন কলোনীবাসিনীকে জল ভরতে আসতে দেখেনি মাধুরী। জল নিশ্চয়ই কেউ কেউ ভরে নিয়ে যায়, মাধুরীরই চোখে পড়েনি। শহরে এক ফোঁটা জলের জন্য মাধুরীরা কাঙাল আর এখানে কত জল। তার সত্যিই ইচ্ছা করে, এই অগাধ জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, সাঁতরায়, ডুব-সাঁতার কাটে। তারপর জল-ভরা পিতলের কলসী কাঁখে নিয়ে ভিজে শাড়ি ছপছপ করতে করতে বাড়ি ফেরে। সে যেন আর-এক জীবন, আর-এক জন্ম। এই প্রখর নাগরিকতার স্বাদ তাতে নেই। কিন্তু তা বড় স্নিগ্ধ সজল আর সরস। এই মেঘকজ্জল দিবসে আর-এক জন্ম নিতে সাধ যায় না কার!

চারদিক বড় নির্জন, খুব চুপচাপ। কলোনীর এদিকটায় বসতি কম। তাছাড়া, থেকে থেকে বৃষ্টি আসছে বলে কেউ হয়তো তেমন ঘর থেকে বেরোয়নি। এখনো বেশ রোদ থাকবার কথা। কিন্তু আকাশে মেঘের আনা-গোনা আছে বলে সেই রোদের আভা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, তাপ আর নেই। বেড়াবার মতই সময়। জায়গাটাও বেশ। কিন্তু একা একা ঘুরে বেড়াতে কি আর সব সময় ভাল লাগে? যদি কেউ সঙ্গে থাকত বেশ হতো। কিন্তু এ সময় কে আবার থাকবে? অরুণাকে বললে ও নিশ্চয়ই আসত। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কাটিয়েও যেত। এই স্কুলে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা মাধুরীর ওর সঙ্গেই। তবু মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গ তেমন যেন ভাল লাগে না। কেন যেন এড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করে। অরুণা হয়তো বসে বসে তার বেকার ভাইয়ের কথাই বলত। সমস্যা অনেক জটিল। তার তীব্রতাও বেশি। তবু মাধুরীর ভয় হয়, এই মুহূর্তে ওসব আলোচনায় সে হয়তো পুরো মনোযোগ দিতে পারত না, গভীর সহানুভূতির আবেগ তার কথায় ফুটে উঠত না। অরুণা ক্ষুন্ন হতো; মাধুরী নিজেও কি তাতে কম লজ্জা পেত? তার চেয়ে অরুণাকে না ডাকাই ভাল হয়েছে। এমন সময় মাঝে মাঝে আসে যখন কাউকে মনের গোপন চিন্তা-ভাবনার ভাগ দেওয়া যায় না। কিসের যেন লজ্জা আর সংকোচ এসে মুখ আটকে ধরে। ভয় হয়, পরম বন্ধুও হয়তো হাসবে, ব্যঙ্গ করবে, কি অতখানি নিষ্ঠুর যদি নাও হয়, দয়ালুও হতে পারবে না। তার চেয়ে নিজের মনে নিজের মুখোমুখি থাকা ভাল। নিজের সত্তা খণ্ডিত করে আর একজনকে বার করে নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেওয়া তখন বরং অনেক নিরাপদ। দুই সখী—দুই পাখিতে বসুক মুখোমুখি। এক পাখি রঙীন ফলটা ঠোঁটে করে নিয়ে আসতে চায়, আর-এক পাখি বলে, না না না না। এক পাখি উড়তে চায়, আর-এক পাখি বলে, না না না। এক পাখি মরতে চায়, আর-এক পাখি বলে, না না না না। নিজের মধ্যে সেই দুই পাখির কিচিরমিচির শোনা বরং অনেক ভাল। তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে, ঠোকরাঠুকরি করবে, একজনের আঘাতে আর একজন ক্ষতবিক্ষত হবে, তবু একজনের গোপন ব্যথা কেউ আর পাঁচজনের কানে দেবে না। তারা যে দুইয়ে মিলে এক, তারা যে পরস্পরের পরিপূরক। ঝগড়াটাও তাদের লীলা। নিজের ভিতরের সেই দ্বিতীয় পাখি ছাড়া এমন বিশ্বাসী বন্ধু মাধুরী আর কাকে পাবে। অসীম একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, 'তোমরা দুজনে ঠিক যেন দুটি পাখি।' একদিন বলেছিল ফুল, আর একদিন বলেছিল পাখি। মেয়েদের সঙ্গে পৃথিবীর যত কোমলতার তুলনা। মেয়েরা যেন সব সময়ই নরম, স্বভাবকোমলা। মাধুরী নিজের মনে হাসল। পুরুষ তাদের কোমল বলে ভাবতে বড় ভালবাসে। মেয়েরা নবনীত

কোমলা হলে তাদের চোখে বড় ভাল লাগে। কিন্তু মেয়েরা যে সব সময় তা থাকে না, থাকতে পারে না, তা কি আর মাধুরী জানে না? তবু না পারলে সেজে থাকতে হয়। ওটা মেয়েদের স্বভাবসজ্জা। মানসী বড় চটপট কথা বলে, রুক্ষতা ওর ভাষায়। মাধুরী কতদিন বলেছে, 'মানু, অমন করিসনে, মেয়েদের অমন স্পষ্টবাদিতা শোভা পায় না। তাদের পক্ষে বরং অস্পষ্টতা ভাল, আড়ালে থাকা ভাল, আর একটু সাজসজ্জা না হলে মেয়েদের মানায় না। তুই যে হাতে কিছু পরিসনে, গলায় কিছু পরিসনে, কানে কিছু পরিসনে, এতটা কাঠখোট্টা ভাব কিন্তু আমার ভাল লাগে না। অমন যদি তোর ধরনধারণ হয় তোকে লোকে বলবে পুরুষালি মেয়ে। তা কি খুব ভাল শোনাবে?' এদিক থেকে মা'র সঙ্গে কিন্তু মাধুরীর মতের মিল আছে। মানসী হেসে বলে, 'দিদি, তোর মতামতের কথা শুনলে তোকে ঠিক দিদিমা বলে মনে হয়। মেয়েদের একেবারে মেয়ে হয়ে থাকবার দিন কি আজও আছে! দিদি, তুইও তো মা-দিদিমার মত ঘরে বসে থাকতে পারিসনি, কি বাবা যে কোন ছেলেকে জামাই করতে চাইলেও তুই তাতে রাজী হয়ে মনের সুখে ঘর-সংসার শুরু করে দিসনি। তুইও অফিসে বেরোচ্ছিস, পুরুষের ভিড় ঠেলে বাসে উঠছিস। তাদের ছোঁওয়া, তাদের তাকানো যে নিকষিত হেম নয় তা জেনেও তাদের সঙ্গে যাচ্ছিস, পাশে বসছিস। মা-দিদিমার যাতে জাত যেত তোর তাতে জাত যায় না, আমারও যায় না। আমি যদি পুরুষালি মেয়ে, তুই-ই বা তা নয় কিসে?'

মাধুরী একটু ভেবে জবাব দিয়েছে, 'দেখ, এ যুগে কাজ আর আমাদের ছেলেদের চেয়ে আলাদা হবে না। কিন্তু কাজ একরকম হলেও আমাদের আকৃতি যেমন আলাদা থেকে যাবে, প্রকৃতিও তেমনি আলাদা থাকবে। আর এইটুকু আলাদা ভাব দরকারও। নইলে ছেলে আর মেয়েতে ভাব হবে কি করে।'

মানসী হেসে বলেছে, 'দিদি, তোর শুধু বই-পড়া বিদ্যে। আমি বইয়ের রাজ্যে বাস করি, কিন্তু বই পড়বার সময় পাইনে অন্তত তোর মত। অত সময় আমার নেই। খুব রুচি আছে তাও নয়। ময়রা যেমন সন্দেশ খায় না, আমিও তেমনি। কিন্তু তোর তো কেবল আলাদা ভাবই দেখলাম, কোন ছেলের সঙ্গে তেমন ভাব জমতে তো দেখলাম না।'

এ কথায় মাধুরীর বুকে যে-আঘাত লেগেছিল মানসী তা টের পায়নি। অবশ্য সে তাকে টের পেতেও দেয়নি। বরং গোপন ব্যথাটুকু কৌতুকের হাসিতে ঢেকে রেখে বলেছে, 'মানসী, আমার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।'

কিন্তু স্কুল-কলেজে পড়ে এবং এতদিন ধরে চাকরি-বাকরি এবং বাইরে

ঘোরাফেরা ও অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কোন ছেলে যে তার জন্যে পাগল হওয়া দূরে থাকুক, একটু অন্যরকম আকৃষ্টও হয়নি। এই ঘটনায় তার বাবা-মা যতই নিশ্চিন্ত থাকুন, আর পাড়াপড়শী, স্কুল-কমিটির কাছ থেকে এর জন্যে যতই সুখ্যাতির আশা থাকুক, এ যে তার নারীত্বের পক্ষে খুব গৌরবের নয় তা কি আর মাধুরী জানে না? তবু কেন মানসী অমন খোঁচা দেয় তাকে? একদিন নয়, ও-ধরনের কথা আরো কয়েকদিন বলেছে মানসী। অবশ্য ঠাট্টা করেই বলেছে। তবু সবরকম ঠাট্টা কি সব সময় সয়? একরকম ঠাট্টাও সয় না।

মানসী হেসে বলেছে, 'তোর ভাবনা আমি কেন সবখানি নিতে যাব দিদি, নিতে পারবই-বা কেন। সেই গুরুদায়িত্বের জন্যে যে তৈরি হচ্ছে, মন দিয়ে চাকরি-বাকরি করছে, ব্যাঙ্কে টাকা জমাচ্ছে, সে ভাবনা আমার সেই ভাবী ভগ্নিপতি ভাবুক।—যে কথা হচ্ছিল। মেয়েরা পুরুষের মত কাজ করবে, কিন্তু তাদের চালচলন বদলাবে না, ভাষাভঙ্গি বদলাবে না, পোশাক-আশাক বদলাবে না, মেয়েরা সেই অজয় অক্ষয় পরিবর্তনহীন ব্রহ্মের স্ত্রী-সংস্করণ হয়ে থাকবে বলে আমার তো মনে হয় না। দিদি, কাজের ধরন পুরুষকেও বদলে দেবে, মেয়েকেও বদলে দেবে, হয়তো পোশাক-টোশাকও অনেকটা একরকম করে দেবে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়?'

মাধুরী ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলেছে, 'কিছুই এসে যায় না?'

মানসী মাথা নেড়ে বলেছে, 'না। পোশাকে একরকম হলেও ওরা আমাদের আলাদা বলে চিনতে পারবে। বিদেশী মেয়েদের মত হয়তো আমরাও একদিন ছোট চুল ছাঁটব। তোর চুলের গৌরব বেশি, যত্ন বেশি, একথা ভাবতে তোর হয়তো কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু একদিন আমাদেরও এসব দরকার হবে। তুই যদি-বা পার পেয়ে যাস, আমার বোনঝি পাবে না। কিন্তু তার লাভাররা তখন তার সেই রূপ দেখে মুগ্ধ হবে। সে ঘাড়ছাঁটা চুলই রাখুক আর আমার মত নিষ্কুন্তলা হয়েই ঘুরে বেড়াক, আমার বোনঝির লাভার নিশ্চয়ই তাকে আমার বোনপো বলে ভুল করবে না। তার চোখের হাসি, তার মুখের হাসি, তার গলার স্বর, তার ভালবাসার ধরন নিশ্চয়ই তাকে ধরিয়ে দেবে যে, সে মেয়ে। তার জন্যে তাকে এখনকার স্ট্যাণ্ডার্ডের মেয়েলি মেয়ে না হলেও চলবে।'

মাধুরী ছোট বোনের সঙ্গে তর্কে পারবে না। কিন্তু মন সায় দেয় না তার। হার মেনেও হার মানতে চায় না।—'তুই তাহলে বলতে চাস মেয়েদের আলাদা করে লালিত্য-লাবণ্যের দরকার নেই?'

মানসী জবাব দিয়েছে, 'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার বেশি দরকার নেই। লালিত্য যদি আসে আপনিই আসবে, লাবণ্য যদি থাকে আপনিই থাকবে। জানি, একথা তুই মানতে পারবিনে। তোর স্বভাব আলাদা। তা হল মৃদুনি

কুসুমাদপি। বেশ তো, তুই তোর ভাবী বরের গলায় সীজন অনুযায়ী কখনো বেলফুলের, কখনো গাঁদাফুলের মালা হয়ে থাকিস। আমি যদি কারো হাত ধরি, নিশ্চয়ই সে হাতের তরবারি হব।'

মাধুরীও ঠাট্টা করতে ছাড়েনি। হেসে বলেছে, 'আজকাল তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করে যাত্রার দলের বীরেরা। তুই তোর বীরের হাতে বন্দুক কামান—উঁহু, তাও প্রায় অবসোলিট হবার জো হয়েছে, তুই তার হাতে হবি এটম বম্ব, হাইড্রোজেন বম্ব। খবরদার, একটু কম মারাত্মক হলে কিন্তু চলবে না।'

মানসী বলেছিল, 'দেখা যাক।'

আজ মাধুরীর মনে হচ্ছে, অসীম কি সেইরকমের বীর যে নারীকে তরবারির মত ব্যবহার করতে জানে, কি তরবারি হিসেবেই পেতে চায়? পুলিসের কাজ করলেও অসীম কি বন্দুক ধরতে জানে, কি সেদিকে তার কোন আগ্রহ আছে? বোধ হয় না। মাধুরী অসীমকে যতদূর চিনেছে সে তেমন ধরনের বীর না। মানসী তার বীর পুরুষকে যত রণসাজেই সাজাতে থাক সে সজ্জা তার গায়ে মানাবে না। মানসী তা কি নিজেই জানে না? কিন্তু তবু যেন মেনে নিতে পারে না সে। কেবল খুঁৎখুঁৎ করে, কেবল খুঁৎ ধরে। যে-সমাজে পুরুষ নিজের রুচি অনুযায়ী মেয়েকে গড়ে, তার নিজের মনের গড়নের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে মনোরমা করে তোলে, সেই সমাজে, সেই দেশে বাস করেও মানসী যেন তার ভালবাসার পুরুষকে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কল্পনার প্যাটার্ন দিতে চায়।

মাধুরী কতদিন তাকে বলেছে, 'মানু, সব মানুষ সমান হয় না। সব পুরুষ বীরপুরুষ হয় না।'

মানসী বলেছে, 'কী যে বাজে কথা বলিস দিদি। যে পুরুষ বীর নয়, সে পুরুষই নয়।'

মাধুরী অবাক হয়ে গেছে। যাকে ভালবাসা যায় তাকে যে অন্যের কাছে তুচ্ছ করা চলে, খাটো করা চলে তেমন ধারণা মাধুরীর ছিল না। সে ভাবে, 'যাকে ভালবাসব তাকে শ্রদ্ধা করব, সেই শ্রদ্ধা যদি তাকে না দিতে পারি তাহলে কত কি যে অদেয় থেকে যাবে তার আর ঠিক নেই।' কিন্তু মানসীকে দেখে যেন মনে হয় ওর এই তীব্র বাসনা-ভরা ভালবাসার মধ্যে অদ্ভুত ধরনের ঘৃণা, অনুকম্পা আর অশ্রদ্ধার খাদ মিশানো আছে। তাতে কোন রসায়নের সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা মাধুরী জানে না। কিন্তু ওদের সম্পর্ক যে জটিল হয়েছে তা বেশ বুঝতে পেরেছে। মাধুরীর মনে হয়, হয়তো এই জন্যেই মানসী চট করে বিয়েতে রাজী হচ্ছে না। দিদির বিয়ের সমস্যা এবং আরো পাঁচটা পারিবারিক দায়িত্বকে জুতসই অজুহাত হিসেবে খাড়া করে রেখেছে। ওর মনে যদি কোন দ্বিধা না থাকত তাহলে মানসীও দাদা-বউদির মত পালিয়ে

গিয়ে, অন্য কোন কথা বিচার-বিবেচনা না করে অসীমকে বিয়ে করে ফেলত। সেই ভালবাসা হল বন্যার স্রোতের মত। সেই স্রোতে বাপ-মা, ভাই-বোন, জাত-কুল, মান-সম্মান কুটোর মত ভেসে যায়। তেমন করে ভেসে যেতে কেমন লাগে মাধুরী জানে না। কিন্তু সেই ভেসে যাওয়ার কথা পড়তে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে; সেই ভেসে যাওয়া, ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া বন্যাস্রোত দেখেও আনন্দ। মাধুরীর মনে হয়, মানসী ভালবেসেছে কিন্তু ভেসে যেতে পারেনি। পৌরুষের আদর্শের, বীরত্বের আদর্শের ডুবোপাহাড়ে প্রেমের তরণী আটকে রয়েছে।

মাধুরী বোনকে কতদিন বুঝিয়েছে, 'মানু, বীরত্ব তো একরকমের নয়। সবাই যে যোদ্ধা হবে তার কি মানে আছে?'

মানসী হেসে বলেছে, 'দিদি, তুই কি সত্যিই ভাবিস আমি ওকে আর্মিতে ভর্তি হতে বলেছি, বন্দুক হাতে নিয়ে ও সীমান্ত রক্ষা করুক তাই চাইছি? আর্মিতে নয়, নেভিতে নয়, এয়ারফোর্সে নয়, আমি তাকে কোথাও যেতে বলিনে। আমি এমন কথাও তাকে বলিনে, তোমাকে পাঁচ শ' টাকা, সাত শ' টাকা কি হাজার টাকা মাইনের চাকরি এখনই করতে হবে। অবশ্য টাকাটা যে সংসারে তুচ্ছ না, ঘর-সংসার করতে হলে দরকার আছে, সেকথা সেও জানে আমিও জানি। আমার কথা, যে-চাকরি তার ভাল লাগে না, যে কাজ তার যোগ্য নয়, সে কাজ সে ছেড়ে দেয় না কেন? পৃথিবীতে আর কি কোন কাজ নেই, যে কাজ তার যোগ্য, যে কাজের সে যোগ্য? তার চিঠিগুলি যদি তুই দেখিস দিদি; যে কাজ সে করতে জানে না তার চিঠিতে কেবল সেই কাজের কথা। কেবল আক্ষেপ আর হাহাকার।'

মাধুরী এসব অভিযোগ শুধু হেসেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছে।

মানসী একটু ক্ষোভের সঙ্গে বলেছে, 'হাসিসনে দিদি, হাসবার কথা নয়। আমার কাছে বীরত্ব মানে আত্মপ্রত্যয়। তারই নাম পৌরুষ। সে পৌরুষ পুরুষেরও চাই, মেয়েরও চাই। সে মেয়েকে তুই যদি পুরুষালি মেয়ে বলে নাম দিস আমি আপত্তি করব না। কিন্তু আমি যার ওপর নির্ভর করব সে যদি নিজের ওপর নির্ভর করতে না পারে কি না চায় তাহলে উপায় কি হবে।'

বোনের মনোভাব ভাল করেই জানে মাধুরী। শুধু ভেবে পায় না অসীমের যোগ্যতা সম্বন্ধে এতই যদি হীন ধারণা মানসীর, তাহলে তাকে সে ভালবেসেছিল কোন্ গুণে? না কি গুণে নয়, শুধু রূপে? নিজে কুরূপা বলে আর কিছু না দেখে না শুনে সে কি রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়েছিল? এখন আর ডুব দিতে ভরসা পাচ্ছে না? লোনাজল চোখে-মুখে লাগছে? সমুদ্রের স্বাদ আর স্বাদু নয় এখন? না কি অসীম মানসীর কাছে এখন

আর সমুদ্রই নয়। অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার চৈত্র-বৈশাখের খাল-বিল মাত্র? নামতে-না-নামতেই টের পেয়েছে জল হাঁটুর ওপরে ওঠে না। বৃথাই আর একজন ডেকে চলেছে, 'যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো এই গহনতলে।'

কোন উপন্যাস পড়বার পর তার নায়ক-নায়িকার চরিত্র এবং পরস্পরের সম্পর্কের কথা যেমন নিজের মনে কখনো কখনো বিশ্লেষণ করে মাধুরী, আজও তাই করল। করে একটু তৃপ্তি পেল। সে যেন এই উপন্যাসের কেউ নয়। শুধু এক নিরপেক্ষ পাঠিকা। আলোচনা আর সমালোচনা ছাড়া যার কিছু করবার নেই, যার অন্য কিছুতে আগ্রহও নেই। একটু আগে নিজের মনে যে আসক্তির আভাস পাচ্ছিল মাধুরী, যার জন্যে কখনো এর আগে স্বাদ না পাওয়া, প্রত্যাশা না করা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল মন, আবার পরমুহূর্তে লজ্জায় অনুশোচনায়, অপরাধবোধের অস্বস্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই চড়াই-উৎরাইয়ের হাত থেকে এখন রক্ষা পেয়েছে মাধুরী। এখন শান্ত, শ্যাম স্নিগ্ধ, বৃষ্টিধোয়া সমতল জমিতে বসে নিজে অতলে ডুবে না গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে পারছে।

অসীম আর মানসীর মধ্যে প্রকৃতিগত বিরোধ থেকে এখনকার সম্ভাবিত বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ করতে লাগল মাধুরী। মনে পড়ল, আজ সকালবেলা ওদের দুজনের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা টুকরো টুকরো কথা যেন তার কানে আসছিল। সেই পৌরুষ, বীরত্ব, আত্মপ্রত্যয় আর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে উৎসাহদান। মাধুরী মনে মনে হাসল। অসীম বীর না হোক, মানসী যে বীরাঙ্গনা তাতে সন্দেহ নেই। এই ব্যাপার নিয়েই কি ওদের মনোমালিন্য হয়েছে, কথা কাটাকাটি? ঠিক বাবা-মার মত প্রাচীন স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ নয়, বিয়ের বাঁধনের বাইরে থেকে প্রণয়কলহ? কলহের হাত থেকে কারোরই নিষ্কৃতি নেই। দুজনে বিয়ের এপারেই থাকুক আর ওপারেই থাকুক। সেইজন্যেই কি মানসী অমন গম্ভীরমুখে সাততাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে? আর অসীম এসেছে মাধুরীর সঙ্গে সঙ্গে? মজা দেখার জন্যে, না শোধ নেওয়ার জন্যে? ভাবতে বড় কষ্ট হল মাধুরীর। অসীম স্বাভাবিক আগ্রহে কি তার সান্নিধ্যের লোভে এই কলোনির সীমানা ছাড়িয়েও মাধুরীকে এগিয়ে দেয়নি, সে এসেছে শুধু আর-একজনের কাছে ঘা খেয়ে, সেই ঘাতিনীকে পাল্টা আঘাত করবার জন্যে। সারা পথটায় অসীমের উল্লাস উচ্ছ্বাস হাসি কৌতুক অনুরাগের রঙ যে তার নিজের মনের একটি গভীর ক্ষতকে ঢেকে রাখবার জন্যে, সেই সম্ভাবনার কথা মনে হওয়ায় সেই ক্ষতের জ্বালা যেন মাধুরী নিজের সর্বাঙ্গে অনুভব করল।

কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে অসীম যে তার কাছে প্রেমের মূল্যের কথা

জিজ্ঞাসা করেছিল, তার সেই জিজ্ঞাসার মধ্যে তো কৌতুকের ক্ষীণ আভাসও ছিল না। মাধুরী লক্ষ্য করেছে, তখন অসীমের গলা আবেগে কাঁপছিল। তার দুটি চোখ এই কালো জলের দীঘির মতই গভীর বিষাদে ভরে উঠেছিল। অসীম যে সেই জিজ্ঞাসার জবাব পায়নি, না নিজের কাছে না আর কারো কাছে, সে কথা বুঝতে তো মাধুরীর বাকি নেই। সেই প্রশ্ন যে অসীমের অন্তরের প্রশ্ন, গভীর দুঃখ আর আঘাতের মধ্যে তার জন্ম, মাধুরী তা অনুভব করতে পারে। এ প্রশ্নের জবাব তখন সে দেয়নি। বলেছে, ফের যখন দেখা হবে, তখন দেবে। দেখা তো সন্ধ্যার পরই হচ্ছে দাদার বাসায়। কিন্তু জবাব কি মাধুরী তৈরি করে রেখেছে? তার ছাত্রীরা যেমন জবাব মুখস্থ করে নিয়ে যায়, তারপর পরীক্ষার খাতায় লিখে দিয়ে আসে, মাধুরীও কি তাই করবে? মুখস্থ বিদ্যা ছাড়া মৌলিক উত্তর কোত্থেকে পাবে মাধুরী? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো তার কিছু নেই। মানসীর মনের অবস্থা দেখে মাধুরী প্রেমের স্বতন্ত্র মূল্য সম্বন্ধে আস্থা রাখতে পারে কই? মানসীর আলাপ-পরিচয়ের গণ্ডী অনেক ছড়ানো। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে কাজ করতে গিয়ে ওর সেই পরিচয়ের সীমা আরো বেড়েছে। মানসী সেখানে একজন কেরানী মাত্র নয়, বড় অফিসারের সহকারিণী। কাজে তার দক্ষতা আছে, উৎসাহ আছে, নিষ্ঠায় আন্তরিকতার অভাব নেই। সেখানে সে তরবারি হাতে যোদ্ধাদের দেখতে পায় না। কিন্তু তরবারির চেয়েও শক্তিধর কলম যাঁদের হাতে, তাঁদের দু-একজনের সঙ্গে তার নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কত বিদ্যার্থী, কত বিদ্বান, গবেষণায় রত কত পণ্ডিত সেখানে যাতায়াত করেন। মানসী তাঁদের মধ্যেও পৌরুষ দেখতে পায়। তাঁদের ধনসম্পদে নয়, তাঁদের খ্যাতি কীর্তি নিষ্ঠা আর উদ্যমের মধ্যে। মানসী প্রৌঢ়ের মধ্যে পৌরুষ দেখে, বৃদ্ধের মধ্যে পৌরুষ দেখে, নিতান্ত যে কুরূপ তাঁর মধ্যেও প্রতিভাবান গুণবান পুরুষকে প্রত্যক্ষ করে। আর তাঁরাও নাকি তার রূপ আছে কি নেই তা লক্ষ্য করেন না। তার গুণের তারিফ করেন। নিরালায় চা খেতে ডাকেন। সেই সব গল্প মাধুরীর কাছে এসে করে মানসী। মাধুরী হেসে বলে, 'মুখপুড়ী, তুই তাহলে তাঁদের একজনের প্রেমে পড়ে যা। তাঁদের একজনকেই বিয়ে কর।'

মানসী চটে ওঠে, 'বিয়ে ছাড়া তোর মুখে আর কোন কথা নেই। বিয়ে ছাড়া তুই আর কিছু বুঝিসনে।' মাধুরী বলে, 'বুঝি মানসী, সবই বুঝি। সেই সব নমস্য জ্ঞানীরা গুণীরা আসলে তোকে ভালবাসেন না। ভালবাসেন তোর বয়সটাকে, তোর যৌবনকে। যাঁরা বুড়ো তাঁদের কাছে রূপ আর যৌবনের মানে এক।' ব্রজবাবুর কথা মনে হয় মাধুরীর, সে একটু ভেবে বলে, 'তাঁদের কাছে বোধ হয় গুণ আর যৌবনের মানেও এক।'

মানসী বলে, 'ছি ছি ছি। দিদি, এই তোর দয়ামায়া শ্রদ্ধাভক্তি? মাঝে মাঝে সিনিসিজমে তুই যে আমাকেও ছাড়িয়ে যাস। যাঁরা শ্রদ্ধেয় তাঁদেরও তুই অপমান করিস। ধর, তাঁরা যদি আমার যৌবনকেই ভালবাসেন আর সেই ভালবাসাটা তাঁদের কাজে লাগে তাতে ক্ষতি কি। আমি যেমন আমার গুণ থেকে আলাদা নই—সেই গুণের ছিটেফোঁটা যদি আমার মধ্যে থাকে বলে তুই মানিস—তেমনি আমার বয়স থেকেও তো আমি আলাদা কিছু নই। তাঁরা যদি আমার বয়সটাকেই ভালবাসেন সেও আমাকেই ভালবাসা।'

মাধুরী একটু ভেবে নিয়ে বলে, 'বেশ তো, সেই সব গুণী, কৃতী ব্যক্তিদের তুই দূরে থেকে ভক্তি কর, শ্রদ্ধা কর, যদি কাছে যাবার সুযোগ পাস সেবা কর, শুশ্রূষা কর, কিন্তু যাকে ভালবেসেছিস সে যদি অকৃতীই হয়, তাতে ক্ষতি কি।'

মানসী মাথা নেড়ে বলেছে, 'দিদি, ভালবাসা কি অমন হাওয়ায় ভাসে? আর আমাদের মনটা কি এমনই ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেণ্টে ভাগ করা যে, ভিন্ন ভিন্ন কামরা থেকে একজনকে শ্রদ্ধা করব, একজনকে ভক্তি করব, একজনকে ভালবাসব, একজনকে মন দেব, আর একজনকে অন্য সব দেব? তাই কি হয়?'

মাধুরী বলেছে, 'তা ঠিক হয় না। কিন্তু সংসারে ক'জন মেয়ের স্বামী অসাধারণ গুণবান হয়, ক'জন পুরুষের স্ত্রী অপূর্ব রূপবতী হয়ে ঘর আলো করে? ভালবাসা যদি সব লোকসান, সব ঘাটতিপূরণ না করে তাহলে মানুষ ঘর-সংসার করে কেমন করে?'

মানসী বলেছে, 'তারা শুধুই ঘর-সংসার করে।'

ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে তা ঠিক নয়। ওকেও বুঝতে হবে, অসীমকেও জবাব দিতে হবে। দুজনে মিলে একটি সংসার, একটি পরিবার গঠনের মূল্যও অনেক। রাশ রাশ বই লেখা, ছবি আঁকা, বাড়ি করা, গাড়ি করা, মাথায় পাণ্ডিত্য আর ব্যাঙ্কের টাকা জমানোর চেয়ে ভালবাসার মানুষকে নিয়ে স্কুলের দপ্তরী নির্মলার মত একটি সুন্দর সুস্থ ঘর গড়ে তোলায় আনন্দ কি কম? নির্মলার উঠানেই শুধু ফুল নেই, ঘরের মধ্যেও ফুলের মত একটি ছেলে হয়েছে। সেদিন দেখতে গিয়েছিল মাধুরী। ভারি মিষ্টি চেহারা হয়েছে ছেলেটার। কচি কচি দাঁতও উঠেছে তিনটি।

হঠাৎ মাধুরীর মনে পড়ে গেল, মানসীকে তো ফোন করবার কথা ভেবেছিল,—দাদার ছেলের জন্মদিনে যাওয়ার জন্যে বিশেষ করে বলে দেবে। না গেলে বড় খারাপ দেখাবে। বাবা যাই বলুন, মাধুরীদের তো একটা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। তারা তো আর চিরদিন থাকবে না। চেষ্টাচরিত্র করে পিতা-পুত্রের পুনর্মিলন যত তাড়াতাড়ি ঘটিয়ে দেওয়া যায় ততই ভাল।

ঘড়িতে দেখল পোনে পাঁচটা। পাঁচটা পর্যন্ত মানসী অফিসে থাকে। কোন কোন দিন ছটা-সাতটাও বেজে যায়।

কলোনীর মধ্যে ফোন আছে বড় কণ্ট্রাক্টর ভুবনমোহন মজুমদারের বাড়িতে। শহরে ও শহরের বাইরে শুধু অন্যের বাড়িই তুলে দেননি, নিজেও বিরাট বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন। স্কুল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট ভুবনবাবু একেবারে নিঃসম্পর্কীয় নয় যে একটা ফোন করা যাবে না। এর আগেও দু-একবার ফোন করেছে মাধুরী।

ভুবনবাবু বাড়িতে নেই। তাঁর স্ত্রী আছেন। বেশ মোটাসোটা গয়না-গাটি পরা মহিলা। ফোনের কথা শুনে তাঁর মুখখানা একটু ভার হল।

তিনি বললেন, 'ফোন করবেন? আসুন। এত ঝামেলা পোহাতে হয় এই ফোনের জন্যে। যত রাজ্যের লোক এসে—। আমি কর্তাকে সেদিন বলেছি ফোন তুমি তুলে দাও। আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।' তারপর মাধুরীর দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'তাই বলে আপনি যেন কিছু মনে করবেন না, আপনাকে বলছি না। আপনারা জরুরী দরকারে পড়েই আসেন। তা কি আর জানিনে?'

এসব সত্ত্বেও মাধুরী তাঁর শোয়ার ঘরে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল। ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নম্বর নিল ন্যাশনাল লাইব্রেরীর। ডিপার্টমেণ্ট চাইল।

'হ্যাঁলো, মানসী আছে? মানসী মুখোপাধ্যায়? বেরিয়ে গেছেন? কখন? অনেকক্ষণ? আচ্ছা। ধন্যবাদ।' আস্তে আস্তে রিসিভারটা রেখে দিল মাধুরী। বোঝা উচিত ছিল মাধুরীর। মানসী যে আজ অনেক আগেই বেরিয়ে পড়বে একথা তার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। মিছামিছি সেও মিসেস্ মজুমদারের কাছে হিউমিলিয়েশন স্বীকার করল। উনি তো চার্জটা আর নেবেন না। অথচ এই একটি ফোনের জন্যে মাধুরীর চাকরির রেকর্ড হয়তো একটু খারাপ হয়ে থাকবে।

মিসেস্ মজুমদারকে নমস্কার আর ধন্যবাদ জানিয়ে মাধুরী বেরিয়ে এল। ছাত্রীকে পড়াল দেড়ঘণ্টা। আরো বেশি পড়ালে হতো। বরানগরে যাওয়ার উৎসাহ যেন আর নেই। কিন্তু যেতে হয়। না গেলে দাদা ক্ষুন্ন হবে।

আসবার সময় পুতুল একগুচ্ছ গোলাপের তোড়া দিল হাতে। হেসে বলল, 'মাধুরীদি, এটা খোঁপায় পরুন।'

মাধুরী একটু হেসে বলল, 'পরে পরব।'

রঙীন থলির মধ্যে রঙীন গোলাপগুচ্ছ রেখে দিল মাধুরী।

কিন্তু মনে যেন কোন রঙ নেই।

বাস থেকে বেলগাছিয়ার মোড়ের স্টপটায় আর নামল না। বাড়িতে গেলে অনর্থক দেরি হবে। একেবারে শ্যামবাজারে গিয়ে নামল।

পাঁচমাথার মোড়। ট্রাম, বাস, আলো, লোকজন। কিন্তু এই মুহূর্তে শহরের কোন অস্তিত্ব নেই যেন মাধুরীর মনে। শহর যেন ছায়াশহর। বার বার একটা প্রশ্নই তার মনকে খোঁচা দিতে লাগল। কেন ফোনটা করতে গেল, মিছামিছি, কেন অতখানি ওবলিগেশনের মধ্যে গেল মাধুরী।

স্টেশনারি দোকানে ভিড়। আজ জন্মদিন কতগুলি ছেলের? না কি অন্নপ্রাশন আর বিয়ের তারিখও আছে!

ছোট ছেলেকে উপহার দেবে শুনে সেলসম্যান একগাদা পুতুল খেলনা মোটর গাড়ি আরো কত কি কাউণ্টারের ওপর রাখল। মাধুরীর পছন্দ আর হয় না। জিনিস পছন্দ হয় তো দামে বনে না। বিরক্তির একশেষ। তারপর শেষপর্যন্ত পাঁচ টাকা দিয়ে লাল রঙের বিরাট এক হাতী কিনল মাধুরী। সে হাতীর পিঠে চড়া যায় না। তাকে নিজেই হাতে ঝুলিয়ে বহন করে নিতে হয়।

এখনো বাসে দারুণ ভিড়। একটা ছেড়ে দিয়ে পরের বাসটায় উঠে পড়ল মাধুরী।

আকাশে ফের মেঘ থমথম করছে।

দু'জন ভদ্রলোক লেডিজ সীটে বসে গল্প করতে করতে যাচ্ছিলেন। মাধুরীকে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে।

একজন বললেন, 'আমি তোমাকে তখনই বলেছিলাম ওখানে বোসো না। ও বড় অনিশ্চিত জায়গা।'

তাঁর বন্ধু গম্ভীর স্বরে দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন, 'জীবনে সবই তো অনিশ্চিত।'

একথা শুনে মাধুরীর হাসি পেল। একটু আগে তার মনে যে অস্বস্তির ভাব ছিল, সেই ছোট একটু হাসির ঢেউয়ে তা ভেসে চলে গেল। মাধুরী জানলার দিকে সরে গিয়ে দুই বন্ধুর একজনকে বলল, 'বসুন।'

তিনি তাঁর বন্ধুকে বললেন, 'তুমি বোসো।'

'আরে না না, তুমি বোসো।'

আরো বার দুই দুজনের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় চলল। তারপর একটু দূরে আর একটা সীট খালি হয়েছে দেখে একজন সেখানে চলে গেলেন। আর একজন মাধুরীর পাশেই বসলেন।

ট্রামে-বাসে মেয়েদের আলাদা বসবার ব্যবস্থা রাখা উচিত কিনা এই নিয়ে মাধুরীদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। এখনো হয়। কারণ, সমস্যাটা রয়ে গেছে। রেওয়াজটা উঠেও উঠছে না। অরুণা খবরের কাগজের বিতর্কের আসরে যোগ দিয়েছিল। সে আলাদা সীট রাখবার পক্ষপাতী। নইলে

মেয়েদের অনেক অসুবিধে ভোগ করতে হয়। পুরুষদের মধ্যে সেই উদার বীরত্ব আজকাল আর দেখা যায় না যে, মেয়েদের দাঁড়িয়ে যেতে দেখলে নিজেরা উঠে দাঁড়াবে। অফিসের সময় মেয়েদের বাসে-ট্রামে দেখলে অনেক সহযাত্রীই বিরক্ত হন। তাঁদের মত মেয়েদেরও যে অফিস-টফিস থাকতে পারে, কি বাইরে অন্য দরকারী কাজ থাকতে পারে তা যেন তাঁরা ধারণা করতে পারেন না। তাছাড়া অনেক ভদ্র যুবককে পাশে বসতে দিয়ে অরুণাদের অভিজ্ঞতা প্রীতিকর হয়নি। সেই সহযাত্রীরা শুধু অর্ধাসন পেয়েই নাকি খুশী থাকেননি, পার্শ্ববর্তিনীকেও পুরোপুরি জয় করে নিতে চেয়েছেন। অরুণার অভিযোগের কথা মনে পড়ায় মাধুরীর হাসি পেল। অরুণার নাকি এমন অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে। মাধুরীর কিন্তু একবারও হয়নি। নানা বয়সের নানা শ্রেণীর নানা পোশাকের লোককেই তো মাধুরী পাশে বসতে দিয়েছে, কারো কাছ থেকেই কোন আপত্তিকর ব্যবহার সে পায়নি। যে যার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়েই তো জগৎটাকে যাচাই করে। মাধুরী অরুণাকে ঠাট্টা করে বলেছে, 'ওরা জানে কাকে বিরক্ত করতে হবে। ওরা মুখ দেখলেই টের পায়. চোখ দেখলেই বুঝতে পারে।'

কিন্তু হাসির কথা নয়। শুধু অরুণা কেন, রমলাদি, অনুপমাদি প্রত্যেকেরই নাকি ও ধরনের অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা আছে। তাই তাঁরা সবাই স্বতন্ত্র মহিলা-আসনের পক্ষে। যতদিন না দেশের পুরুষরা ভদ্র হয়, শালীনতা শেখে, মেয়েদের এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে হবে। হেডমিস্ট্রেস বেলাদি কিন্তু মাধুরীর পক্ষে। তিনি বলেন, 'পুরুষদের ওভাবে আলাদা রেখে তাদের ভদ্রতা শেখানো যাবে না। একাসনে বসে এবং একাসনে বসিয়েই তাদের ব্যবহার শুধরে দিতে হবে।' রমলাদি প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'আপনি বলছেন কি। ভদ্রবেশী ওইসব ইতরলোকদের উৎপাত মেনে নেব?' তিনি বলেছিলেন, 'মেনে নেবেন কেন? কী করে ভদ্রভাবে চলতে হয় তাকে শিখিয়ে দেবেন। শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়েই তা শেখানো যায়। চোখের অমোঘ শক্তি; আপনার চোখে শুধু যে সম্মোহনের যাদু আছে, তা ভেবে রেখেছেন কেন। তেমনভাবে তাকাতে পারলে আপনার চোখকে ভয় করবে না, এমন কে আছে।'

বেলাদির কথাগুলিই বেশি মনঃপূত হয়েছে মাধুরীর। সত্যি, ওঁর চোখে যে একদিন সম্মোহনের যাদু ছিল তা বোঝা যায়। সে চোখ যেমন দীর্ঘ তেমনি কালো। কিন্তু সেই চোখকে এখন তিনি শুধু মোহভঙ্গের কাজে লাগিয়েছেন। দুই চোখ এখন শুধু তাঁর কাছে শাসনের অস্ত্র। আর কিছু নয়। বেলাদি কেন এমন হয়েছেন, আঘাত দিয়ে না আঘাত পেয়ে পেয়ে—তা মাধুরী জানে না। কিন্তু বেলাদি পুরোপুরি সিনিক হয়ে যাননি। পুরুষের কাছ থেকে তিনি ঘর পাননি, সংসার পাননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও

পুরুষের নাম শুনলে তিনি কানে আঙুল দেন না। পুরুষ মাত্রেই তাঁর চক্ষুশূল নয়। সে যেখানে শ্রেষ্ঠ, সেখানে তিনি তাকে স্বীকার করেন। মেয়েদের জীবনে তার সান্নিধ্য, সাহচর্য, সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা তিনি বার বার বলেন। বেলাদির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে মাধুরীর। তাঁর ভাষায় মিষ্টতা কম, ব্যবহারে রূঢ়তা বেশি, অল্পেই চটে যান, মেজাজ বড় খারাপ। কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে তিনি যেসব কথা বলেন তার সংগে মাধুরীর নিজের মত বেশ মিলে যায়। তিনি বলেন, 'পুরুষের ছোঁয়া লাগলেই মেয়েদের জাত যায়, তাদের সতীত্ব, শ্লীলতা, মান-সম্ভ্রম নষ্ট হয়, এই সংস্কার ছাড়তে হবে। কই, আপনাদের ছোঁয়ায় তো ওদের জাত যায় না। ওদের সংগে যদি প্রতিযোগিতা করতে চান, ওদের সমান হতে চান, এই ছুঁৎমার্গের শুচিবায়ুতা ছাড়ুন। পুরুষদের এখানেই জিত—ওরা যা মানে না তাই আপনাদের দিয়ে মানিয়ে নেয়। শাস্ত্রের নামে, পারিবারিক শুচিতা ও সমাজ-বন্ধনের দোহাই দিয়ে যত রাজ্যের বস্তাপচা জঞ্জালে ওরা আপনাদের ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর, আঁতুড়-ঘর ভরে রেখেছে। সেই বেড়ি ওরা নিজেরা যে কতবার ভাঙে, তার ঠিক নেই। কিন্তু আপনারা ভাঙলেই দোষ। ওরা বলেছে সেই বাঁধনই আপনাদের ভূষণ, অমনি আপনারা তাই মেনে নিয়েছেন। ওরা বলেছে সেই বেড়ির মধ্যেই যত নারীত্ব, অমনি আপনারা মাথা নেড়ে বলেছেন—ঠিক ঠিক। তাইতো তাইতো তাইতো। আর যে অন্যরকম কথা বলে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, সে আপনাদের চোখে অশুচি, অসামাজিক, অসচ্চরিত্র।'

হেডমিস্ট্রেসের ভাষা তীব্র হয়ে উঠেছে, চোখ ধারালো।

রমলাদি'রা শুর এসব কথা পছন্দ করেননি। তাঁরা ভেবেছেন, পবিত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এ কী সমাজদ্রোহী প্রচারকার্য। আড়ালে এসে তাঁরা বলেছেন, 'ওঁর মতামত তো এমন উগ্র হবেই, উনি তো জীবনে মাধুর্যের স্বাদ পাননি। আমাদের সংসার আর সমাজকে উনি যে ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মত ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবেন, সে আর বেশি কথা কি!'

মাধুরীর কিন্তু হেডমিস্ট্রেসের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সত্য বলে মনে হয়নি। বরং তাঁর কথার মধ্যেই এক ভিন্নতর সত্যের স্বাদ সে পেয়েছে।

হেডমিস্ট্রেস বলেছেন, 'পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্যে তার সঙ্গ আপনারা এড়িয়ে চলবেন না, বরং তার সঙ্গে সঙ্গে চলবেন। তার মূঢ়তাকে আঘাত করবেন, তার লোভকে শাসন করবেন, তার প্রলোভনকে চিনতে শিখবেন। সে যেখানে ঠক প্রবঞ্চক, সেখানে তাকে বার বার ঘা দেবেন, কিন্তু 'ত্যজ দুর্জন সংসর্গ", এ নীতি মেনে নেবেন না। তাহলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। জীবনে আর দোসর মিলবে না। পুরুষের সঙ্গে লড়বার জন্যে আলাদা

মহিলা সমিতি গড়ব, সঙ্ঘ গড়ব, স্বতন্ত্র নারীবাহিনী তৈরী করব, এ পথ আমার পথ নয়। পুরুষের সঙ্গে লড়তে হবে তার স্ত্রী হয়ে, তার প্রণয়িণী হয়ে। খেতে, বসতে, শুতে সেই সংগ্রামই আসল সংগ্রাম।'

রমলাদি বলেছিলেন, 'সে তো দাম্পত্য কলহ। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।'

হেডমিস্ট্রেস জবাব দিয়েছিলেন, 'লঘুক্রিয়া, কারণ আমরা বিদ্যাবুদ্ধিতে খাটো। কারণ জাত যাবার ভয়ে, ঘর হারাবার ভয়ে আমাদের দেশের তরুণীরাও জুজুবুড়ী। এই ভয় ভাঙতে হবে। তার জন্যে মেয়েদের জন্যে আলাদা কাগজ, পুরুষের কাগজে আলাদা পাতা, ট্রামে-বাসে আলাদা সীটের কোন দরকার নেই। তপশীলভুক্ত শ্রেণীর মত তপশীলভুক্ত সেক্স হয়ে থাকা মেয়েদের পক্ষে পরম অপমানের। তার চেয়ে এক বেঞ্চে বসলে যদি শ্লীলতা হানি হয় হোক। আপনার পাশে বসলে কারো যদি আঙুল চুলবুল করে, আপনি তার হাত চেপে ধরবেন, যদি আরো বাড়াবাড়ি করে, ঘাড় ধরে তুলে দেবেন, কিন্তু কক্ষনো আলাদা সীটের দাবি করবেন না। মাঝে মাঝে আমার ভাবনা হয়, মেয়েরা লজ্জায়, ভয়ে, ঘৃণায়, পুরুষের উপর অভিমানে আলাদা নারীস্থানের দাবি না করে বসে!'

শ্লেষে আর ব্যঙ্গে হেডমিস্ট্রেসের ভাষাভঙ্গি তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। তিনি অমনিতে কলীগ্‌দের সঙ্গে বেশি কথা বলেন না, যেদিন বলেন একেবারে বাণীর বন্যায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যান।

মাধুরীর হঠাৎ খেয়াল হল, তার পাশে যে অপরিচিত ভদ্রলোক বসেছিলেন তিনি আর নেই। তিনি যে কখন উঠে চলে গেছেন, তা মাধুরী জানতেও পারেনি। তার মনে পড়ল, সকালবেলায় আরো একজন সঙ্গী তার পাশে বসে গিয়েছিল। হাসিতে গল্পে আলাপে সারাটা পথ সে ভরে রেখেছিল। এখন তার পাশের আসন খালি। শুধু কি পাশের আসনই?

বাসটা তাদের বাড়ির রাস্তা ছাড়িয়ে টালা পার্কের পাশ দিয়ে মণীন্দ্র রোডের মোড় ঘুরে কখন যে বি টি রোডে এসে পড়েছে সে খেয়াল নেই মাধুরীর। বাসে করে নিজেদের বাড়ির পাশ দিয়েই এসেছে, কিন্তু বাড়ি চোখে পড়েনি, বাড়ির কারো কথা মনেও পড়েনি। ভেবে অবাক লাগল মাধুরীর। সে যেন বাসে করে আসছে না, নিজের চিন্তাস্রোতে ভেসে চলেছে। সেই স্রোতধারার তীরে তীরে যেসব ঘাট, গাছপালা, তাদের দেখেও দেখেনি মাধুরী, চিনেও চিনতে পারেনি। চিনতে পারেনি না কি চিনতে সাহস পায়নি? তার মন আজ বার বার এমন করে দলিত মথিত হচ্ছে কেন; সে তো এসব চায়নি।

মল্লিক কলোনী।

বাস-কণ্ডাক্টর জায়গার নাম বলতেই মাধুরী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। ব্যস্তভাবে নেমে পড়ল বাস থেকে। কণ্ডাক্টর না ডেকে দিলে সে এই স্টপ ছাড়িয়ে যেত। একেবারে দক্ষিণেশ্বরের টার্মিনাসে গিয়ে পেঁছিত হয়তো।

নম্বরটা বড় রাস্তার। কিন্তু শঙ্করদের ফ্ল্যাট বাড়িটা গলির ভিতরে গিয়ে। গলি হলেও তার মধ্যে গাড়ি ঢুকতে পারে। শঙ্করের বাড়ির সামনে দুখানা গাড়িকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাধুরী বুঝতে পারল, দাদার অতিথিদের মধ্যে অভিজাত অভ্যাগতরা আছেন। সবাই তার মত বাসযাত্রিনী নয়।

সিঁড়ির মুখেই শঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার গায়ে গেঞ্জি, পরনে পা-জামা নয়, চুলপেড়ে ধুতি। মাধুরী হাসল। দাদা আজ কর্মকর্তা। বাবার যৌবনের যে ফটো আছে বাড়িতে—একটি বাচ্চা ছেলেকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছেন—সেই চেহারার সঙ্গে প্রায় অবিকল মিল আছে দাদার। শুধু গোঁফটাই যা নেই।

শঙ্কর হেসে বলল, 'যাক, তুই এসেছিস। যা ওয়েদার! ভাবলাম, আসতে পারবি কি পারবিনে। আমি তো আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

মাধুরী বলল, 'দাদা, আর কেউ আসেনি?'

জিজ্ঞাসা আর জবাবের মাঝখানের মুহূর্তটি তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

শঙ্কর বলল, 'না। আর কে আসবে! আমাদের বাড়ির আর কাউকে আমি আশাও করিনি।'

বাড়ির কেউ ছাড়া আর কেউ এসেছে কিনা সে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে মাধুরীর বাঁধল। শঙ্করও সেই অনুচ্চারিত প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

শঙ্কর বলল, 'আয়, ভিতরে আয়।'

প্রথম ঘরখানা ভিতরের নয়, বাইরের ঘর। সোফা-সেট চেয়ার-টেবিল সরিয়ে এই ঘর জুড়ে আজ ফরাশ পাতা হয়েছে। সেখানে কয়েকজন ভদ্রলোক গোল হয়ে বসে জোর তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। গোলটেবিল বৈঠক নয়, গোল ফরাশ বৈঠক। দোরের কাছে এসে দাঁড়াতেই আলোচনার মধ্যমাংশ মাধুরীর কানে এল: 'আগে ছিল যত দোষ নন্দ ঘোষ, এখন যত দোষ গভর্নমেণ্টের। আরে মশাই, গভর্নমেণ্ট কি নিরবয়ব কোন বস্তু কি কয়েকটি ব্যক্তি যে, তাদের দোষ দিলেই আপনি রেহাই পেয়ে যাবেন? দেশের গভর্নমেণ্ট যদি খারাপ হয় সে তোমার, সে আমার পাপ। সরকারী আমলা কর্মচারী কে? সে তোমার ভাই-বন্ধু, সে আমার বাপ।'

কমবয়েসী কয়েকজন যুবক পিছন থেকে হেসে উঠল। একজন বলল, 'বাঃ, বেশ মিলিয়েছেন তো। আমরাও তাই বলি। আসলে বাপের সঙ্গেই পাপের মিল। বাপই পরম পাপী এবং চরম তাপী। ছেলেরা নির্দোষ।

ছেলেরা যদি খারাপ হয় সে রক্তের দোষে। তার জন্যে বাপকে সালসা খাওয়াতে হবে, আধুনিক চিকিৎসায় লাখ লাখ পেনিসিলিনের সূচ।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এ পরিহাসে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তিনি তেমনি জোরাল গলায় উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, 'যত দোষ ত্রুটি গলদ সব গভর্নমেন্টের। গভর্নমেন্ট যেন কতগুলি বাড়ি-গাড়ি, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ আর আলমারি। সেখানে যারা বসে কাজ করে তারা যেন এই দেশের মানুষ নয়। তারা বাসের ভিতরে ঢুকে বসেছে আর আমরা বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকবার জন্যে চেষ্টা করছি। আমাদের মধ্যে তফাত শুধু এইটুকু। ভিতরে ঢুকতে পারলে আমাদেরও চেহারা পালটে যাবে। তখন নতুন যারা ঢুকতে চাইবে আমরাও তাদের ঠেকিয়ে রাখব, কথায় না থামাতে পারলে মাথায় লাঠি মারব।'

পিছনের যুবকটি বলল, 'উপমাটা নিখুঁত অমূল্যবাবু। আপনি সাহিত্য পড়ান। উপমা উৎপ্রেক্ষা অনুপ্রাস আপনি মুখ খুললেই বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষের ইতিহাস, তার রাজনীতি, অর্থনীতি শুধু উপমা দিয়ে লেখা যায় না, বোঝানো যায় না, বিচারও করা যায় না। আমি স্বীকার করি, দোষ ত্রুটি শুধু সেক্রেটারিয়েটের বাড়িটির মধ্যেই নেই। তার সিক্রেসি আরো নিগূঢ়। তা দেশের ঘরে ঘরে, জনে জনে প্রত্যেকের মনে বাসা বেঁধেছে। আমরা যারা চারটি পয়সা বাস-কণ্ডাক্টরকে ফাঁকি দিতে পারলে ছাড়িনে, তারাই হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা চুরির সমালোচনা করি। চুরি দুই-ই। একথা ঠিক। কিন্তু অপরাধের মূলটা কোথায় তা আজ খুঁজে বের করুন। পাপটা কি নিচে থেকে ধাপে ধাপে ওপরে ওঠে, না ওপর থেকে ধাপে ধাপে নিচে নামে? সাধারণ মানুষ লোকোত্তর পুরুষদের অনুসরণ করে। এ আপনাদের গীতারই কথা। আপনাদের কথাটা কথাচ্ছলেই বললাম। আসলে গীতা আমাদেরও, শাস্ত্র আমাদেরও।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'মনে তো হয় না। মনে হয়, দু' একটি বিশেষ দেশই আপনাদের দেশ। আপনাদের কাছে আজাদী যেমন ঝুটা, দেশমাতাও তেমনি বিমাতা।'

তাঁর প্রতিপক্ষ বলল, 'ওকথা আমরা মাঝে মাঝে মনের দুঃখে বলি, কারণ মাকে আমরা মাসী বানিয়ে রেখেছি। যদি দোষ না ধরেন বলব, দাসী। দেশ মানে তো দেশের মাটি নয়, দেশ মানে তার জনসাধারণ। সেই সাধারণ লোক অসাধারণদের পায়ে পায়ে চলে। তাদের কাছে পদচিহ্ন কি খুব স্পষ্ট, না সব পথ অনুসরণযোগ্য?'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার মতে তাহলে একজন আদর্শ পুরুষ চাই? একজন সর্বগুণান্বিত ডিক্‌টেটর? তাঁর হাতে একটি শাসনরজ্জু? আর আপনারা সব দড়িবাঁধা [illegible] মত—'

যুবকটি প্রতিবাদ করে বলল, 'মোটেই তা চাইনে। আমরা শুধু ব্যবস্থাটা বদলে নিতে চাই যাতে প্রত্যেকের মধ্যে সেই আদর্শের সাক্ষাৎ মেলে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে—।'

প্রৌঢ় বললেন, 'শুধু ব্যবস্থাটা পালটালেই রাতারাতি সেই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ জ্বলবে?'

প্রতিপক্ষ বলল, 'রাতারাতি কেন হবে—।'

মাধুরী দোরের পাশে একটু আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। এবার বলল, 'দাদা, আমি ভিতরে যাই। দেখি গিয়ে বউদি কী করছে।'

শঙ্কর বলল, 'আরে না না। এখানে আয়। আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিই।'

মাধুরী লক্ষ্য করল, ঘরের মধ্যে দাদার সেই একজন বন্ধু ছাড়া আর সব বন্ধুই আছেন। অবশ্য দু'একজন ছাড়া এ'দের কারো সঙ্গেই মাধুরীর প্রায় পরিচয় নেই। এই মুহূর্তে পরিচিত হবার খুব বেশি আগ্রহও সে বোধ করল না।

কিন্তু শঙ্করের আগ্রহে যেতেই হল। সে আলাপ করিয়ে দিতে লাগল, 'আমাদের কলেজের বাংলার সিনিয়র প্রফেসর অমূল্যরতন চট্টোপাধ্যায়। আর এ হল প্রদোষ দাশগুপ্ত, এতক্ষণ ধরে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছিল। মাস কয়েক হল আমাদের ইকনমিক্স ডিপার্টমেণ্টে এসে ঢুকেছে। —প্রদোষ, আমার বোন মাধুরী।'

অমূল্যবাবু বললেন, 'বেশ বেশ। দেখ তো কি কাণ্ড! শঙ্করের ছেলের জন্মদিনে আমরা সব তর্ক করে মরছি। এর চেয়ে দু' একটা গান-টান হলে বেশ হতো। প্রদোষ, তোমার জন্যেই এই তর্কটা বাঁধল।'

প্রদোষ হেসে বলল, 'যত দোষ দাশ প্রদোষ।'

শঙ্কর তার আরো জনদশেক বন্ধুর সঙ্গে মাধুরীর পরিচয় করিয়ে দিল। তাদের মধ্যে দু' একজন মাধুরীর চেনা। সঞ্জীব সেন আর মৃন্ময় ভদ্র।

সঞ্জীব বলল, 'তর্ক শুনে শুনে কান ঝালাপালা। এবার একটা গান গাও তো মাধুরী। ঘরখানা জুড়োক।'

মাধুরী কোনরকমে ওঁদের হাত এড়িয়ে বউদির শোবার ঘরে এসে ঢুকল। সেখানে মেয়েদের মজলিশে স্বস্তির শ্বাস ফেলল মাধুরী। বেলাদি যাই বলুন, সব সময় পুরুষদের সঙ্গে যদি তাদের থাকতে হতো, দম বন্ধ হয়ে যেত। মেয়েদের দেখলে নিজেদের মধ্যে অতি উৎসাহে ওরা তর্কের ঝড় তুলে দেয়। কিন্তু মেয়েরা যে ওসব তত্ত্ব সব সময় পছন্দ করে না, সেকথা বুঝবার সাধ্য ওদের নেই। মাধুরী নিজের মনেই হাসল।

'বউদি, পিলু কোথায়?'

নন্দিতা বলল, 'পিলু? সে পিসীর আশায় আশায় সাড়ে সাতটা পর্যন্ত জেগেছিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি তো ভাবলাম, তুমি আর এলেই না। অবশ্য আর কেউ না এলেও তুমি যে আসবে একথা আমার মন বলছিল।'

মাধুরী হেসে বলল, 'ঈস, আমার কথা কত যেন মনে থাকে তোমার। এত মন-রাখা কথাও বানিয়ে বানিয়ে বলতে পার।'

নন্দিতা তরুণী অধ্যাপকজায়াদের সঙ্গে মাধুরীর পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। হেসে বলল, 'দিদি এসে দয়া করে ভাঁড়ারের ভার নিয়েছে। তাই ওঁদের কাছে একটু বসতে পেরেছি, নইলে কি আর—। একা একা এত অসুবিধে। তোমার দাদা তা বুঝতে চান না।'

শঙ্করের নাম করতে করতেই সে এসে হাজির। স্বামীকে নন্দিতার নাম ধরে ডাকতে হয় না। মনে মনে শুধু স্মরণ করলেই চলে।

শঙ্কর দোরের কাছে এসে বলল, 'অসীম এসেছে। এতক্ষণে তার সময় হল।'

মাধুরী বলল, 'এসেছে!'

নিজের আগ্রহের জন্য নিজেই লজ্জিত হল। নিজের গলার স্বরটাকে গোপন করতে পারলে যেন বাঁচে।

নন্দিতা বলল, 'আর কে এসেছে?'

শঙ্কর বলল, 'আর কেউ নয়। সে একাই।'

পৃথিবীতে সুখও কি অনন্ত! তারও কি কোন সীমা নেই, পার নেই?

মাধুরী বলল, 'বউদি, চল। পিলুকে দেখি গিয়ে। তার জন্যে এই হাতীটা নিয়ে এসেছি, লাল হাতী দেখলে ও বোধহয় খুব খুশী হবে।'

জানলার ধারে দেয়াল ঘেঁষে যে ডবল-বেডের খাটখানা পাতা রয়েছে তার ওপর অঘোরে ঘুমুচ্ছে পিলু। ছোট্ট পা পাশ বালিশে তোলা। কতবড় নবাব! ঘুমন্ত শিশুর ঠোঁটে হাসি তো নয়, এক ফোঁটা মধু। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল মাধুরী। দাদার ছেলে তো, বড় সুন্দর হবে, বংশের মধ্যে সব চেয়ে সুপুরুষ হবে বোধ হয়। দাদা দেখতে তেমন সুন্দর নয়। তাদের বংশে কেউ রূপ নিয়ে জন্মায়নি। কিন্তু বুদ্ধি করে দাদা একটি রূপবতীকে ঘরে এনেছে। ছিনিয়ে নিয়ে এলেও এনেছে। সেই রূপ পেয়েছে ছেলে। শুধু গায়ের রঙই নয়, মায়ের নাক চোখ ভ্রূ সবই বোধহয় পিলু পাবে। পেয়ে

রূপবান পুরুষ হয়ে উঠবে। মা'র রূপ পেলে পুরুষ নাকি ভাগ্যবান হয়। অসীম কার রূপ পেয়েছে?

নন্দিতা বলল, 'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পিসীকে বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে আর হাসছে। চল, আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে। আকাশের অবস্থা ভালো নয়। ওঁদের বসিয়ে দিই গিয়ে। এক ব্যাচেই সব হয়ে যাবে।'

ঘর থেকে বেরোবার আগে মাধুরী মুখ ফিরিয়ে আর একবার পিলুকে দেখে নিল। লাল নীল হলদে সবুজ চারদিকে ছড়ানো একরাশ পুতুলের মধ্যে পিলু রঙ্গরাজ রঙ্গেশ্বর হয়ে রঙীন স্বপ্ন দেখছে।

ছেলের দিক থেকে চোখ ফিরাতে না ফিরাতে বাপ এসে হাজির।

শঙ্কর বলল, 'মাধু, সঞ্জীবরা কিছুতেই ছাড়ছে না। ওরা তোর একখানা গান না শুনে নাকি এখান থেকে কিছু না খেয়েদেয়েই চলে যাবে।'

মাধুরী বলল, 'তাহলে তোমার বন্ধুদের তাই যেতে বল দাদা। গান আমি কিছুতেই গাইতে পারব না। এ কি তোমার বক্তৃতা যে মুখ খুললেই ঝরঝর করে ঝরে পড়বে? গানের কি স্থান-কাল নেই?'

নন্দিতা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এখন যদি গান-টান নিয়ে বসো তাহলে কখনই-বা খেতে দেবে কখনই-বা কি করবে। আর এর মধ্যে যদি ঝপঝপ করে একবার নেমে পড়ে তাহলেই হয়েছে।'

শঙ্কর বলল, 'কী আর হবে। কেউ তো আর বেশি দূর থেকে আসেনি। যেতে পারবেই। আর মাধুরী আজ এখানে থেকে যাবে।' তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল শঙ্কর, 'তোমার ছেলের জন্মদিনে একখানা গান হবে না সেইটাই কি ভালো?'

মেয়েদের মধ্যে দ্বিমত দেখা গেল। কেউ কেউ যাওয়ার জন্য ব্যস্ত: ছেলেমেয়ে ফেলে এসেছে। ওসব পাট যাদের হয়নি, কি হতে দেওয়া হয়নি তারা গান শুনতে চায়।

শেষ পর্যন্ত দাদার মুখ চেয়ে মাধুরীকে বাইরের ঘরে এসে হারমোনিয়ম সামনে নিয়ে বসতেই হল।

সঞ্জীব অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'বেশ বেশ। এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। মাধুরী, তোমার গান শুনিনে এক যুগ হয়ে গেল।'

মৃন্ময় পাশ থেকে টিপ্পনী কাটল, 'তাহলে দ্বাপরে শুনেছিলে বল? দ্বাপরে তুমি কোন্ মূর্তিতে ছিলে সঞ্জীব? সুবল না সুবলসখা?'

কেউ কেউ হাসল। মাধুরী লক্ষ্য করল, অসীমের মুখেও হাসি ফুটেছে। এতক্ষণ তাকে যেন বিষণ্ণ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কেন? মানসীর সঙ্গে সারাদিন ঘুরে ঘুরেই কি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে অসীম? অমন ঘোরায় কি শ্রান্তি আসে? মানসীকে কেন সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি? সেও কি

শ্রান্ত? না কি দুজনে একসঙ্গে আসতে লজ্জা পেয়েছে? কার জন্যে লজ্জা? কার কাছে লজ্জা?

পুরোন বন্ধুত্বের সুবাদে সঞ্জীব একটু এদিকে এগিয়ে এসেছে। হেসে বলল, 'হে মাধবী দ্বিধা কেন? হে মাধুরী দ্বিধা কেন? গান শুরু হোক।'

মেয়েরাও এসে আসরের ডানদিকে জড়ো হয়ে বসেছে। তর্কবিতর্কের ভয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল, গানের নাম শুনে তারা ফের ধরা দিয়েছে। গানে কি সবাইকে ধরা যায়?

মাধুরী বলল, 'কী গাইব?'

মৃন্ময় হেসে বলল, 'হেথা আমি কি গাহিব গান?'

সঞ্জীব বলল, 'না, ও গান নয়। রবীন্দ্র-সংগীতই হোক।'

শঙ্কর দোরের পাশে দাঁড়িয়েছিল, বলল, 'একখানা জন্মদিনের গান-টান ধর না।'

মৃন্ময় হেসে বলল, 'কেন, তোমার ছেলের জন্মদিন বলে? তোমার ছেলে কি রবীন্দ্রনাথ হয়ে জন্মেছে না কি?'

ঘরের অনেকেই জোরে হেসে উঠল। শঙ্কর ভারি অপ্রতিভ হল।

অমূল্যবাবু সহকর্মীকে রক্ষার জন্যে এগিয়ে এলেন। যেন কলেজের ক্লাস নিচ্ছেন তেমনি বিশুদ্ধ ভাষায় উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, 'শঙ্করের ছেলে রবীন্দ্রনাথ হয়ে জন্মায়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা সবাই জন্মেছি। আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি নবজন্ম নিয়েছে। আরো কয়েক পুরুষ ধরে নবজাতকরা তাঁর কাব্যে গানে এমনি করে পুনর্জন্ম নেবে।'

প্রদোষ ফস করে বলে উঠল, 'নিজের পুরুষের কথাই বলুন। উত্তর পুরুষ সম্বন্ধে অত অসংকোচে দৈববাণী করবেন না। রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা যেমন রস পাচ্ছি, আমাদের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রেরা তা না পেতেও পারে।'

অমূল্যবাবু বললেন, 'তা যদি না পায় তাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। এই দুশ্চিন্তা তোমাদের মনে এসেছে, কারণ সেই রস তোমরা নিজেরাই পাচ্ছ না। তোমরা কি তেমন নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা কর যে পাবে? আমার তো মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এখনো আধুনিকতম। তোমরা তাঁর চেয়ে এক পাও এগিয়ে যেতে পারনি। না পেরেছ কোন নতুন সম্পদ বাড়াতে, না পেরেছ কোন নতুন মূল্য সৃষ্টি করতে। একদল তাঁকে দুর্বলের মত অনুকরণ করে যাচ্ছ, আর একদল প্রগতির নামে, অতি আধুনিকতার নামে যতসব উৎকট বিকট—।'

প্রদোষ তাঁকে বাধা দিয়ে হেসে বলল, 'এবং কটকট। আর কি কোন অনুপ্রাস আছে অমূল্যবাবু? বোধহয় নেই। উপমাটা যেমন যুক্তি নয়, গালাগালটাও তেমনি কুযুক্তি। একটু আগে আপনি নালিশ করছিলেন, আমরা নাকি স্বদেশে বাস করিনে। সে কথা সত্যি নয়। কিন্তু আপনাদের

মধ্যে অনেকেই যে স্ব-কালের খোঁজখবর রাখেন না, নিজেদের সেই যৌবন-কালেই প্রবাসী হয়ে রয়েছেন তার কি হবে? সেইজন্যেই আধুনিক কাব্য আপনাদের কাছে অপাঠ্য, আধুনিক সংগীত অশ্রাব্য, আধুনিক চিত্রকলা দেখবার অযোগ্য। আপনারা ভাবেন আপনাদের যৌবনেই সমস্ত আধুনিকতা শেষ হয়েছে, তারপরে কাল আর এগোয়নি। পৃথিবীর সমস্ত ঘড়িই যেন বারোটা বেজে বন্ধ হয়ে আছে, আপনাদের সেইরকম ধারণা।'

অমূল্যবাবু বললেন, 'তুমি ভুল করছ। ঘড়ি বন্ধ হবে কেন? আতে দম পড়ছে, চলছেও ঠিক। কথাটা হচ্ছে দাম নিয়ে। আমি বলতে চাই, সময়ের আধুনিকতাই মূল্যবিচারের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। সবচেয়ে যে পরে জন্মাল সে-ই ক্ষণজন্মা, একথা ভাবা ভুল। এমনও হতে পারে, সেও ক্ষণকালের জন্যেই এসেছে।'

প্রদোষ বলল, 'ক্ষণকালের না দীর্ঘকালের সে বিচার করবার অধিকার কার? যিনি দূরে থেকে দেখেন, ভালো লাগবে না বলে আতঙ্কে পিছিয়ে থাকেন, তাঁর অন্তত নয়। তাছাড়া অনেক সময় আজ কাল পরশুর তুচ্ছতার ভিতর থেকেই তরশুর অমূল্য সম্পদ গড়ে ওঠে। নিত্যকালের দোহাই দিয়ে আজ আর কালকে আপনি বাদ দিয়ে চলতে পারেন না।'

গানের আসরকে তর্কের আসর হতে দেখে মেয়েরা লক্ষ্মীর মতই চঞ্চলা হল। মাধুরী লক্ষ্য করল, ছেলেদের মধ্যেও অনেকেই অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। তারা নারায়ণের মত চক্রপাণি না হলেও বার বার ভ্রূ বাঁকাচ্ছে।

সঞ্জীব বলল, 'মাধুরী, এসো আমরা সবাই মিলে কোরাস ধরি, নইলে এ তর্কের তুফান থামবে না। ধর, খর বায়ু বয় বেগে—।'

মাধুরী হেসে বলল, 'তোমরাই ধরে দাও।'

অমূল্যবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'সত্যি আমারই দোষ। কোথায় একটু গান-টান হবে তা নয়, আমরা তর্ক জুড়ে দিয়েছি। আপনি শুরু করুন।'

এর পরে কি আর গানের মেজাজ থাকে? মুড একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সঞ্জীব আর মৃন্ময় নাছোড়বান্দা। ওরা তার গান না শুনে আজ আর ছাড়বে না। কী গান গাইবে তা নিয়েও মতদ্বৈধ। কেউ বলল বাদলদিনের গান, কেউ বলল জন্মদিনের, কারো বায়না অন্য গান শোনবার।

প্রথমে দাদার অনুরোধই রাখল মাধুরী। গাইল, 'তারায় তারায় দীপ্ত শিখায় অগ্নি জ্বলে।'

তারপরে মৃন্ময়ের ফরমায়েশ, 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে।'

শেষ করে উঠতে যাচ্ছিল, সঞ্জীব ছাড়ল না। তার অনুরোধও রাখতে হল। 'চিনিলে না আমারে কি।'

মাধুরী লক্ষ্য করল অসীম কোন ফরমায়েশ করল না, কিন্তু তিনখানা

গানই সাগ্রহে শুনল। মনে হল সে বেশ খুশীই হয়েছে। তার মুখে যে ক্লান্তির মেঘ ছিল তা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে।

গাইবার জন্যে আরো দু'একটি মেয়েকে সাধাসাধি করা হচ্ছে—ভিতর থেকে ডাক এল, খেতে দেওয়া হয়েছে। আকাশে মেঘের ডাকও কানে আসছে। অমূল্যবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

ভিতরের একখানা ঘরে দুই সারিতে আসন পাতা হয়েছে। মেয়েদের পাশাপাশি বসতে লজ্জা, কারো-কারো মুখোমুখি বসতেও আপত্তি।

সঞ্জীব বলল, 'পাশেও নয়, সামনেও নয়, তাহলে আমাদের কাঁধ আর পিঠ ছাড়া ওঁদের কোন আসনই থাকে না।'

শেষ পর্যন্ত সামনের সারিতেই বসলেন ওঁরা।

নন্দিতা বলল, 'মাধুরী, তুমিও বসে যাও। আমি আর দিদি পরিবেশন করব।'

মাধুরী বলল, 'মা আর মাসীই বুঝি ছেলের সব? পিসীরা কি ভেসে এসেছে?'

নন্দিতার দিদি ভাঁড়ার থেকে জোগান দিতে লাগলেন। বউদির সঙ্গে মাধুরীও পরিবেশনের ভার নিল।

সঞ্জীব মৃন্ময় আর অসীম পাশাপাশি বসেছে।

মাধুরী লুচির থালা এগিয়ে নিয়ে যেতে সঞ্জীব বলল, 'ননদ আর ভাজের মধ্যে পটুতা কার বেশি এবার দেখা যাবে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'এর মধ্যে আবার পটুতা অপটুতার কী আছে। বরং তোমরা কে কত খেতে পার তাই দেখব।'

মৃন্ময় বলল, 'শুনলে তো অসীম? কাম্পিটিশনে নাম দিতে রাজী আছ তো? আর কিছু না পারি খেতে পারি খুব। কী বল, কম্পিট করবে?'

অসীম মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'না, আমি কোনরকম প্রতিযোগিতার মধ্যে নেই। খাওয়ার প্রতিযোগিতাই হোক, আর পরার প্রতিযোগিতাই হোক; প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাই হোক আর সন্তরণ প্রতিযোগিতাই হোক।'

সঞ্জীব বলল, 'এই তো অসীমের মুখ ফুটেছে। তুমি বলতে চাও তুমি মোটেই প্রতিযোগী নও, শুধু যোগী? তোমার কোনরকম উপসর্গই নেই?'

পরিহাসরত বন্ধুদের রেখে মাধুরী এগিয়ে চলল।

পদ খুব বেশি করা হয়নি। আবার কমও নয়। লুচি, মুড়িঘণ্টের ডাল, একটা মাছ, মাংস, চাটনি, দই, মিষ্টি। ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করতে লাগল মাধুরী। কোমরে শক্ত করে আঁচল জড়িয়ে নিয়েছে মাধুরী। দ্রুত-হাতে নিমন্ত্রিতদের পাতে পাতে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য জুগিয়ে যাচ্ছে। পেয়টাই শুধু অদেয়।

মাংসের বালতি নিয়ে আবার সঞ্জীবদের কাছে ঘুরে আসতে সে বলল, 'তোমার মহিমা স্বীকার করছি মাধুরী।—দেখ অসীম, দেখ। কে বলবে একটু আগে এই মেয়েই সুর পরিবেশন করছিল, এখন রাক্ষসদের মাংস খাওয়াচ্ছে।'

মৃন্ময় বলল, 'কথাটা কি আমাকে লক্ষ্য করে বলা হল? আগেকার দিনে যারা বেশি খেতে পারত তারাই মেয়েদের বেশি আদর পেত। কিন্তু আজকাল আর সেদিন নেই। হায় অমিতাহারী, তোমার দিন গিয়েছে। এখন যারা খেতে পারে না তাদের পাতের দিকেই মেয়েদের পক্ষপাত বেশি।'

তারপর অসীমের পাতের দিকে একটু আড়চোখে তাকিয়ে মৃন্ময় হেসে বলল, 'দেখেছ, ওখানে কিরকম উজার করে সব ঢেলে দেওয়া হয়েছে?'

মাধুরী লজ্জিত হয়ে প্রতিবাদ করে বলল, 'কী যা-তা বলছ। উনি খাচ্ছেন না, তাই সব পড়ে আছে।'

অসীম হেসে বলল, 'অত কথার দরকার কি। তুমি বালতি সুদ্ধ মৃন্ময়ের পাতে ঢেলে দিয়ে যাও। তাহলে ওর আর কোন আক্ষেপ থাকবে না। মৃন্ময়, তুমি যেভাবে খাচ্ছ তোমাকে হাত ধরে টেনে তুলতে হবে, না হলে উঠতে পারবে না।'

অসীমকে খুশী হয়ে হাসি-পরিহাসে যোগ দিতে দেখে মাধুরীর ভালো লাগল। একটু আগে ও যে বিষণ্ণ আর গম্ভীর হয়ে ছিল তা মাধুরীর মনঃপূত হচ্ছিল না। উৎসবের বাড়িতে এসেও অত ভাবনা কিসের অসীমের? যেখানে সবাই আনন্দিত, উচ্ছ্বাসে মুখর, সেখানে কেউ যদি চুপচাপ গম্ভীরভাবে বসে থাকে তাহলে কি দেখতে ভালো লাগে?

অমূল্যবাবু আর প্রদোষ—বাদ আর প্রতিবাদ, দুজনে এখন পাশাপাশি বসে খাচ্ছেন। তারা কি ইচ্ছা করে পাশাপাশি বসেছেন, নাকি আর পাঁচজনে চক্রান্ত করে তাঁদের অমনভাবে বসিয়ে দিয়েছে, কে জানে। মাধুরী মিষ্টি পরিবেশন করতে গিয়ে ওদের অলক্ষ্যে একটু হাসল। তারপর ফের ঘুরে এল অসীমদের সারিতে।

সঞ্জীব বলল, 'মানসীর কথা হচ্ছিল। সে এল না যে? এর আগে তোমাদের দুই সহোদরাকে একসঙ্গে দেখতাম। আজ যে বিচ্ছিন্ন?'

খুবই সাধারণ পরিহাস। তবু মাধুরীকে তা হঠাৎ বড় আঘাত করল। সেতারে কোন অরসিক যেন বেসুরোয় ঝঙ্কার দিয়েছে। বেদনায় টন টন করে উঠল মন। সত্যি, তারই তো আগে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। মানসীর কথা সবচেয়ে আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। কিন্তু নিজেকে সমর্থন করবার যুক্তিও আছে মাধুরীর। সে কি সময় পেয়েছে যে জিজ্ঞাসা করবে? প্রথমে তো এক গুচ্ছের গান গাইতে হল। তারপর এই পরিবেশন। এ সব

দিতে দিতে কি আর অত কথা জিজ্ঞাসা করা যায়? যদি কিছু জানাবার মত থাকত, অসীম নিজেই কি বলত না?

সঞ্জীবের পাতে একটা সন্দেশ তুলে দিতে দিতে মাধুরী বলল, 'লাইব্রেরী থেকে ওরও তো আসবার কথা ছিল। কিন্তু এল কই!'

তারপর অসীমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে--।' বলেই তাড়াতাড়ি থেমে গেল।

অসীম বলল, 'না, আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।'

এ প্রসঙ্গ এখানেই চাপা দেওয়া ভালো। সঞ্জীব আর মৃন্ময় তো কেউ কম চালাক না; হাঁ করতেই পেটের কথা সব বুঝে ফেলে।

পেটুক মৃন্ময়কে দুটো সন্দেশ দিল মাধুরী। বলল, 'দই খাবে আর একটু? খাও না, নিয়ে আসছি।'

খানিক বাদে সবাই উঠে পড়ল। মৃন্ময় বলতে লাগল, 'শঙ্কর, আশীর্বাদ করি তোমার এমনি আরো গুটি তিনেক ছেলে হোক। আর তাদের প্রত্যেকের জন্মদিন পালন করার সুমতি হোক তোমার। তাহলে বছরে চারবার আমাদের বাঁধা বন্দোবস্ত থাকবে। যা খাওয়ালে! জীবনে কোনদিন ভুলব না। লোকে আজকাল নিজের বিয়েতে এমন খাওয়ায় না হে। আর তো ছেলের জন্মদিন।'

সঞ্জীব বলল, 'খাওয়াবে না? নিজের বিয়েতে খাওয়ায়নি, ছেলের অন্নপ্রাশনে খাওয়ায়নি, জন্মদিনটাও যদি বাদ দিত তাহলে কি ওকে আস্ত রাখতাম নাকি আমরা?'

মৃন্ময় বলল, 'ও, তিনটেয় মিলে? তাহলে কিন্তু খুব বেশি হয়নি। তাহলে কিন্তু আমি কথাটা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

সবাই হেসে উঠল। তারপর ফের বসল গিয়ে বাইরের ঘরে। পানের বাটা সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নন্দিতার দিদি অমিতার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বেশ মোটাসোটা চেহারা। তাই দেখে শঙ্কর আড়ালে বলে, 'অপরিমিতা।' ছেলেমেয়ে হয়নি। জরুরী কাজে স্বামী আসতে পারেননি। নিজে এসে বোনের সব করে দিচ্ছেন। দুই বোনে বেশ ভাব। এরই মধ্যে মাধুরীর সঙ্গে বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে।

তিনি বললেন, 'মাধুরী, তুমি এবার খেয়ে নাও। রাত অনেক হল।'

মাধুরী বলল, 'অমিতাদি, আমার কিন্তু এখন ইচ্ছে করছে না।'

অমিতা বললেন, 'দিয়ে-টিয়ে উঠলে অমন হয়। তাই বলে তুমি না খেলে কি আর চলে।'

শেষ পর্যন্ত মাধুরীকে ওদের সঙ্গে বসতে হল।

বসবার ঘরের কলরব ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল। শঙ্করের

বন্ধুদের মধ্যে যারা জোড়ে এসেছিল, তারা আগেই বিদায় নিয়েছে। এবার বিজোড়রাও খসে পড়তে লাগল।

খেয়ে উঠে একটা পান মুখে দিয়ে মাধুরী বাইরের ঘরে এসে দেখল, সবাই চলে গেছে, শুধু দাদা তার পুরোন বন্ধুর সংগে বসে গল্প করছে।

মাধুরী বলল, 'দাদা, আমি এবার পালাই। রাত দশটা বেজে গেল।'

শঙ্কর বলল, 'বৃষ্টি পড়ছে যে। কি করে যাবি। আজ বরং এখানে থেকে যা।'

মাধুরী বলল, 'না দাদা, বাড়িতে বলে আসিনি। শেষে এই নিয়ে অশান্তি হবে।'

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলল, 'আচ্ছা তাহলে যা। আমার ছাতাটা নিয়ে যা।'

পাশের ঘর থেকে নিজের ছাতাটা এনে মাধুরীর হাতে দিল শঙ্কর।

মাধুরী হেসে বলল, 'ও ছাতা বরং তোমার বন্ধুকে দাও। আমি বউদিরটা নিচ্ছি।'

নন্দিতা বলল, 'ঈস্, এই জলবৃষ্টির দিনে দুটো ছাতাই তোমাদের দান করে বসি আর কি। বাস-স্টপ অবধি একটাতেই বেশ যেতে পারবে।'

ঘুমন্ত শিশুকে আর একবার দেখে তার কপালে চুমু খেল মাধুরী। তারপর নন্দিতার দিদিকে প্রণাম করে, দাদা-বউদির কাছে আর একবার হাসি-মুখে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল মাধুরী। রঙীন থলিটি শুধু তার হাতে। ছত্রধর হয়ে অসীম চলল পাশে পাশে।

ছাতার ওপর টপ টপ করে জল পড়ছে।

অসীম বলল, 'সরে এসো, ভিজে গেলে যে।'

মাধুরী সরে এলেও তার আধখানা গা ভিজতে লাগল। বুঝতে পারল অসীমও শুকনো নেই।

গলিটা অন্ধকার। বাস ধরবার জন্যে দুজনে ভিজতে ভিজতে এগোতে লাগল।

সকালে ছাতা ছিল না। তবু ভিজতে হয়নি। এখন ছাতা আছে তবু বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা নেই।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই দুজনে ভিজে প্রায় নেয়ে উঠল। কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার। এরই মধ্যে দোকানঘরগুলিতে পর্যন্ত ঝাঁপ পড়েছে। কোথাও দাঁড়াবার একটু জায়গা নেই।

আশ্রয় শুধু আছে একটি ছাতার তলে। আশ্রয় আছে শুধু আর একজনের ঘন সান্নিধ্যে।

অসীম বলল, 'মাধুরী, এ যে দুজনেরই পালা করে ভেজা হচ্ছে। এর চেয়ে বরং তুমিই ছাতাটা নাও।'

মাধুরী বলল, 'আর পুরো ভেজাটা বুঝি তুমিই ভিজবে। এ কথাটা যদি আমি বলতাম?'

অসীম বলল, 'মনে করতাম, অমৃতং অবলা ভাষিতম্।'

এতক্ষণে বড় রাস্তার বাস-স্টপটা পাওয়া গেল। কিন্তু বাস কোথায়। চারদিকে শুধু ধারাপাতের শব্দ। রাস্তার ওপর দিয়ে শুধু জলস্রোত বয়ে চলেছে। একটু দূরে লাইট-পোস্টের মাথায় বাল্‌বের মধ্যে যে ক্ষণপ্রভা সারা-রাত্রির জন্য বাঁধা পড়েছে, ধারাস্নানে তারও যেন আধখানা চোখ বোঁজা।

এমন জায়গা, এমন বৃষ্টি, এমন একজন পাশে নিয়ে এমন কয়েকটি মুহূর্ত যাপন মাধুরীর জীবনে এই প্রথম, অনাস্বাদিত, অভূতপূর্ব। এত যে ভিজে গেছে মাধুরী, তবু ঠাণ্ডা লাগছে না, শীত করছে না, কোনরকম অস্বস্তি বোধ নেই। যে তীব্র অনুভূতি তার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে তাকে শুধু স্বস্তি বললে, সুখ বললে তার তীব্রতার বিন্দুমাত্র বোঝানো যায় না। মাধুরী মনে মনে বলল, এই বৃষ্টি যেন না থামে, এই রাত্রি যেন শেষ না হয়, এই কয়েকটি মুহূর্ত যেন সারা জীবন পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

অসীম বলল, 'বাস বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোন যানবাহনের তো দেখা নেই। আজ বোধ হয় এই প্রাগৈতিহাসিক নিঃসীম নগরেই আমাদের থেকে যেতে হবে।'

মাধুরী একটু হাসল, 'তাই যদি হয়, তাতেই-বা ভয় কিসের।'

অসীম বলল, 'আমার আর ভয় কি। ভয় তো তোমাকে নিয়ে।'

মাধুরী বলল, 'তুমি যে কত বড় সাহসী জানা আছে। আমাকে নিয়ে তোমার কোন ভয় পেতে হবে না।'

পরক্ষণেই তার মনে হল, ছি ছি ছি, এ-কী বলে বসল মাধুরী। অসীম যদি একথার অন্য কোন ব্যাখ্যা করে! কী মানে করবে সে-ই জানে।

ছাতা মাথায় একটি লোক তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেল।

অসীম বলল, 'লোকটি কীভাবে তাকাচ্ছিল দেখলে?'

মাধুরী লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাও। ওর আবার দেখবার কি আছে। পথের লোক তো ওইভাবে তাকাতে তাকাতেই যায়।'

অসীম বলল, 'আর পাশের লোক বুঝি যায় না। সে আশায় আশায় দাঁড়িয়েই থাকে।'

মাধুরী এবারও বলল, 'যাও।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যে অসীম ছাতাটা তার হাতে গছিয়ে দিয়ে 'এই ট্যাক্সি, ট্যাক্সি' করে ছুটে যাবে তা ভাবতে পারেনি মাধুরী। সে অসীমের তৎপরতা দেখে অবাক হয়ে রইল।

ট্যাক্সিটা রাস্তার উল্টোদিকের একটা গলির মুখে গিয়ে থামল। মাধুরী দেখল, অসীম তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখ কাণ্ড। 'রথচক্র তলে প্রাণ দেবে নাকি।' মাধুরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ড্রাইভারের সঙ্গে খানিকক্ষণ কী যেন কথা বলল অসীম। মাধুরী এখান থেকে শুনতে পেল না। কিন্তু অনুমান করতে পারল, অনিচ্ছুক সারথিকে প্রাণপণে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছে অসীম। শেষ পর্যন্ত রথীকেই বিজয়ী হতে দেখে মাধুরী খুশী হল। ট্যাক্সিটা অসীমকে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে মাধুরীর সামনে এসে দাঁড়াল।

অসীম দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'এসো।'

দুটি অক্ষরের মধ্যে যে অপরিমেয় ধ্বনিমাধুর্য আছে মাধুরী সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হল। সে পাশে এসে বসলে অসীমই ঝুঁকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিল। মাধুরী নিজের ভিজে শরীরে আর একজনের সিক্ততার স্পর্শ পেল। কিন্তু মানুষের দেহের উত্তাপ বৃষ্টিতে কতটুকুই-বা শীতল হয়।

অসীম ড্রাইভারকে বলল, 'গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে যান একটু।'

মাধুরী চমকে উঠে বলল, 'না না, সে কি। বেলগাছিয়া যেতে গঙ্গার ধার পড়বে কিসে। সোজা বি টি রোড দিয়ে বেরিয়ে গেলেই তো হয়।'

অসীম ড্রাইভারকে বলল, 'গঙ্গার ধার দিয়েই ঘুরে যান একটু।'

অসীম বলল, 'সোজা পথ বড় সংক্ষিপ্ত হবে মাধুরী। তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আমরা বোধ হয় আজ গন্তব্য চাইনে, শুধু গমনটুকুই চাই। তাই যত ঘুরপথ হয় ততই ভালো।'

মাধুরী ভয়ার্তের মত বলল, 'না না, চল সোজা পথেই ফিরে যাই। এই ভিজে কাপড়-চোপড়ে বেশিক্ষণ থাকলে অসুখ-বিসুখ হবে।'

কিন্তু বৃষ্টির শব্দে তার কথাগুলি এত অস্ফুট হয়ে রইল যে, কি রথী, কি সারথি কারোরই তা কানে গেল না। না কি কথাগুলি মাধুরী শুধু বলবে মনে করেছে, সত্যি সত্যি উচ্চারণ করেনি, করতে পারেনি?

অসীম নিরুত্তর থাকায় তাই মনে হল।

ট্যাক্সি কোন্ দিকে কোন্ পথে যাচ্ছে মাধুরী তা চিনতে পারল না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারল, এ-পথে সে এর আগে আর আসেনি। অসীম প্রাগৈতিহাসিক নগরের কথা বলেছিল, মাধুরীর মনে হল, সত্যিই যেন তাই। মাটির তল থেকে খুঁড়ে বার করা এক পরিত্যক্ত পাতালপুরীর অলি-গলি দিয়ে তারা যে কোথায় যাচ্ছে তা মাধুরী জানে না। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন এক

অলৌকিক স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। এই বৃষ্টি অলৌকিক, অন্ধকার অলৌকিক, অচেনা পথে উদ্দেশ্যহীন যাত্রা অলৌকিক, তার পাশে যে মানুষটি বসে আছে সেও যেন এ-লোকের কেউ নয়।

বৃষ্টির ঝাপটায় গাড়ির সামনের কাঁচের আবরণ অস্পষ্ট হয়ে আসছে. দুদিক থেকে দুটি স্বয়ংক্রিয় বস্ত্রপিণ্ড এসে সেই জল আবার মুছে নিচ্ছে। এই সাধারণ ব্যাপারটাকে পর্যন্ত এ মুহূর্তে অপার্থিব বলে মনে হল মাধুরীর।

'ট্যাক্সি ধরতে গিয়ে কি ভেজাটাই ভিজেছি। তোমার কাছে কোন শুকনো রুমাল-টুমাল আছে মাধুরী? আমার পকেটের রুমালটাও জামা-কাপড়ের মত ভিজে জবজবে হয়ে গেছে।'

মাধুরী একটু যেন চমকে উঠল। আর একজন পার্থিব শরীরী ব্যক্তি যে তার পাশে রয়েছে তা যেন একটু আগেও তার খেয়াল ছিল না। কিন্তু এই চমক তাকে আর ত্রস্ত করে তুলল না। বরং যেন এক নতুন আশ্রয় আর আশ্বাস এনে দিল। এই অন্ধকারে নিরুদ্দেশ যাত্রায় মাধুরী একক নয়, নিঃসঙ্গ নয়, তার দোসর আছে। তুমি যা-ই কর না কেন, যা-ই ভাব না কেন. যেখানেই যাও-না কেন, তোমার দোসর আছে। এর চেয়ে বড় আশ্বাস আর কী আছে জীবনে?

'কোন রুমাল-টুমাল নেই নাকি মাধুরী?'

আছে, মাধুরীর সব আছে। এই মুহূর্তেও যদি তার কিছু না থাকে আর কখন থাকবে?

মাধুরী বলল, 'আমার হাতের রুমাল তো তোমার মতই ভিজে। ব্যাগের মধ্যে আর একখানা আছে কিনা দেখি।'

রঙীন থলিটার সুতো শিথিল করে তার মধ্যে হাত দিল মাধুরী। ভাঁজ করা ছোট একখানা রুমাল বেরোল, আর বেরোল এক গুচ্ছ টকটকে রক্তগোলাপ। বিস্ময়কর, অপ্রত্যাশিত।

আশ্চর্য, এই ফুলের কথা তো মাধুরী একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

অসীম বলল, 'বাঃ, এ ফুল কোথায় পেলে?'

মাধুরী বলল, 'সন্ধ্যাবেলায় আমার এক ছাত্রী দিয়েছিল। তাদের টবের ফুল।' তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি নাও।'

অসীম বলল, 'নেব তো, কিন্তু রাখব কোথায়?'

মাধুরী হেসে বলল, 'বাঃ রে, কয়েকটা ফুল রাখবার মত ফুলদানি তোমার কি আর নেই?'

অসীম বলল, 'একটি অপরূপ ফুলদানি আমার কাছেই আছে। যদি অনুমতি দাও তো ফুলগুলি সেখানে রেখে দিই।'

মাধুরী কথাটা যে বুঝতে পারল না তা নয়, কিন্তু জবাবটা কী দেবে ঠিক

করতে না করতে নিমেষের মধ্যে অসীম তাকে কাছে টেনে নিল। তারপর একটি একটি করে তোড়ার ফুল খুলে মাধুরীর খোঁপায় গুঁজে রাখতে লাগল।

মাধুরী বাধা দিয়ে বলল, 'এ কি হচ্ছে!'

কিন্তু তার সেই অস্ফুট প্রতিবাদ বৃষ্টিধারার মধ্যে ভেসে গেল।

সর্বাঙ্গ এমন করে কাঁপছে কেন মাধুরীর? এতক্ষণ বাদে কি সে শীতার্ত হয়েছে? কিন্তু যে দেহের সঙ্গে সে আশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে তা তো শীতল নয়, তা আগুনের মতই উত্তপ্ত। না, শৈত্য নয়, মাধুরী নিজের দেহের অনুপরমাণুতে সেই অগ্নির উত্তাপই অনুভব করছে। এ কম্পন কি তা হলে দুটি অগ্নিশিখার? আর এই বৃষ্টি? তার ঠোঁটে গালে চিবুকে চোখের পাতায়—সর্বাঙ্গে এই যে নিরবচ্ছিন্ন সুধাবৃষ্টি হচ্ছে, বাইরের ধারা-পতনের সঙ্গে তার কি কোন মিল আছে? একটু আগে আকাশেরই সেই বাসনা-বৃষ্টি মাধুরী তো সর্বাঙ্গ পেতে নিয়েছে। তাতে কি এমন অসহ্য আনন্দ ছিল? এমন অনির্বচনীয় অনাস্বাদিত সুখ? সেই অবিচ্ছিন্ন দাহ আর শান্তি, গরল আর অমৃত, মৃত্যু আর জীবনের রসায়ন? আকাশ যত বিশালই হোক আর যত বৃষ্টিই ঝরাক, মানুষের দুই ঠোঁটের সেই অপরিমেয় ঐশ্বর্য কোথায় পাবে? বাক্য আর চুম্বনের অফুরন্ত সম্পদ অধর ছাড়া আর কিসে ধরে?

অবশ আচ্ছন্ন মাধুরী যে কতক্ষণ এমনভাবে রইল তা সে টের পেল না। কখন বৃষ্টি থেমে গেল, আঁকাবাঁকা ঘুরপথ ছেড়ে ট্যাক্সিটা কখন যে ফের তাদের চেনা পথ, সোজা পথ ধরল মাধুরী তাও খেয়াল করতে পারল না। শুধু কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে এনে খানিকটা সরে বসল। ভিজে আঁচল দিয়ে নিজের মুখখানা ভালো করে মুছে নিল মাধুরী। কিন্তু তাতে কি সব দাগ মোছে?

ছি ছি ছি, ড্রাইভার তো যান্ত্রিক রবোট নয়; এমন নয় যে স্টীয়ারিং ধরবার মত তার দুখানা হাতই আছে, তার ঘাড় ফেরাবার শক্তি নেই, তার দুটি চোখ নেই। চোখের তারায় দৃষ্টি নেই তাতো নয়। ও যদি দেখতে পেত তাহলে কি হতো! দেখেছে কিনা তাই-বা কে জানে। তাহলে লজ্জায় মরে যাবে মাধুরী। গাড়ি থেকে নামবার সময় কী করে ওর দিকে তাকাবে? সে নিজে না তাকালেও ওর দুটি চোখ বন্ধ করবে কী করে।

ড্রাইভার রবোট নয়। তার দু হাত নড়ছে। মুখ নড়ছে, পান চিবোচ্ছে বোধ হয়। কানে একটি বিড়ি গোঁজা। ড্রাইভার যদিও এদিকে চোখ ফেরাচ্ছে না, তবু সে যে জীবন্ত মানুষ, মাধুরীর তাতে কোন সন্দেহ নেই। বরং পাশে যে মানুষটি স্থির হয়ে বসে আছে সে-ই যেন মুহূর্তের মধ্যে রবোট হয়ে গেছে।

তার নড়া নেই, চড়া নেই, ভাষা নেই, ইশারা নেই, যেন কাঠ দিয়ে তৈরি এক মনুষ্যমূর্তি। এই মুহূর্তে বিশ্বাস করা শক্ত যে, একটু আগে ওই দারুতেই দাবাগ্নি জ্বলেছিল; ওই দুটি শান্ত নিশ্চল হাতের চাঞ্চল্যের শেষ ছিল না, ওই দুটি নীরব ওষ্ঠাধরের প্রতিটি স্পর্শে স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হচ্ছিল। এখন সেই মানুষই এমনভাবে চুপ করে বসে, যেন মাধুরীকে সে চেনে না, কি সামান্যই পরিচয় আছে তার সঙ্গে। মাধুরী নিজের মনেই হাসল। কর্মবীর মানুষটি বসে বসে কি ভাবছে এখন? এমন একটা অঘটন কেন ঘটল তার কারণ বিশ্লেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নাকি?

মাধুরীর অনেক কথাই আজ বলবার ছিল। তার স্কুলে যাওয়ার পথে কলোনীতে ঢুকবার সময় যে গুরুতর প্রশ্নটি করেছিল অসীম, মাধুরী ভেবেছিল ফেরার পথে তার জবাব দেবে। প্রেমের মর্যাদা যে কিসে, অসীমের সঙ্গে তাই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করবে। কিন্তু সে সুযোগই হল না। তাকে মুখ খুলতেই দিল না অসীম। এক অপূর্ব কৌশলে সব বন্ধ করে রাখল, দুই ঠোঁট এক করে এক সঙ্গে গেঁথে দিল। একটি শরের নামই কি পঞ্চশর? লক্ষ গুণ বাড়ালেও কি শুধু সংখ্যায় তার তীব্রতা প্রকাশ করা যায়? অসীমের সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি বলে মাধুরীর এই মুহূর্তে আর কোন ক্ষোভ নেই। যে জবাব শুধু সে বাক্যে দিত, তাই কায়মনোবাক্যে দিয়েছে। এর চেয়ে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আর কী-ই বা সম্ভব ছিল? এর চেয়ে সদুত্তর আর কিভাবেই-বা দিতে পারত মাধুরী? আশ্চর্য, সেই দারুমূর্তি আবার তার কাছে এগিয়ে এসেছে। মাধুরীর হাতখানা ফের তুলে নিয়েছে তার হাতের মধ্যে। যে ধৃত তার হাতখানাই কি কাঁপছে, না কি যে ধরেছে তার হাত? নিরাপদ নীড়ের মধ্যে পাখি যখন কাঁপে, তার সে কম্পন কি ভয়ের, না কি তা বুকের মধ্যে হৃদ্‌স্পন্দন, মনের মধ্যে বাসনার শিহরণ? একটু আগে মাধুরী সর্বাঙ্গ দিয়ে সর্বাঙ্গ অনুভব করেছে, সর্বাঙ্গের স্বাদ নিয়েছে। এখন শুধু হাতের সঙ্গে হাতের মিল। কিন্তু একই অঙ্গে সেই সর্বাঙ্গের স্বাদ। কখনো প্রতি অঙ্গের লাগি প্রতি অঙ্গ কাঁদে, কখনো একই অঙ্গে সর্বাঙ্গ এসে বাসা বাঁধে। একটি হাতের মধ্যে যে একটি পুরো জীবনের স্বাদ মেলে, একটি হাত বাড়িয়ে যে একটি সম্পূর্ণ জগৎকে ধরা যায়, এ রহস্য কি কোনদিন মাধুরীর জানা ছিল? কোনদিন কি অনুভব করেছিল যে হাতে হাত দিলেই সর্বস্ব দেওয়া হয়? আর সর্বস্ব দেওয়া মানেই সর্বস্ব পাওয়া?

অসীম বলল, 'মাধুরী, তুমি কি রাগ করেছ?'

কীর্তিধর পুরুষের কথা শোন! এতক্ষণ বাদে তার খোঁজ নেওয়ার সাধ হয়েছে মাধুরী রাগ করেছে কি না। সে কি মুখ ফুটে বলবে রাগ করেনি? সে কি মুখ ফুটে বলবে রাগ করেছে? সে কথা বলবার সাধ্য কি আর আছে মাধুরীর?

'তুমি এত কি ভাবছ বলতো? কার কথা ভাবছ মাধুরী? মানসীর কথা?'

মাধুরী চমকে উঠল। প্রশ্নটা কি পাশ থেকে এল না ভিতর থেকে তা যেন হঠাৎ ঠিক করতে পারল না। মানসী! কোত্থেকে এই শব্দময় তীক্ষ্ণ তীরটি এসে বুকে বিঁধল মাধুরীর। তার অস্তিত্ব তো কোথাও ছিল না সে তো জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাকে পুনর্জীবন কেন দিল অসীম, কেন ওই নাম ফের মুখে আনল? যে মুখ এতক্ষণ মাধুরীর মুখের সঙ্গে মিশে ছিল সে মুখে আর একজনের নাম কেন? পঞ্চশর, তোমার তূণে এই শরটিও ছিল? এই ঈর্ষার বিষাক্ত তীরে তুমিও কি বিদ্ধ হয়ে আছ? না কি মানুষের এই পরম ক্রূর ষষ্ঠ রিপুই তোমার চির সুহৃদ, প্রিয় সহচর?

মাধুরী যেন অসীমকে জবাব দিল না, নিজেকেই বলল, 'তার কথা না ভেবে কি আমরা পারব? সে তো একদিন জানবেই।'

'জানুক। কিছু এসে যায় না মাধুরী। সে আর আমাকে ভালোবাসে না। আমাকে ছেড়ে দিতে তার আর কোন দুঃখ নেই। তার চোখে আমি এখন অকর্মণ্য, অপাংক্তেয় পুলিস কর্মচারী ছাড়া আর কিছু নই।'

অসীমের গলায় এ কী ক্রোধ, এ কী আক্ষেপ, এ কী নৈরাশ্য! তবে সব ছাপিয়ে এ কী তীব্র আবেগ! আর তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি করুণ সুর-তরঙ্গ। অপমানিত, আহত বাসনার এ কি গোপন কান্না না গুঞ্জরণ?

মাধুরী স্তব্ধ হয়ে রইল।

অসীম বলতে লাগল, 'মানুষের কাজটাই তার কাছে বড়। কীর্তিই তার কাছে একমাত্র পরিচয়। তাই সাধারণ একজন পুলিস কর্মচারীকে নিয়ে তার লজ্জার সীমা নেই। তাই একজন খোঁড়া বুড়ো প্রফেসরের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতেও তার এত গৌরব!'

মাধুরী অস্পষ্ট প্রতিবাদের সুরে বলল, 'তুমি এসব কী বলছ!'

অসীম বলল, 'আমি ঠিকই বলছি মাধুরী, সব জেনেশুনেই বলছি। আমি দু-দুবার তাকে ফোন করেছি, পাইনি। অসুস্থ বন্ধুকে কে না দেখতে যায়? কিন্তু কে সারারাত ধরে তার কাছে আটকে থাকে? এর মানে যে কী বুঝতে পারছ না?'

বুঝতে আবার পারেনি মাধুরী? অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছে। কেন আরো আগে বোঝেনি, সেই ধিক্কারই এখন তার মনের মধ্যে বড় হয়ে উঠল। এই লজ্জা সে কি করে ঢাকবে, এই অপমান সে কোথায় লুকোবে? এই মুখ সে কি করে দেখাবে? হাজার বার আঁচল দিয়ে মুছলেও যে এ-চিহ্ন মিলাবে না, হাজার বার চোখের জলে ধুলেও যে এ-ক্ষত শুকোবে না। তার

ঠোঁটে গালে কপালে চিবুকে তো কোন সত্যিকারের প্রণয়-চিহ্ন নেই; এক ব্যর্থ, আহত, লাঞ্ছিত, কামার্ত পুরুষের নিষ্ফল আক্রোশের অশুচি দশন-ক্ষত জ্বলজ্বল করছে। সেই ঔজ্জ্বল্য তার জীবনকে যে ম্লান করে দিল।

হঠাৎ হাতখানা ছাড়িয়ে নিল মাধুরী। সরে এসে জানলার কাঁচে মাথা রাখল। মাথা খাড়া করে রাখবার মত জোর আর নেই তার।

অসীমের ক্ষুব্ধ, বিস্মিত সুর কানে এল, 'এ কী মাধুরী, তুমি কাঁদছ! কী হল তোমার—কী হল মাধুরী!'

মাধুরী আরো সরে, আরো সঙ্কুচিত হয়ে কাঁচের সঙ্গে মিশে যেতে যেতে বলল, 'ছুঁয়ো না, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না।'

একটু আগে মাধুরী হাতে স্বর্গের সুধা পেয়েছিল। তুলে মুখে দিতে না দিতেই তা নিমেষে বিষ হয়ে গেছে।

আশ্চর্য, ট্যাক্সিটা কোন অ্যাকসিডেন্ট ঘটাতে পারল না, পারল না ব্রীজ ভেঙে খালের জলে পড়ে যেতে, মধ্যরাত্রির প্রমত্ত দোতলা বাসটার সঙ্গে ধাক্কা খেতে? কিছুই তার সাধ্যে কি বুদ্ধিতে কুলোল না! নির্বিবাদে মাধুরীদের বাড়ির সামনেই এসে দাঁড়াল।

ট্যাক্সির সাড়া পেয়ে দোর খুলে প্রায় সবাই বেরিয়ে এসেছেন। বাবা, মা, নন্দু, মানসী।

সুহাসিনী বললেন, 'এত রাত করলি যে মাধু। আমরা তো ভেবেই অস্থির।'

মাধুরী মৃদুস্বরে বলল, 'যা জল।'

নন্দু উল্লাসের সঙ্গে বলল, 'ট্যাক্সি করে এসেছ নাকি মেজদি? আমাদের চেয়ে বেশি ভিজতে পারনি। আমরাও ট্যাক্সিতে গিয়েছি, ট্যাক্সিতে এসেছি।'

মাধুরী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'তাই নাকি? কোথায় গিয়েছিলি তোরা!'

নন্দু বলল, 'কোথায় আবার? বরানগরে। দাদার ওখানে। আমি আর সেজদি তোমাদের খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম, একটু আগে তোমরা বেরিয়ে পড়েছ। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বেরোলাম। মনে হল কাশীপুর রোড দিয়ে যে ট্যাক্সিটা চলে গেল, সেটায় তোমরাই আছ। সেজদিকে বললাম, 'আয় আমরা চেজ্ করি। দারোগার পিছনে গোয়েন্দা হয়ে ছুটি। কী মজাদার একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস হতো তাহলে। কিন্তু সেজদির মনে কোন রস-কষ নেই। আমাকে ধমকে ধমকে সোজা বাড়িতে নিয়ে এল।'

মাধুরী লক্ষ্য করল, মানসী নিস্পন্দ পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অসীমও ততক্ষণে সকলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখেও কোন কথা নেই।

সুহাসিনী বললেন, 'যাক, ভালোয় ভালোয় সব বাড়িতে এসে পেঁৗছেছ. এই আমার ভালো। এখন ঘরে এসো তোমরা।'

মাধুরী মা'র পিছনে পিছনে প্যাসেজের ভিতর দিয়ে এগোতে লাগল।

হঠাৎ নন্দু বলল, 'বাঃ, কত বড় গোলাপ পরেছ মেজদি। এ-ফুল কোথায় পেলে!'

মাধুরী জবাব দেওয়ার আগেই মনোমোহন মন্তব্য করলেন, 'শুধু কি ফুল, খোঁপায় ফুলের বাগান বসেছে। চল, ঘরে চল।'

মাধুরী ভেবেছিল, কত হৈ চৈ গোলমালই না জানি হবে। পান থেকে চুন খসলে যে বাড়িতে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটির অন্ত থাকে না, সেই বাড়ির মেয়ে রাত বারটার সময় ট্যাক্সিতে করে অনাত্মীয় এক যুবকের সঙ্গে বেড়িয়ে এল, এ ঘটনার জের দু-একটি বাঁকা কথায়, তির্যক টিপ্পনীতে নিশ্চয়ই শেষ হবে না। সারা রাত ধরে নিন্দা তিরস্কার শাসন অনুশাসনের ঝড় বইতে থাকবে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সূচ বিঁধতে বিঁধতে মাধুরীর কোন অঙ্গে আর তিলমাত্র জায়গা বাকি থাকবে না।

কিন্তু তেমন কিছুই হল না। যে-যার ঘরে নিঃশব্দে শুতে গেল। বাবা কী যেন বলতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু মা ঠোঁটে আঙুল চেপে নিষেধের সঙ্কেত করলেন আর বাবা সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এমন আশ্চর্য ঘটনা এ বাড়িতে বেশি ঘটতে দেখা যায়নি।

নন্দু সেই প্যাসেজের মধ্যে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। বাবা আর অসীমের যে এক ঘরে শোবার ব্যবস্থা ছিল, তাই ঠিক রইল। হাতকড়া পরা চোরের মত অসীমকে বাবার পিছনে পিছনে যেতে দেখে কেমন যেন মায়া হল মাধুরীর। আহা, বেচারাকে সারারাত ধরে জবাবদিহি করতে হবে। যে শোধ বাবা মাধুরীর ওপর নিতে পারেননি, ঘরের দরজা বন্ধ করে গভীর রাত্রে ওর ওপর দিয়ে হয়তো চতুর্গুণ শোধ তুলবেন। বাবার তুলনায় অসীমের গায়ের জোর বোধ হয় এখন বেশি, কিন্তু মনের জোর তো আর নেই। তার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকবে না। তার অসহায়তার কথা ভেবে এই মুহূর্তে ভারি মায়া হল মাধুরীর। অসীম ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ—বলতে গেলে পুরুষ নামেরই যোগ্য নয়। তার জন্যে ব্যথায় মাধুরীর সমস্ত বুক টন টন করে উঠল। আর সেই বেদনার মধ্যে অবসন্ন আধা-মূর্ছিত হারানো প্রেমকে ফের যেন অনুভব করল মাধুরী—গভীর শোকের মধ্যে শ্রান্ত সুপ্ত সান্ত্বনা যেমন আস্তে আস্তে চোখ মেলে, প্রায় তেমনি।

মা মায়া মঞ্জু আর মিনু এক ঢালা বিছানায় শোয়। মাধুরী আর মানসীর জন্যে আলাদা ছোট বিছানা পাতা রয়েছে। বড় হওয়ার পর থেকে ওরা দুই বোন এমনি পাশাপাশি শুয়ে এসেছে। আজ অন্যরকম হবে কেন?

তবু মা জিজ্ঞাসা করলেন. 'মাধুরী, তুই কি আজ এখানে আসবি? মঞ্জুকে ওখানে দেব?'

মাধুরী বলল, 'কেন মা?'

'বিছানা তো ছোট তাই বলছি।'

মাধুরী ভাবল, তা ঠিক। আজ তাদের দুজনের পক্ষে এই বিছানা বড়ই ছোট। কিন্তু একটি বিছানায় যদি তাদের না ধরে, একটি ঘর. একটি বাড়ি, একটি পৃথিবীই কি তাদের ধরবে?

মাধুরী একটু হাসির চেষ্টা করে বলল, 'কী দরকার মা। ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। কেন মিছিমিছি টানাটানি করবে।'

মা তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। মানসীকে বললেন, 'তুই আজ এখানে আয় না।'

মানসী ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কেন? এত রাত্রে শোয়াশুয়ি নিয়ে এত মাথা ঘামাবার এমন কি দরকার পড়ল মা? আমি যেখানে রোজ থাকি সেখানেই থাকব।'

মা একটু হেসে বললেন, 'ছোটবেলায় তুই আমাদের কাছে শোয়ার জন্যে কত কোঁদল করতিস, মনে আছে?'

মানসী বলল, 'আছে।'

তারপর চুপচাপ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

মাধুরী ভিজে কাপড় ছেড়ে আটপৌরে একখানা শাড়ি পরল। একই জোড়ার শাড়ি দুজনে পরে। কে কখন কোন্‌খানা পরে অনেক সময় তা কেউ খেয়াল করে না। কিন্তু আজ মাধুরী বিশেষ করে লক্ষ্য রাখল যাতে ভুলে মানসীর শাড়ি গায়ে না জড়িয়ে বসে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের কাঁটা খুলল মাধুরী। খোঁপার ফুলগুলি খুলে আনল। ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে কাঁটা। আবার কাঁটার সূচীতীক্ষ্ণ মুখে মুখে মধুবিন্দু।

চারদিকে একবার তাকিয়ে সেই ফুলগুলির ওপর দুই ঠোঁট চেপে ধরল মাধুরী। তার হাতের স্পর্শ এতে আছে, তার অধর-স্বাদের ক্ষীণ সাদৃশ্য এতে ধরা রয়েছে।

'কিন্তু এই শেষ। পুষ্পধনু, এই শেষ। তোমার এই ফুলগুলি দিয়ে আমার শেষ শয্যা রচিত হোক।'

ফুলগুলি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল মাধুরী। দুটি ঠোঁটে যতটুকু পীড়ন

করেছিল, পাঁচটি আঙুলে তার চেয়ে হাজার গুণ দলিত করল। তারপর ভাবল, জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু হাতের যদি তেমন নিরিখ না থাকে, মাধুরীর যদি জোর না থাকে? ফুলগুলি যদি বাইরে গিয়ে না পড়ে ফিরে এসে নিজের বুকেই পঞ্চশর হয়ে বিঁধে বসে! তাই দূর থেকে ছুঁড়ে ফেলতে সাহস পেল না মাধুরী, জানলার কাছে এগিয়ে গেল আস্তে আস্তে গলিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হবে। কিন্তু পোড়া মুঠি যে ছাই আলগা হয় না। পাঁচটি আঙুল পাঁচটি ধনু হয়ে হাতের তালুর সঙ্গে মিশে রয়েছে। যেন বুক দিয়ে এক পরম সম্পদ রক্ষা করছে। হতাশ হয়ে মাধুরী বাইরের দিকে তাকাল। ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না শুনতে পেল, অল্প অল্প বৃষ্টি ফের শুরু হয়েছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই. দু'তিন মিনিটের বেশি হবে না হয়তো কিন্তু মনে হল যেন যুগ-যুগান্তর কেটে গেছে, আরো যুগ-যুগান্তর কাটবে আর মাধুরী এই জানলার ধারে অন্ধকার বর্ষণমুখর আকাশের নিচে অন্তহীন প্রতীক্ষায় এমনি চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে।

হঠাৎ কার একখানা হাত মাধুরীর কাঁধে এসে লাগল। সীমাহীন সময়-সমুদ্র ফের একটি বিন্দুতে এসে আবদ্ধ হল।

মাধুরী চমকে পিছন ফিরে তাকাল। না, মানসী নয়; মা, যাঁর কাছে সব দোষের ক্ষমা আছে।

সুহাসিনী বললেন, 'মাধুরী, যা এখন শুতে যা।'

মাধুরী বলল, 'যাই মা।'

মা নিজেই স্যুইচ টিপে বিদ্যুতের আলো নিবিয়ে দিলেন। বললেন 'রাত অনেক হল, এখন শুয়ে পড়।'

মাধুরী বলল, যাই মা।'

তারপর অন্ধকারে ওঁদের বিছানার পাশ দিয়ে, যাতে ছোট বোনদের কারো হাত কি পা মাড়িয়ে না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে, অন্ধকারে পা টিপে টিপে নিজের বিছানায় এসে পোঁছল মাধুরী।

বিদ্যুতের আলো থাকলেও লক্ষ্মীর আসনের কাছে রোজ সন্ধ্যায় পিতলের মুচিতে মঙ্গলদীপ মা রোজ জেবলে দেন। আবার গভীর রাতে যে আলো চোখ জ্বালায়, ঘুম তাড়ায়, সে আলোও নিজের হাতেই নিভিয়ে দিয়ে যান মা। সন্তানের জন্যে কখন আলো চাই কখন অন্ধকার চাই তা তিনি যেমন বোঝেন আর কেউ তা বোঝে না।

মাধুরীর মনে পড়ল, আজ ভোরে মা-ই তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিলেন. আবার এই শেষ রাত্রে তিনিই তাকে ঘুমোতে পাঠালেন। মার মুখ দেখে আজ উঠেছিল মাধুরী। দিন কেটেছে হাসি-কান্নার খেলায়। ঘড়ির পেণ্ডুলামের

মত মন দুলে দুলে নিমেষে নিমেষে সুখ ছুঁয়েছে, দুঃখ ছুঁয়েছে। ঘুমের মধ্যে সেই দোলা কি থামবে? সব চাঞ্চল্য শেষ হবে মাধুরীর?

আশ্চর্য, হাতের মুঠির মধ্যে সেই ফুলগুলি এখনো ধরা রয়েছে। এ ফুল দিয়ে আর কী হবে? এ ফুল নিয়ে এখন কী করবে? বিছানায় রাখবে? ছি-ছি-ছি। কেউ যদি দেখে—ভুল করে ভাববে ফুলশয্যা। এই রাতটুকুর জন্যে বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখলে হয়। কিন্তু সেখানেও যদি কারো চোখে পড়ে? যদি মনের ভুলে ফুলের কথা ভুলে যায় মাধুরী? যে বিছানা তুলতে আসবে, সে-ই দেখে ফেলবে। লজ্জার আর শেষ থাকবে না। তাহলে ফুল এখন কোথায় রাখে? কোথায় লুকোয়? এই মুহূর্তে সেই চিন্তাই বড় হয়ে উঠল মাধুরীর। উঠে যদি আয়নার পিছনে রেখে আসে? মা নিশ্চয়ই ঘুমোননি। টের পেয়ে বলবেন, 'আবার কি খুটখুট করছিস ওখানে?' কী বিড়ম্বনা! ফুলগুলি কিছুতেই ফেলে দিতে পারল না মাধুরী। খেলা শেষ হয়েছে, সঙ্গী চলে গেছে, তবু খেলাঘর ভাঙতে মন চায় না। তবু প্রাণ সেই শূন্য ঘরে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদে। হঠাৎ এক বুদ্ধি মাথায় এল তার। সেই এক মুঠো ফুল ব্লাউজের মধ্যে ছেড়ে দিল। বুকের ওপর কোথায় রাখে মাধুরী? ভাবতে ভাবতে পুষ্পবৃষ্টি, ফের সেই স্পর্শবৃষ্টি অনুভব করল মাধুরী। এর মত নিভৃত গোপন জায়গা আর নেই। দলিত গোলাপগুলি এখানে আজ রাত্রের মত লুকিয়ে থাক। ঘুমোক। ঘুম যদি না পায় নির্ভয়ে কাঁদুক। তাদের সেই কান্না এখন কেউ শুনতে পাবে না। বুকের উত্তাপে ভেজা পাপড়িগুলি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাক, মধুগন্ধ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হোক, মাধুরীর মাথার ফুল এবং মনের একসঙ্গে সমাধি রচিত হয়ে থাকুক।

ঘুম আজ আর আসবে না। ঘুমোতে পারলে ভালো হতো মাধুরীর। সব কিছু ভুলতে পারত। না কি ঘুমের মধ্যে দুর্নিবার তৃষ্ণা আর বাসনা তার পিছনে পিছনে ছুটত? তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধত? ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন সারা-জীবনের বাস্তবের বেশ ধরে ছলনা করত? ঘুমোতেও যে সাহস হয় না মাধুরীর। সেই অলীক স্বপ্নের ফাঁদে ফের যদি ধরা পড়তে হয়! অলীক! কিন্তু অ-রসিক ছাড়া স্বপ্নকে কেউ অলীক বলে? অ-কবি ছাড়া কল্পনাকে কেউ জীবন থেকে বাদ দিতে চায়? রামধনুর রঙ পলকে মুছে যাবে, কিন্তু কেউ তা অপলকে তাকিয়ে দেখে না?

শান্তির জন্যে নয়, স্বপ্নের জন্যেই মাধুরী ঘুমোবে। যা স্বপ্নের মত এসেছিল তা ফের স্বপ্নের মধ্যে আসুক। মাধুরীর মনে পড়ল, গাড়ির মধ্যে অসীম তার হাত ধরেছিল, তাকে কাঁদতে দেখে ফের তাকে বুকে টেনে নিতে চেষ্টা করেছিল। সেই আকর্ষণ কি একেবারেই মিথ্যে? শুধু নেতিমূলক? তারপর ফিরে এসে সকলের জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে মাধুরীর কাছেই তো

দাঁড়িয়েছিল অসীম। নিঃশব্দে সমস্ত লাঞ্ছনা আর অপমান সহ্য করেছিল। সেই একসঙ্গে আসা, একসঙ্গে দাঁড়ানো, একসঙ্গে সহ্য করার কি কোন দাম নেই? আরো যদি কিছু ঘটত অসীম কি তাকে রক্ষা করত না? বাবা যদি মাধুরীকে এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলতেন—অসীম কি তাকে একা ছেড়ে দিত? সঙ্গে যেত না? আর সঙ্গী যদি থাকে তাহলে পৃথিবীর কোন্ স্থানই-বা অগম্য? কোন্ জায়গাই-বা বাসের অযোগ্য? ভালবাসা যদি মেলে তাহলে আর কোন্ কাম্যবস্তু আছে যা ছেড়ে দেওয়া যায় না? বাদ দেওয়া যায় না? প্রেমের মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিল অসীম। প্রেম তার নিজের মূল্যে মূল্যবান। মাধুরী জানে, তা আর কোন কিছুর ওপর নির্ভর করে না, বরং তার ওপরই জগৎ-সংসার নির্ভর করে। সব চেয়ে বড় সমস্যা সেই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখা। যে আগুন ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে উঠল তাকে চিরদিনের মত ভাস্বর করে রাখা। তা যারা পারে তারা কখনো হারে না। যারা পারে না তারাই অর্থ যশ প্রতিপত্তির মধ্যে মৃত প্রেমের সঞ্জীবনী সুধা খোঁজে। কিন্তু ভালোবাসা যাদের কাছে আরো পাঁচটা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা, আরো পাঁচটা আসবাবের একটা মাত্র—তারা কী করে তার সত্যিকারের স্বাদ পাবে? মাধুরীর ভালোবাসা তো তা নয়। তার কাছে ভালোবাসার তুলনা অতল গভীর মহাসমুদ্রের সঙ্গে—সমস্ত জীবনকে যে ধরে রাখতে পারে, ভরে রাখতে পারে; যার বৈচিত্র্যের শেষ নেই, তরঙ্গের অন্ত নেই, বিস্ময়ের পারাপার নেই। সেই অগাধ বিপুল ভালোবাসার ঐশ্বর্য দিয়ে মাধুরী কি আর-একজনের সারাজীবন ভরে তুলতে পারবে না? জয় করে নিতে পারবে না সব ঔদাস্য অবহেলা অনিচ্ছা আর অতৃপ্তিকে? তাই যদি পারে তাহলে আর ভয় কিসের? তাই যদি পারে, তাহলে কেন তুচ্ছ মান-অভিমান, সম্ভ্রম-মর্যাদার জন্যে মাধুরী দূরে সরে আসবে? কি দু'হাতে দূরে সরিয়ে দেবে? জড়িয়ে ধরায় জড়িয়ে থাকায় যে কী অপার্থিব আনন্দ তা যখন মাধুরী জেনেছে তখন কেন সে ইচ্ছা করে বিচ্ছেদ ডেকে আনবে? সমস্ত শক্তি দিয়ে কেন মিলনের সব বাধাকে জয় করবে না?

নিশ্চিন্ত সঙ্কল্প নিয়ে মাধুরী ঘুমোবার জন্য পাশ ফিরে শুতেই মানসীর গায়ে তার হাতখানা গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল মাধুরী। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল। মানসী আছে। মানসী যেন শত্রুপক্ষের মারাত্মক সাবমেরিন। মাধুরীর চেতনার সমুদ্রে অকস্মাৎ এককেবার ভেসে উঠে তার সাধের তরণীকে বানচাল করে দিয়ে যায়। মা আজ দুজনকে এক বিছানায় শুতে দিতে চান নি। কী ভেবেছিলেন তিনি? মাধুরী আর মানসী সেই ছেলেবেলার মত মারামারি করবে? আঁচড়াবে, কামড়াবে, চুলের মুঠি ধরে টানবে? সেই ছোটবেলা আর নেই। কিন্তু তাই বলে ছোটত্ব কি আর গেছে? মানুষের

ভিতর থেকে কোনদিনই কি তা যায়? না, বাইরে মাধুরী আর মানসী কেউ কারো গায়ে আঁচড়টি কাটবে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নখ হবে নখর, শিশুর কাঁচ কচি দাঁত হবে দংস্ট্রা। সেই ধারালো অস্ত্রে তারা পরস্পরকে কেটে ছিঁড়ে কুটি কুটি করবে। না হয় চিরজীবনের মত মুখ-দেখাদেখি বন্ধ করে অনির্বাণ বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। নিজে পুড়বে, আর-একজনকে পোড়াবে। বাইরের আগুন শুধু পোড়ায়, পুড়তে জানে না। কিন্তু ভিতরের আগুন নিজেকে দহন করে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু অন্তরে-বাইরে এই বিশ্ব-ব্যাপী অগ্নিকান্ড কিসের জন্যে? প্রেমের জন্যে? নিজের বোনকে বলি দিয়ে তবে প্রেমের পূজায় বসতে হবে মাধুরীকে। নিজের বোনের সমাধির ওপর এক পরম সুন্দর মিলন-মন্দির গড়ে তুলতে হবে। সে কি মিলন-মন্দির, না নিষ্ঠুরতার জয়স্তম্ভ, নাকি হিংস্র বাসনার শোণিতসিক্ত সৌধচূড়া? সে-চূড়ার ওপর মাধুরীই-বা কতক্ষণ স্থির হয়ে থাকবে? সে-চূড়া কি মাধুরীকেও বুকে পিঠে গেঁথে নেবে না? অশ্রু ঝরাবে না? রক্ত ঝরাবে না?

মানসী তার দিকে পিছন ফিরে উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। মুখ সে ঘুমের ঘোরে আবার ফেরাবে। কিন্তু সেই প্রসন্ন মুখ আর দেখতে পাবে না মাধুরী। সেই স্নিগ্ধ প্রীতিভরা অপূর্ব দুটি চোখ—সেই ইশারা-ইঙ্গিতের সাঙ্কেতিক দুটি চোখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে। তার বদলে চেয়ে থাকবে পাথরে-গড়া দুই কঠিন বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা, যা নড়ে না, চড়ে না, বদলায় না, মমতায় কোমল হয় না, আনন্দে উজ্জ্বল হয় না, দুঃখ-শোকে, সহানুভূতিতে সিক্ত হয় না। সেই কালো কঠিন পাথরের দুটি নির্মম চোখ মাধুরীর দিকে চিরকাল অপলকে চেয়ে থাকবে।

খানিক আগে সিঁড়ির কাছে মানসীর সেই দুটি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে মাধুরী। দুটি চোখ ধারালো দুটি ছুরির ডগা। মাধুরী তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর এক পলক চেয়ে থাকলে যেন মাধুরীর আর পলক ফেলতে হতো না। দুটি ছুরি তার দুই চোখকে বিদ্ধ করত। মাধুরীর যে চোখের পাতা চুম্বনে ভিজেছিল, অশ্রুতে ভিজেছিল, তা রক্তে সিক্ত হতো।

কিন্তু কেন? মানসীর এত বিদ্বেষ, এত হিংস্রতা কেন? সে তো নিজের চোখে কিছুই দেখেনি। শুধু মাধুরী আর অসীমকে একসঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখেছে। কিন্তু সে তো বৃষ্টির জন্যে। সে তো বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে। না হলে তো তারা বাসেই আসত। আর ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে যদি তারা এসেই থাকে, তাতেই-বা এমন কি দোষ হয়েছে? অসীম কি তাদের পারিবারিক বন্ধু নয়? সে মানসীর প্রেমিক না হয়ে যদি স্বামীই হতো, তাহলে কি মাধুরী কোনদিন ভগ্নীপতির সঙ্গে বেড়াতে বেরোত ? আর দায়ে পড়লে এমনি একসঙ্গে ভিজে-পুড়ে গাড়িতে করে ফিরত না?

মানসী যখন কিছুই দেখেনি, শোনেনি, শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে মাধুরীর দিকে অমন জ্বলন্ত চোখে না তাকালেও পারত। শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে ঘৃণায় বিদ্বেষে কথা বন্ধ না করে থাকলেও পারত। তাদের ফিরতে একটু দেরি হতে দেখে মানসীর কি উচিত ছিল অমন হন্তদন্ত হয়ে ট্যাক্সি নিয়ে পিছনে পিছনে ছুটে যাওয়া? মাধুরী তা যেত না, মাধুরী তা পারত না। মানসী অবশ্য মুখে একথা কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, মাধুরীদের খুঁজতেই সে বেরিয়েছিল। বলবে, দাদার ছেলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতেই বেরিয়েছিল সে। কিন্তু একথা কে বিশ্বাস করবে? মাধুরী অন্তত করবে না। মাধুরী কি দেখেনি সেই সকাল থেকে হিংসায় আর সন্দেহে মানসী জ্বলছে? তার সঙ্গে যখনই অসীম হেসে কথা বলেছে, কি একটু বেশি ঠাট্টা-তামাশা করেছে, অমনি ওর মুখ ভার হয়েছে, তা কি মাধুরী লক্ষ্য করেনি? 'তুই ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিস', 'তুই আহ্লাদে আটখানা হয়েছিস', এমন কত বাঁকা-বাঁকা ঠেস-দেওয়া কথাই না মানসী সেই সকালটুকুর মধ্যে তাকে বলেছে। মাধুরীর মনে হল, মানসী যে সারাদিনের মধ্যে অসীমের সঙ্গে আর কোন সংস্রব রাখেনি, ফোন করেনি, ফোন ধরেনি, প্রোফেসর প্রিয়গোপালবাবুকে সেবার নামে বাইরে বাইরে কাটিয়েছে, তা অসীমকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে। কোন্ অপরাধের শাস্তি? না কি অসীম মাধুরীর সঙ্গে বেশি কথা বলেছে, মাধুরীকে দেখে বেশি খুশী হয়েছে, হেসেছে, হাসিয়েছে, তাই। তার বেশি তো কিছু দেখে যায়নি মানসী। কিন্তু ওইটুকুতেই চোখে অন্ধকার দেখে মুখখানাকে অন্ধকার করে গেছে। চিরকালের হিংসুটে মেয়ে মানসী। ওদের একসঙ্গে ফিরতে দেখে মানসী মনে মনে কত জল্পনাই করেছে। যা হয়েছে তাও ভেবেছে, যা হয়নি তাও নিশ্চয়ই ভাবতে বাকি রাখেনি। যদি রাখত, তাহলে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে অমন স্থির হয়ে থাকত না। মানসী এখন শান্ত হয়ে আছে, কিন্তু কাল নিশ্চয়ই জবাবদিহি চাইবে। অসীমের কাছেও চাইবে, মাধুরীর কাছেও চাইবে। অসীম কী বলবে তার ওপর মাধুরীর বলা নির্ভর করে। অসীম কি বলবে তার ওপর তার নিজের পৌরুষ আর মাধুরীর মর্যাদা নির্ভর করে। অসীম যদি সত্য কথা বলতে ভয় না পায় তাহলে মাধুরী তার পায়ের তলায় রঙীন আঁচলের মত অনুরাগ-রঞ্জিত হৃদয়-আসন পেতে দেবে। হোক সে সাধারণ একজন পুলিস-কর্মচারী, হোক সে নামহীন, খ্যাতিহীন, বিত্তহীন দুর্বল পুরুষ। এখন একটি পরীক্ষায় যদি সে উত্তীর্ণ হয়, মাধুরী তাকে জীবনের সব পরীক্ষায় শুধু পাশ-মার্কস্‌ই নয়, ফুল-মার্কস্ দেবে। মানসীর গঞ্জনার জবাবে, তিরস্কারের জবাবে, বিষাক্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের জবাবে অসীম যদি সেই পাথুরে চোখের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে বলতে পারে, 'আমি মাধুরীকে নেব বলেই কাছে টেনে নিয়েছি, তাকে ছাড়া

আমার চলবে না জেনেই তাকে সঙ্গে নিয়েছি।' তাহলে মাধুরীর সমস্ত লজ্জা, দীনতা, দৌর্বল্য সেই সত্যের ঔজ্জ্বল্যে ঢেকে যাবে। অসীম যদি নিজের মুখে তার এক ভালোবাসার মৃত্যু এবং আর-এক ভালোবাসার জন্মের ঘোষণা করতে পারে, তাহলে ধারালো তরবারির নিষ্ঠুর নির্মম অশ্রান্ত রক্তস্নানে মাধুরীর সব কলঙ্ক-কালিমা মুছে যাবে। সেই দিগ্বিজয়ীর গলায় রজনীগন্ধার নয়, শ্বেতস্নিগ্ধ যুঁই-বেল-বকুলের নয়, রক্তজবার মালা হয়ে দুলবে মাধুরী।

'দিদি, তুই এই করলি?'

মাধুরী চমকে উঠল। মানসীর গলা। আশ্চর্য, ঘুমকাতুরে মানসী এখনো এই শেষরাত্রেও জেগে আছে নাকি? এতক্ষণ তাহলে কি ঘুমের ভান করে পড়েছিল! মাধুরী কান খাড়া করে রইল। না, আর কোন কথা নেই। মানসীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবেই পড়ছে। ঘুমন্ত মানুষের যেমন পড়ে। তাহলে কথাটা কি ঘুমের ঘোরে বলেছে মানসী? তাই হবে। নইলে ওর মত জেদী তেজী মেয়ের গলা থেকে তো অমন কাতর-করুণ স্বর বেরোবার কথা নয়। মাধুরী কান পেতে রইল। না, আর কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। আর কোন কথাই মানসীর মুখ থেকে বেরোল না। কিন্তু যেটুকু বেরিয়েছে তাই যে যথেষ্ট। ছোট বোনের মুখ থেকে যে কথাটুকু শুনেছে, তার বুকের ভিতর থেকে অতি গোপনে এই নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে যে কান্নাটুকু উঠে এসেছে, তারই যে ধ্বনি-প্রতিধ্বনির বিরাম নেই। মনের মধ্যে এত যে গিরি-কন্দর লুকিয়ে আছে মাধুরী কি জানত! সেই কন্দরে কন্দরে অজস্র কান্নার ঝরনা ছুটে চলেছে—'দিদি তুই এই করলি, দিদি তুই এই করলি, দিদি তুই এই করলি।'

একটু আগে পাছে অন্ধকারে ছোট বোনদের হাত-পা মাড়িয়ে বসে সেই ভয়ে কত সাবধানে পা টিপে টিপে নিজের বিছানায় এসে শুয়েছে মাধুরী। তার আগে আর-এক বোনের হৃদয় যে দুই পায়ে থেঁতলে দিয়ে এসেছে তা কি তার মনে পড়েনি?

মাধুরীর ইচ্ছা হল ছোট বোনকে এবার নিজের বুকে টেনে নেয়। কিন্তু সাহস হল না। কাল মানসীর যে দিদি ছিল, আজ তো আর সেই দিদি নেই। মানসী যদি জেগে থাকে? কি ঘুম থেকে জেগে উঠে মাধুরীকে দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে দেয়! কি পরম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, ছুঁয়ো না, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না!' ট্যাক্সির মধ্যে মাধুরী আর-একজনকে যেমন বলেছিল, বোনের সেই ঘৃণা কি মাধুরী সহ্য করতে পারবে? মাধুরীর একবার ইচ্ছা হল, ঝুঁকে পড়ে মানসীর মুখখানা একবার দেখে। চেয়ে আছে না চোখ বুজে আছে, একবার দেখে নেয়। এমন লুকোচুরি খেলা দুজনে মিলে এর আগে কত খেলেছে, কতবার নকল ঘুম ভেঙেছে, আসল ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু আজ

তো আর মাধুরীর সে দাবি নেই। তাছাড়া বিশ্বাস কি—দেখতে গিয়ে ঘুমন্ত চোখে দুটি জলের ধারাই দেখবে মাধুরী। সেই ধারা আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেওয়ার অধিকার তো আর তার নেই।

কী করে সেই অধিকার ফিরে পাওয়া যায়? বোনের সেই স্নেহ-সান্ত্বনা নির্ভরতার নিধি সখী-বান্ধবী মেজদিদি ফের কী করে হতে পারে মাধুরী? সব গোপন করে? না সব প্রকাশ করে? তাই করবে মাধুরী। গোপন করবার তো কিছু আর নেই, প্রকাশই করবে। অসীম কিছু বলুক আর না বলুক, মাধুরী সব কিছুই খুলে বলবে। পাওয়ার কথাও বলবে, হারাবার কথাও বলবে, ফুলের কথাও বলবে, ভুলের কথাও বলবে। না, আর কাউকে দোষী করবে না মাধুরী, সমস্ত দোষ নিজের ওপর টেনে নেবে। সে-ই প্রলুব্ধ করেছিল—কথা দিয়ে, হাসি দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে, স্পর্শ দিয়ে, বাসনার রাঙা ফুলগুলি দেহের ডালিতে সাজিয়ে দিয়ে সে-ই আগে সর্বস্ব ধরে দিয়েছিল একথা স্বীকার করবে মাধুরী। তারপর? তারপর, কাল সারাদিন কি দিনই থাকবে? সূর্যের সহস্র কৌতূহলী চোখ তার দিকে দিনভর তাকিয়ে থাকলেও রাত্রির অন্ধকারে সবই নিমীলিত হবে। বাবার চোখ, মার চোখ, অসীমের চোখ, মানসীর চোখ, কারো চোখই আর তখন তার দিকে চেয়ে থাকবে না। তখন সেই গভীর রাত্রে মাধুরী পা টিপে টিপে তেতলায় উঠবে। ব্রজবাবু তাকে ছাদের চাবি দেবেন। তিনি মাধুরীর সব অনুরোধ রেখেছেন, এবারও রাখবেন। তারপর ছাদে দাঁড়িয়ে নির্মল উদার অসীম আকাশের দিকে তাকাবে মাধুরী। কাল রাত্রে নিশ্চয়ই আর এমন মেঘ থাকবে না। মুক্ত আকাশে মুক্তোর মত তারাগুলি জ্বলতে থাকবে। সেই তারাগুলির মধ্যে মুক্তির ইশারা দেখতে দেখতে ছাদের ধারে এগোতে থাকবে মাধুরী। ধীরে ধীরে আলিসার ওপর উঠবে। আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। দেখবে আর ভাববে, দেখবে আর ভাববে। তারপর! তারপর টুপ করে একটি শব্দ হবে। অত রাত্রে কেউ নিশ্চয়ই আর তেতলার জানলায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। নিচে ফুটপাতের কাছে নিজের রিক্‌শার ওপর শ্রান্ত ঘুমন্ত কোন রিক্‌শাওয়ালা যদি সেই সামান্য শব্দে একটু জেগেও ওঠে, সে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মত দেখবে একটি নাম-না-জানা তারা আকাশ থেকে খসে পড়েছে। রাত ফুরোতে না ফুরোতে এমন কত তারাই তো ঝরে যায়। আকাশে তবু তারার শেষ হয় না। বোঝাই যায় না যে, একটি চলে গেছে। মাধুরীও তেমনি করে যাবে।

নিজের মৃত্যুর কল্পনাকে মধুর থেকে মধুরতর করতে করতে, তাকে প্রিয়তমের মত নিজের হাতে সাজাতে সাজাতে মাধুরী আস্তে আস্তে ঘুমের আশ্রয় পেল—যে ঘুমে সাময়িক মৃত্যু, সাময়িক বিরতি, জীবনের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের সাময়িক ছেদ, সাময়িক সন্ধি।

তিন

যত বেশি রাত্রেই শুতে যাক আর যত বেশি রাত্রেই ঘুম আসুক, মানসীর সেই ঘুম রোজ একই সময়ে ভাঙবে। আজও তাই ভাঙল। আজও তার কোন ব্যতিক্রম হল না। আজও ভোর পাঁচটার সময় যখন ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার ছেয়ে রয়েছে, মা'র, ছোট বোনদের, মাধুরীর গভীর ঘুমের নিশ্চিন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস বয়ে চলেছে, মানসীর ঘুম ভেঙে গেল। কিছুদিন আগে একবার ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হয়েছিল মানসীর। ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে সারা গায়ে সে কী ব্যথা। না পারে এ-পাশ ফিরতে না পারে ও-পাশে। আজও সেই ব্যথাটা অনুভব করল মানসী। তফাৎ এই, গায়ের ব্যথা না, জ্বরের ব্যথা না। এ ব্যথার কোন নাম দেওয়া যায় না, বর্ণনা দেওয়া যায় না, এ ব্যথা শুধু সারা মন অসাড় আর আচ্ছন্ন করে রাখে। রোজ ঘুম যখন ভাঙে, একটি নতুন দিন এক নতুন জগতের প্রবেশ-পথ খুলে দেয়। কিন্তু আজ সেই পথ বন্ধ। আজ সেই পথের মধ্যে প্রকাণ্ড এক পুরী হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়েছে। সেই বিশাল প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে কত স্নেহ, কত প্রীতি, কত বিশ্বাস আর তৃপ্তির মধ্যে সে ঘুমিয়ে রয়েছে। নিমেষের ভূমিকম্পে সেই সৌধ আজ ধূলিসাৎ হয়েছে।

মানসী মুখ ফিরিয়ে মাধুরীর ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার তাকাল। পরম শান্তি আর তৃপ্তির মধ্যে যে ঘুমিয়ে রয়েছে। ঘুমোবে না কেন? মানসী যা হারিয়েছে তাই যে পেয়েছে মাধুরী। পেয়েছে, না ছিনিয়ে নিয়েছে? দিদির ঘুমন্ত মুখখানা এখন কী শান্ত নিরীহ আর নির্দোষই না দেখাচ্ছে। ঘুম কি টয়লেটের মত? স্নো আর ক্রীমের মত তা মুখে স্নিগ্ধতা আনে? চোর ডাকাত লম্পট ঘাতক ঘুমিয়ে পড়লে তাদের মুখও কি এমন নিরীহ-নিরীহ দেখায়? আর-এক বিশ্বাসঘাতক তো এই বাড়িতেই ঘুমিয়ে রয়েছে। ঝুঁকে পড়ে দেখলে হতো এই মুহূর্তে সেই মুখখানা কেমন দেখাচ্ছে। কেমন আর দেখাবে? নিরীহ মুখ ঘুমের প্রলেপে আরও নিরীহ হয়েছে। কিছুই ধরতে পারবে না মানসী, বুঝতে পারবে না। যাতে ধরা যায় সেই দুটি চোখ যে বুজে আছে। আসলে মুখ না, চোখই মনের সূচীপত্র। চোখ সমস্ত লোভ লালসা, অসাধুতা অশুচিতা ধরিয়ে দেয়। অসীম জানে না যে চোখ চিরকাল বিশ্বাসঘাতক। মানসী গত ছ' দিনের মধ্যে কতবার যে সেই চোখের চুরি ধরে ফেলেছে তা তস্কর টের পায়নি; কি ধরা পড়লেও স্বীকার করেনি। সেই চোখ যখন মঞ্জুকে দেখেছে, কিশোরীর সেই পুষ্টাঙ্গ দেখে উল্লসিত হয়েছে; আবার যখন মাধুরীকে দেখেছে, তার আর কোন অঙ্গ তেমন সুন্দর না হলেও

দুটি মাত্র প্রত্যঙ্গে মুগ্ধ হতে, বিদ্ধ হয়ে থাকতে তার বাধেনি। আর সেই তীর-বেঁধা দুটি পাখিকে নিয়ে মাধুরী দিনরাত খেলেছে। খেলেছে আর খেলেছে। কিন্তু হৃদয়হীন পুরুষের চোখ কি শুধু কোন হৃদয়চূড়ায় বিঁধে থাকবার জন্যে? তা কি সেই হৃদয়-সমুদ্রে কোনদিন স্নান করবে না—যে সমুদ্র অতল গভীর, যেখানে তরঙ্গভঙ্গের শেষ নেই! রসিকের সেই রহস্য-সন্ধানী দৃষ্টি শুধু ভালবাসারই বোধ হয় দেয়। সেই ভালবাসার কাছে দেহের কুরূপ, তার শ্রীহীনতা বাধা হয় না। সেই ভালবাসা এক নতুন রূপের পৃথিবী, রসের পৃথিবী সৃষ্টি করে নিয়ে সেখানে চিরকালের জন্যে বাসা বেঁধে থাকে।

মানসী হেসে মাথা নাড়ল। মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। এসব ওই আদর্শবাদিনী মাধুরীর বই-মুখস্থ-করা বুলি। সে আদর্শ যে কত ভুয়ো, সে বুলি যে কত ফাঁকা মানসী তা জানে, মর্মে মর্মে টের পেয়েছে। এখানে প্রেম নেই, প্রীতি নেই, স্নেহ নেই, বিশ্বাস নেই, আছে শুধু এক বিশ্বব্যাপী দেহের ক্ষুধা। সেই ক্ষুধার কাছে আজকের খাদ্য কাল বাসি, আজকের আহার্যে কাল অরুচি। সমস্ত জগৎ এই অনিত্য দেহবাদের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। আর মুখে এক বাঁধা গৎ আওড়াচ্ছে—দেহ বাদ দাও, দেহ কিছু নয় মানসী ভাবল, আসলে দেহই সব, দেহেই আসব। রুচি প্রবৃত্তি, স্নেহ প্রীতি, বিশ্বাস ভালবাসা, রীতিনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি সব সেই মদের গ্লাসের বুদ্বুদ। মাতালের অর্থহীন অসংলগ্ন প্রলাপ।

কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে সব মানুষের দেহের স্বাদ তো একই রকম। সাধু আর দুর্বৃত্তের দেহের স্বাদ তো আলাদা হবার কথা নয়। মানসী মনে মনে হাসল। পরীক্ষা করে দেখলে হয়। একদিন কোন সাধুকে শয্যাসঙ্গী করে, আর একদিন কোন এক চোরের বিছানার সঙ্গিনী হয়ে পরখ করে দেখলে হয় তাদের দেহে কোন স্বাদ-বৈষম্য আছে কিনা। যতদূর মনে হয় তা নেই। বালক আর যুবকের মধ্যে আছে, যুবক আর বৃদ্ধের মধ্যে আছে, কিন্তু সং আর অসতের মধ্যে নেই, শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে নেই, ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে নেই, এমনকি রাত্রির অন্ধকারে সুন্দর-কুৎসিতের মধ্যে নেই। মানসী হাসল, 'এখানে আসিলে সকলেই সমান হয়।' শুধু শ্মশানশয্যায় আর ফুলশয্যায় সাম্যের রাজত্ব। কিন্তু তাই যদি হয়, সব দেহই যদি মোটামুটি একই স্বাদের আধার হয়, তাহলে মানুষ কেন দেহের মধ্যেই যত নতুনত্ব, যত বৈচিত্র্য খোঁজে? সে কি বোঝে না, আসল বৈচিত্র্য মনে, আসল সম্পদের আধার মন? তাই দেহে একাকার হয়েও সেই মনের বৈষম্যেই মানুষ ইতর আর বিশিষ্ট? মন শুধু দেহকে সাজায় না, দেহকে স্বাদযুক্ত করে। কিন্তু লোভ আর লিপ্সার জন্যে শুধু দেহকে দায়ী করে লাভ কি, শুধু চঞ্চল দুটি আঁখিকে নিন্দা করে লাভ কি, সেই দুটি পাখির যে মালিক, যার হাতে চালাবার

নুতো, নিন্দা যদি করতে হয় তাকেই করা উচিত। নিন্দনীয় সেই হৃদয়হীন পুরুষ, যে সব ভুলে দুটি চোখকেই সর্বস্ব করেছে, আর সেই মায়াবিনী মেয়ে. যে তাকে ভুলিয়েছে, বড় বোন হয়ে ছোট বোনের সর্বস্ব ছলনা করে কেড়ে নিয়েছে; দিদি হয়ে যে এমন অপরাধ করতে পারে, সে না পারে কী। মানসী কি ওদের ক্ষমা করবে, হার মেনে সরে আসবে, না শাস্তি দেবে? এমন শাস্তি যা ওরা কোনদিন ভুলবে না, যা ওদের মারবে না, কিন্তু জীবন্মৃত করে রাখবে? সে শাস্তি কী হতে পারে, হঠাৎ মাথায় এল না মানসীর।

মা উঠে পড়েছেন। মশারির দড়ি খুলছেন। মানসীকে শুয়ে থাকতে দেখলে এদিকে আর এগোবেন না। এর আগে আগে মা তাদের ছেলেবেলায় মানসী শুয়ে থাকতে থাকতেই তাদের মশারির দড়ি খুলে দিতেন। মশারিটা নাকের ওপর পড়তেই ঘুম ভেঙে যেত মানসীর। ঘুম ভাঙাবার ওই এক ধরন ছিল মার। মানসীর ঘুম ভাঙত, কিন্তু মাধুরীর ঘুম ভাঙত না। ও চিরকালই লেট রাইজার। ওর সবই দেরিতে। সবই দেরিতে। নষ্ট হবার, নষ্ট করবার দুর্বুদ্ধিও ওর কত দেরিতেই না এল। মানসী হাসল। নষ্ট হওয়া আর নষ্ট করা আবার কি! ওসব সেকেলে ধারনায় তার বিশ্বাস নেই। দেহ নষ্ট হয় জড়তায়, দেহ নষ্ট হয় ব্যাধিতে। মৃত্যুতে তার বিলোপ হয়। আর কোন রকম নাশে সে বিশ্বাস করে না। মাধুরী নষ্ট করেছে একটি অতি মধুর সম্পর্ককে। সে আর কিছু খোয়ায়নি।

মানসী মশারি সরিয়ে বাইরে এল।

সুহাসিনী বললেন, 'এরই মধ্যে উঠে পড়লি মানু? আর একটু শুয়ে থাকলেই পারতি।'

মানসী বলল, 'শুয়ে থেকে কি লাভ মা। আমার ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে।'

সুহাসিনী একটু হেসে বললেন, 'এদিক থেকে তুই একেবারে আমার মত হয়েছিস। আমিও ঘুম ভেঙে গেলে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারিনে। পিঠে ব্যথা ধরে যায়।'

এই হল মা'র স্নেহ আর সহানুভূতি জানাবার ধরন—তুই আমার মত হয়েছিস। এইটুকু মিলের কথা উল্লেখে মা যেন তাকে একেবারে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে চান। ছোট মেয়ের মত বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে চান। না হলে মানসী জানে মা'র সঙ্গে তার সামান্যই মিল আছে। দুজনেই তারা ভোরে ওঠে, শুধু এইটুকু মিল, দুজনেই তারা কাজকে ভালবাসে, কাজ ফেলে রেখে আলস্যকে প্রশ্রয় দেয় না, শুধু এইটুকু মিল। আর কোন মিল তাদের মধ্যে নেই।

'মা, আমি কি বোনেদের বিছানা তুলে দেব? দিই-না মা।'

সুহাসিনী বললেন, 'না না, এখন থাক। ওরা ঘুমুচ্ছে, আর একটু ঘুমোক। ঘুরে এসে আমিই সব তুলে নেব।' তিনি একটু হাসলেন, 'তুই ঠিক পারবিনে। তুই যা, হাত-মুখ ধো গিয়ে।'

মানসী আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে বাথরুমে এসে ঢুকল। আগে আগে কয়লার গুঁড়ো দিয়ে, কি বাঁ হাতের তেলোয় পাউডার রেখে আঙুলের ডগা দিয়ে দাঁত মাজত মানসীরা। দাঁতন কি টুথব্রাশ ব্যবহার করতে দেখলে বাবা খুব রাগ করতেন। বলতেন, 'ওকি পুরুষালি স্বভাব? মেয়েরা আবার দাঁতন করবে কেন? ব্রাশ করবে কেন? তারা ছাই দিয়ে দাঁত মাজলেই সেই দাঁত মুক্তার মত ঝক ঝক করে।'

বাবা বলেন, 'এখনকার মেয়েগুলি অতিরিক্ত পুরুষালি হয়ে গেছে বলেই ছেলেরা চট করে তাদের পছন্দ করে না। করবে কেন? এখনকার মেয়েরা সব শাড়ি-পরা পুরুষ। ছেলেরাও যা করবে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেয়েরাও তাই করবে। নিজেদের জন্যে আলাদা কোন আব্রু রাখবে না, আড়াল রাখবে না। তাঁদের সামনেই দাঁত মাজবে, খাবে, আঁচাবে। এর ফলে ছেলেরা ওদের খারাপ খারাপ পোজগুলি দেখে আর তাদের মন থেকে সমস্ত রোমান্স নষ্ট হয়ে যায়।'

বাবা তাহলে রোমান্সের ভাবনা ভাবেন। এই নিয়ে দিদির সঙ্গে কত হাসাহাসি করেছে মানসী। কিন্তু বাবার সঙ্গে কিছুতেই একমত হয়নি। নারী-পুরুষের আকর্ষণের ভিত্তি কি অতই কাঁচা, অতই ঠুনকো যে, একটু এদিক-ওদিক হলেই তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? আব্রুর মাহাত্ম্য যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে তো ফের সেই নাকের ডগা অবধি ঘোমটা টেনে পর্দার আড়ালে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। কিন্তু মেয়েরা আর কিছুতেই আড়ালে চলে যাবে না বরং তারা আরো বেশি করে, বেশি সংখ্যায় পুরুষের চোখের সামনে এসে দাঁড়াবে। তারা পুরুষের সঙ্গে খাবে, বেড়াবে, ঝগড়া করবে, বন্ধুত্ব করবে, কাজ করবে, চব্বিশ ঘণ্টা কাছাকাছি পাশাপাশি থাকবে। তবু পরস্পরের মোহ দূর হবে না। তারা একজন আরেকজনকে যত জানবে তত জানার আগ্রহ বাড়বে। মেয়েরা কী ভাবে হাঁটে, কী করে খায়, কী ভাবে আঁচায় সেই জানাই কি পুরুষের পক্ষে সবকিছু জানার চরম? বাবার আপত্তি সত্ত্বেও মানসী ব্রাশ আর টুথপেস্টের ব্যবস্থা করেছে। বাবার চোখের সামনে অবশ্য দাঁত মাজে না। কিন্তু তিনি জানেন মানসী টুথব্রাশ ব্যবহার করে। চাকরি-বাকরি পেয়ে সংসারে সবচেয়ে বেশি টাকা দেয় বলেই হয়তো বাবা তার মুখের সামনে এইসব ছোটখাট বিষয় নিয়ে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু মানসী জানে আড়ালে-আবডালে তিনি এই নিয়ে এখনো গজ গজ করেন। স্বাস্থ্য রক্ষার দোহাই দিয়ে বলেন, ব্রাশ বেশি ব্যবহার করলে

দাঁতের মাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু শুধু কি এই পরিবারে একটা টুথব্রাশেরই প্রচলন করেছে মানসী? বাবার মতের বিরুদ্ধে মেয়েদের চলাফেরার স্বাধীনতা, উপার্জন করবার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেনি? দিদি পাশ করবার পরেও বছরখানেক বসেছিল। বাবা কিছুতেই তাকে চাকরিতে ঢুকতে দিতে চাননি। বলেছিলেন, চাকরি করলে মেয়েদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়, চেহারা খারাপ হয়, কেমন একটা শক্ত শক্ত পুরুষালি ভাব আসে। মেয়েদের নাম গৃহলক্ষ্মী, অফিসলক্ষ্মী নয়। আর মাস্টারি যারা করে, অনর্গল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাদের গলা মিষ্টতা হারায়, দু'তিন বছরের মধ্যেই তাদের মুখে পেশার ছাপ পড়ে।

তখন দাদার সঙ্গে বিবাদ হয়নি। বউদি আসেনি। তখন দাদা মাইনের পুরো টাকাই বাবার হাতে দিত। তাই মেয়েদের স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যকেই প্রথম বিবেচ্য করে তুলেছিলেন বাবা। কিন্তু বেশিদিন সেই বিবেচনা রাখতে পারেননি। সংসারের হালচাল বদলে গেল, দাদা আলাদা হল, আর মেয়েদের অধিকার, মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে বাবার সঙ্গে মানসী সমানে তর্ক চালাতে লাগল। তারপর মাধুরী আর মানসী দুজনেই চাকরিতে ভর্তি হল। মাসিক খরচার টাকা আগে বাবাই রাখতেন, তিনিই বণ্টন করতেন। তাতে অব্যবস্থার চূড়ান্ত হতো। তাই সব মায়ের হাতেই তুলে দিল মানসী। জমা-খরচের খাতাখানা পর্যন্ত। বাবা আপত্তি করে বসলেন, 'তোর মা হিসেব মেলাতে পারবে না, যোগ বিয়োগ ভুল করবে।'

মানসী বলল, 'করুক, আমরা চেক করে দেব। তবিল তসরুফের ভয় তো আর নেই বাবা। না হয় একটু গরমিল হলই।'

সাংসারিক ব্যাপারে মায়ের পরামর্শ আগে আগে বাবা প্রায় শুনতেই চাইতেন না, এখন না শুনে পারেন না। শুধু ভাঁড়ার নয়, ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থাও এখন মা'র হাতে। ওঁদের সেই ঝগড়াও কমে গেছে। অন্তত আগের সেই প্রচণ্ডতা কমিয়ে এনেছে মানসীরা। আগে আগে বাবার হাতে মা মার পর্যন্ত খেয়েছেন। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। ঝড় উঠলে যেমন ভয় করত, বাবা-মা'র মধ্যে ঝগড়া লাগলেও তেমনি ভয় পেত মানসী। মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙলেও ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে থাকত মানসী। ঘুমের ভান করে পাশ বালিশ জড়িয়ে ধরে চুপ করে পড়ে থাকত। চোখ মেলতে সাহস পেত না। ভাবনা হতো ঝড়ের দাপটে তাদের ছোট পাখির বাসা ছিঁড়ে উড়ে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর তারা ছোট ছোট বাচ্চারা গাছতলায় মরে পড়ে থাকবে। গাঁয়ের বাড়িতে একবার ঝড়ের পর কয়েকটি পাখির বাচ্চাকে অমনি পড়ে থাকতে দেখেছিল মানসী। তাদের মাথা নাড়বার শক্তি নেই, ডানা নাড়বার শক্তি নেই, ছেঁড়া পাতার মত কাদা-মাটির সঙ্গে মিশে পড়ে আছে।

কিন্তু মানসীদের আমলে তেমন ঝগড়া আর লাগবার জো নেই। সেবারও

বাবা খুব খানিকটা বকাবকি করে মা'র গায়ে হাত তুলতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মানসী এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের মাঝখানে। কঠিন স্বরে বলেছিল 'ফের যদি তুমি অমন কর বাবা, মাকে নিয়ে আমরা অন্য কোথাও চলে যব; তুমি একা থেকো তোমার সংসারে।'

বাবা আর কথা বলেননি, মাথা তোলেননি, অপরাধী হাতখানা ফতুয়ার পকেটে লুকিয়ে আস্তে আস্তে সরে গিয়েছিলেন। তারপর অমন কাণ্ড আর কোনদিন হয়নি।

সংসারে মায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে মানসী। বাবার অতিরিক্ত শাসন থেকে ছোট ভাইবোনদের মুক্তি সেই দিয়েছে। আগে বাবাই সব ঠিক করে দিতেন—ওরা কোন্ নাপিতের কাছে চুল ছাঁটবে, কেমন করে টেরি কাটবে, টেরি কাটবে কি কাটবে না, কোন্ রঙের জামা পরবে, তার ঝুল কতটুকু থাকবে সব ঠিক করবার বেলায় বাবার সৌন্দর্যবোধই ছিল চূড়ান্ত মাপকাঠি। মানসী সেই কাঠি বাবার হাত থেকে কেড়ে নেয়নি, তাঁর কাঠি তাঁর হাতেই আছে। শুধু রুচিবিচারের আরো কয়েকটি নতুন কাঠি চালু করে দিয়েছে মানসী।

সংসারে মেয়েদের আয়ের অধিকার, ব্যয়ের অধিকার, ইচ্ছামত পোশাক পরিচ্ছদ পরবার অধিকার ছাড়া কি আরো কোন অধিকার আনেনি মানসী? সেই অধিকারই সবচেয়ে বড়, সেই স্বাধীনতার তুলনা নেই। নিজের পছন্দমত ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার অধিকার, তারপর সেই বন্ধুত্বের জমির ওপর আস্তে আস্তে ভালবাসার ফুল তুলে যাওয়ার স্বাধীনতা। তার তুলনা হয় না, তুলনা হয় না, সে সুখের তুলনা হয় না।

বাবা-মা কি টের পেতেন না? আপত্তি করতেন না? আকারে-ইঙ্গিতে শাসন করতেন না? করতেন বইকি। কিন্তু মানসী সব শাসন মানবে কেন? সে কি বড় হয়নি? তার কি ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতা হয়নি? নিজের হাতে অর্থ উপার্জনের অধিকার আসেনি? মানসী যেমন আগে ভয়ে চোখ বুজে থাকত, ওঁরাও তেমনি সব দেখেশুনে টের পেয়েও চোখ বুজে থাকতে লাগলেন—যে বাতাস নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত আস্তে আস্তে বইছে, বড়জোর মলয় বায়ুর মত মাঝে মাঝে সুবাসিত হচ্ছে, পাছে তা প্রবল হয়, পাছে আরো বড় হয়ে ঝড় আসে।

মুখ ধুয়ে আয়নার দিকে তাকাল মানসী। এই সেদিনও মাধুরী আর সে একসঙ্গে দাঁত মেজে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আয়নায় মুখ দেখেছে। পাউডারে দাঁত বেশি পরিষ্কার হয়, না পেস্টে, তাই নিয়ে তর্ক করেছে। দিদি আবার পেস্ট করতে পারে না। অদ্ভুত বাতিক। নরম পেস্ট দেখলে তার নাকি গা ঘিনঘিন করে। ব্রাশ ব্যবহার করতেও দিদি অপটু। ওর মাড়ি ভারি নরম

একটু ব্রাশ করলেই রক্ত বেরোয়। মানসীর সবই শক্ত। আয়নায় মুখ দেখল মানসী। সমান সুগঠিত সুন্দর দাঁতের পংক্তি দেখল। অনেকদিন আগে দূর সম্পর্কের এক জেঠিমা মানসীদের বাড়িতে এসে কিছুদিন ছিলেন। মানসী তাঁকে কালীঘাট আর দক্ষিণেশ্বর দেখিয়ে এনেছিল। তাই তিনি তাকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি মাকে বলেছিলেন, 'সুহাস, তোমার মানসী বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে, ওর এক দাঁতের বুদ্ধিও মাধুরীর নেই।' শুনে মানসী হেসে বলেছিল, 'জেঠিমা, মানুষের বুদ্ধি কি দাঁতের গোড়ায় থাকে না মাথার কোষে?' জেঠিমা বলেছিলেন, 'কোথায় থাকে তা জানিনে বাছা। মা-ঠাকুরমার মুখে যা শুনেছি তাই তোমাকে বললাম।'

দাঁতে বুদ্ধি না থাকুক, সৌন্দর্য আছে। এ কথা অনেকেই বলেছে মানসীকে। বিশেষ করে একজন তো বার বার বলেছে। অসীম বলেছিল, 'দশন মুকুতার পাঁতিরে।' তোমার দাঁত দেখলে বৈষ্ণব কবির সেই উপমা মনে পড়ে।'

মানসী হেসে বলেছিল, 'ওই পুরোন উপমা ছাড়া তুমি আর কিছু খুঁজে পেলে না?'

অসীম বলেছিল, 'এখনকার কবিরা দাঁতের সঙ্গে আর কিসের তুলনা দিয়েছেন ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু মুকুতার পাঁতি অমর। সোজা কথায় বলি, তোমার দাঁতের জন্যে যে-কেউ প্রাণপাত করতে পারে।'

মানসী বলেছিল, 'পাত করে দরকার নেই। প্রাণটা যেখানে রেখেছ সেখানেই নিরাপদে থাক। দেখ, সব বাদ দিয়ে তুমি কেন আমার দাঁতের সুখ্যাতি কর—আমার বড় ভয় হয়।'

'কেন, ভয় কিসের?'

মানসী বলেছিল, 'আমি কি শুধুই আমার দাঁত? আমি তো সত্যিই আর টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মত আমার দাঁতগুলি সব সময় তোমার চোখের সামনে মেলে রাখতে পারব না।'

অসীম হেসে বলেছিল, 'সব সময় কেন রাখবে? তা ওই কমার্শিয়াল আর্টিস্টের আঁকা বিজ্ঞাপনের ছবিতেই মেলে রাখুক। তুমি ফাইন আর্টিস্টের ললিতকলা। তুমি যখন হাসো মানসী, তুমি জানো না তোমাকে কি সুন্দর দেখায়। যে অমন করে হাসতে জানে তার আর কিছু না জানলেও চলে।'

মানসী লজ্জা পেয়ে বলেছিল, 'তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি।'

অসীম প্রতিবাদ করে বলেছিল, 'মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। তোমার হাসি বড় মিষ্টি। আর এই হাসির জন্যেই তোমার দুটি দন্তপংক্তির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

অমন সরাসরি কেউ যদি সুখ্যাতি করে, অস্বস্তি লাগে না? সেই

অস্বস্তি মানসী তাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, 'বল কি, সংসারে আমার দন্ত-পংক্তির কি আর কোন কাজ নেই? সেদিন রেস্টুরেণ্টে দুজনে মিলে যে দিব্যি ফাউল-কাটলেট খেলাম, দাঁত ছাড়া কি তা সম্ভব হতো?'

অসীম বলেছিল, 'তুমি যতই চেষ্টা কর, তোমার হাসির মহিমা তাতে চাপা পড়বে না বরং আঁচল চাপা দিলে তা আরো বাড়বে।'

আর একখানা চিঠির কথা মনে পড়ে। অসীম তাতে লিখেছিল. 'কতদিন তোমাকে দেখিনে। তোমার হাসি দেখিনে। আমার মন বিষাদের অন্ধকারে ঢাকা পর্বতকন্দরের মত। তার কোন কোন রন্ধ্র দিয়ে তোমার হাসির জ্যোৎস্না যখন এসে পড়ে, সেই পাহাড় নবজন্ম পায়। অচল গিরি হয় রজতগিরি। রূপেই তার চাঞ্চল্য, রূপেই তার সচলতা। নাকি আবার একটা কাঁচা উপমা দিয়ে বসলাম? জ্যোৎস্নার একই বরণ, একই ধরন, স্বভাবে একই স্নিগ্ধতা। তোমার হাসি সব সময় স্নিগ্ধ নয়। তাতে কখনো-বা বুদ্ধির দীপ্তি।'

ছাই বুদ্ধি! আবার সেই জেঠিমার দাঁতের বুদ্ধি। বুদ্ধি দিয়ে মানসী কি মানুষকে চিনতে পারল, তার রাশ রাশ কথার, রাশ রাশ চিঠির অসত্যতা ধরতে পারল? বুদ্ধি দিয়ে সে কি কাউকে ধরে রাখতে পারল? তার বুদ্ধিরও কোন দাম নেই, হাসিরও কোন দাম নেই। মানসীর হাসি সেই মুগ্ধ দর্শকের কাছে আজ চিরদিনের মত বাসি হয়ে গেছে।

ভালবাসার স্বাধীনতাকে একদিন সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা বলে ভেবেছিল মানসী। ভুল, ভুল। ভালবাসা স্বাধীনতা নয়, পরাধীনতা। পরের চাকরি করা যেমন দাসত্ব, পরকে ভালবাসাও তেমনি পরম দাসত্ব। যাকে ভালবেসেছ তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে এই হল দাসত্বের শর্ত। সে তোমার দিকে না তাকালে তোমার দিনের আলো নিভে যায়, তোমার জ্যোৎস্না রাত্রে অমাবস্যা নামে, সে তোমার দিকে না চেয়ে হাসলে তোমার পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যায়, সে তোমাকে বুকে টেনে না নিলে পৃথিবীর কোন আকর্ষণের কোন মানে থাকে না। এমন অধীনতা আর কিসে আছে? আগেকার দিনে মেয়েরা নিজেদের নামের সঙ্গে দাসী জুড়ে দিতে। নিজেদের সত্যিকারের পরিচয় তারা জানত, ভালবাসার পরিণাম তারা জানত। আমি ভালবাসি একথা বলা যা, আমি দাসী একথা বলাও তাই। যখন প্রতিদান মেলে তখনই সমানাধিকারের গৌরব। যখন কম করে মেলে কি একেবারেই মেলে না তখন অনধিকারিণীর অখ্যাতি অনেক নিচে নামিয়ে নিয়ে যায়। হতাশা নিরাশা গ্লানি আর অপমানের কারাগারে চিরদিনের মত তোমাকে বন্দিনী করে রাখে। এই বন্ধনদশা কি কাটাতে পারবে না মানসী? এই দাসত্বের দড়ি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারবে না?

মুখ-হাত ধুয়ে মানসী ফিরে এসে দেখল, নন্দুরা উঠে পড়েছে, কি

…-ই তাদের ডাকাডাকি করে তুলে দিয়েছেন। কালকের মত আজও দেয়াল …ঘে সেই চায়ের টেবিল পাতা হয়েছে। তাদের চেয়ার-টেবিল, কাপ-ডিস্, …টি-বাটি কাল যা ছিল আজও তাই আছে। কোন একটা জিনিস ভাঙেনি, হয়নি, চুরি যায়নি। যা যাবার শুধু মানসীরই গিয়েছে।

মায়া এসে বলল, 'সেজদি, ওঁরা ততক্ষণে আসুন। কালকের মত …মাকে আগে এক কাপ চা করে দিই। তুমি সেকেণ্ড কাপ সবাইর সঙ্গে …খেয়ো।'

মানসী প্রথমে নিষেধ করল, 'না না, থাক।' তারপর বলল, 'আচ্ছা দে।'

আজ আর দ্বিতীয় কাপের অপেক্ষায় থাকবে না মানসী। প্রথম কাপ …খেয়েই চলে যাবে। আজ আর সবাইর সঙ্গে বসে গল্প করবার রুচি নেই …ার।

একটু বাদে চায়ের কাপ সামনে এনে মায়া বলল, 'খালি পেটে চা খাবে সেজদি? একখানা বিস্কুট-টিস্কুট এনে দিই, তাই দিয়ে খাও।'

মানসী বিরক্ত হয়ে বলল, 'থাক, তোর আর ডাক্তারি করতে হবে না।'

মায়া মুখ ম্লান করে চলে যাচ্ছিল, মানসী ফের ডাকল, হেসে বলল, …আচ্ছা দে, একখানা বিস্কুটই দে।'

তারপর ছোট বোনের পিঠে হাত রেখে একটু আদর করে বলল, 'মায়া, তুই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল।'

মায়া লজ্জিত হয়ে বলল, 'কেন সেজদি, তোমরাও তো ভাল।'

মানসী বলল, 'না। তোর মত অত ভাল আমরা কেউ নই। তোর মত …ত সুখী আমরা কেউ নই। সুখী হওয়ার একমাত্র উপায় বোধ হয় ভাল হওয়া। তুই ঠিক পথ বেছে নিয়েছিস মায়া।'

মায়া বলল, 'কী যে বল সেজদি।'

'আমি বলছি তুই আরো সুখী হবি।'

মায়া একটু চুপ করে থেকে বলল 'আমাদের পরীক্ষার রেজাল্টটা কিছুতেই জানা গেল না সেজদি। বিজুদা যে বলছিলেন, জানাবেন। কেউ কেউ কিন্তু জেনে গেছে।'

মানসী বলল, 'আমরাও জানব। বিজুদা তো কখনো কথার খেলাপ করেন না। জানতে পারলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানিয়ে দেবেন। …কি নিজেও চলে আসতে পারেন। অত ভাবছিস কেন। তুই পাশ করে যাবি।'

মায়া হেসে বলল, 'সত্যি বলছ সেজদি? তোমার কথা যেন ফলে।'

খুশী হয়ে চলে গেল মায়া। যেন অমোঘ বর পেয়েছে দিদির কাছ থেকে।

বোকা মেয়ে। ও ভেবেছে, জীবনের সব সুখ পরীক্ষার পাশ-ফেলের ওপর নির্ভর করে। গোটাকয়েক পাশ তো মানসীও করেছিল। তাতে হল কি?

মানসী একা একা বসে চা খেতে লাগল। এতক্ষণে বাড়ির সবাই উঠে পড়েছে। কেউ বাথরুমে ঢুকেছে। কেউ-বা বসে জড়তা ভাঙছে। এখনো মানসীর সামনে কেউ আসেনি, পাশেও না। সে এখন সম্পূর্ণ একা। এক থাকাই সবচেয়ে ভাল। নিজের কাজে নিজে মগ্ন হয়ে থাকার মত আনন্দ আর কিছুতেই নেই। আত্মপ্রেমই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রেম। ছলনা প্রতারণা প্রত্যাখ্যানের ভয় নেই।

বাবা এসে বসলেন। আজ বোধ হয় আর মর্নিংওয়াকে বেরোননি। মুখখানা গম্ভীর। নন্দু মঞ্জু মিনু এল। এল মাধুরী। মানসী একবার ওর দিকে আড়চোখে তাকাল। ওর মুখখানাও কি ভার-ভার? না মানসীর দেখবার ভুল? পুরো একটি রাত্রির সুখনিদ্রার পর মুখ অমন ফোলা ফোলাই দেখায়। মাধুরী! শব্দটা উচ্চারণ করে মানসী মনে মনে হাসল। ছেলেবেলায় সে ওকে কিছুতেই দিদি বলতে চাইত না। নাম ধরে ডাকত। বলত 'ঈস্, দেড় বছরের বড় আবার বড় নাকি?'

কিন্তু বাবা খুব শাসন করতেন, মা খুব বকতেন। তাই দিদি বলতে শুরু করল। এখন ওকে ফের নাম ধরে ডাকলে পারে মানসী। দিদি হয়ে যে ছোট বোনের লাভারের সঙ্গে প্রেমে পড়ে, বয়সে বড় হলেও সে পর্যায়ে ছোট, অন্তরে ছোট।

কিন্তু সত্যিই যে ওদের মধ্যে কিছু হয়েছে তা কী করে জানল মানসী সে তো নিজের চোখে কিছু দেখেনি, নিজের কানেও কিছু শোনেনি। অবশ্য শোনেনি। কিন্তু মনে অনুভব করেছে। সেই অনুভবই সবচেয়ে বড় চোখের চেয়ে বড়, কানের চেয়ে বড়। চোখে কতটুকুই-বা দেখা যায়, কানে কতটুকুই-বা শোনা যায়। অঘটন যখন কিছু ঘটে, সবচেয়ে আগে জানান দেয় মনে। মানসী দেখেছে, সেই জানাই নির্ভুল জানা। কাল ওরা সারাদিন চোখে-চোখে লুকোচুরি খেলেছে, সারাদিন মানসীর চোখের আড়ালে লুকিয়ে বেড়িয়েছে, আর কাল দুপুররাত্রে ট্যাক্সি করে পালিয়ে যেতে তো মানসী নিজের চোখেই দেখল। তারপর নিজেদের বাড়ির সামনেই দেখতে পেল যুগল আসামীকে। অপরাধীর মুখ দেখলেও ধরতে পারবে না, মানসীর দৃষ্টি কি এমনই ক্ষীণ? বুদ্ধি কি এমনই নিষ্প্রভ?

নন্দু বলল, 'একি, অসীমদা এখনো এলেন না যে। বাড়ির গেস্ট অনুপস্থিত। এ কি ব্যাপার?'

মনোমোহন ছেলেকে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর তো একটু। তুই সব সময় বড় বাচালতা করিস। এমন বদ অভ্যাস হয়েছে তোর।'

নন্দু একবার মানসীর দিকে তাকিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল। হয়তো ভেবেছে, সেজদি তার পক্ষ নিয়ে দু-একটা কথা বলবে। কিন্তু স

সময় কি তা বলা যায়? সব সময় কি আর বাদ-প্রতিবাদ করতে মন চায় কারো।

সুহাসিনী খাবারের থালা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, ‘ওমা তাইতো। অসীম যে খেতে-টেতে এল না এখনো।’

মঞ্জু বলল, ‘আসবেন কি, অসীমদা এখনো ওঠেনইনি। আমি ডেকে এলাম। অসীমদা বললেন, ‘তোমরা এখন খাও গিয়ে। আমি খাব না। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। একটু ঘুমিয়ে নিই।—কথা শোন সেজদি। উনি খরগোশের মত চোখ খুলে ঘুমোবেন। আমি পরিষ্কার দেখলাম, অসীমদা মোটেই ঘুমোচ্ছেন না। মশারির চাঁদার দিকে তাকিয়ে হয়নেত্র হয়ে পড়ে আছেন।’

নন্দু বলল, ‘বাবা, কই মঞ্জুকে তো তোমরা কেউ ধমকাচ্ছ না। ও কথা বললে বুঝি বাচালতা হয় না। যত দোষ আমার বেলায়?’

মনোমোহন আবার ধমক দিয়ে বললেন, ‘আঃ। ফের গোলমাল করছিস?’

তারপর নিঃশব্দে চা খেতে লাগলেন। তাঁর গোঁফের আগা চায়ের কাপের মধ্যে এসে পড়েছে। বিশ্রী লাগছে দেখতে।

হঠাৎ মানসীর মনে হল, একা ঘরে পেয়ে বাবা ওকে মারধোর করেননি তো? কিংবা মারের চেয়েও বাড়া চূড়ান্ত কোন অপমান? উনি সব পারেন। যদি তেমন কিছু করে থাকেন, মানসী ওঁকে ছেড়ে দেবে না, বাপ বলে খাতির করবে না। অসীমকে যদি শাস্তি দিতে হয়—মানসী নিজেই দেবে। তাকে আর কারো কিছু বলবার কোন অধিকার নেই।

সুহাসিনী বললেন, ‘বেশ তো, এখন না উঠতে চায় না উঠল। এক কাপ চা বরং তোরা ওকে কেউ দিয়ে আয়।’

মানসী বিরক্ত হয়ে বলল, ‘কেন বাজে বকছ মা? সে কি কোনদিন বেড-টি খায় যে আজ খাবে?’

মাধুরী এতক্ষণে কথা বলল, ‘কোনদিন না খেলেও একদিন খেতে তো বাধা নেই। চায়ের কাপটা তুই-ই দিয়ে আয় না মানসী।’

মাধুরীর কথার মধ্যে কোন ব্যঙ্গ আছে কিনা, বিদ্রূপ আছে কিনা বুঝে দেখতে চেষ্টা করল মানসী। ঠিক ধরতে পারল না। না চোখের দৃষ্টিতে, না গলার স্বরে, না মুখের ভাষায়। বড় মায়াবিনী মেয়ে। ওকে ধরা ভারি শক্ত।

মানসীও কথার সুরে ধরা না দিয়ে বলল, ‘তুমিও তো দিয়ে আসতে পার দিদি।’

মাধুরী কোন জবাব দিল না।

জবাব দেওয়ার আছে কি যে দেবে। চায়ের কাপের ওপর মুখ নামালেই কি সব ঢাকা পড়ে?

নন্দু বলল, 'আজ বোধ হয় অসীমদা চলে যাবেন।'

হঠাৎ কেউ কোন কথা বলল না।

মনোমোহন বললেন, 'যাবেন বইকি। তার কি আর কোন কাজকর্ম নেই যে, এখানে দিনের পর দিন পড়ে থাকবে?'

মানসী বাবার দিকে তাকাল, 'তুমি বলেছ নাকি কিছু?'

মনোমোহন উষ্ণ হয়ে বললেন, 'আমি আবার কি বলব! বলতে হবে কেন? তার কি বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই?'

কেউ কোন কথা বলল না। চায়ের টেবিল মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। কারো খাওয়ার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

একটু বাদে মাধুরী বলল, 'চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে। মঞ্জু, তুই-ই বরং যা চা-টা দিয়ে আয়।'

মঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাচ্ছি মেজদি।'

মানসী মনে মনে বলল, 'আহা কি দরদ! কি গরজ!'

মঞ্জু চলে যাওয়ার পর তার মনে হল, এই সুযোগটা নিলেও পারত চা দেওয়ার উপলক্ষে সোজাসুজি তার সামনে গিয়ে তার চোখের দিকে তাকানো যেত। শোনা যেত সে কি বলে, কোন্ কৈফিয়ৎ দেয়।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, ছিঃ। তার কি আত্মসম্মান বলে কিছু নেই? সে কেন আগে থেকে যাবে? সে কেন নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে? দরকার হয়, সে নিজেই বলবে। নিজেই বেরিয়ে আসবে। মশারির আড়ালে সারাদিন তো আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

চায়ের টেবিল ছেড়ে মানসী নিজের ঘরে চলে এল। ভাগের ঘর নিজের ঘর বলে কি আর আলাদা একটু জায়গা মানসীর আছে? ঘরে আর কেউ নেই। মায়াকে নিয়ে মা সব বিছানা তুলে ফেলেছেন। ঘরখানা ফাঁকা হঠাৎ মানসীর মনে হল, সমস্ত জগৎটাই যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। তার কিছু করবার নেই, বলবার নেই, নিঃস্ব আর নিষ্কর্মা হয়ে সে যেন এক নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা ছাত্র পড়াতে বেরিয়ে গেলেন; মঞ্জু আর মিনু স্কুলে ছুটল নিজের ঘরে বসে সবই টের পেল মানসী। নন্দু মা'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজারে চলে গেল। ঠিকে-ঝি এসে বাসন মাজতে বসল। অন্যদিনের মত আজও সংসারযাত্রা শুরু হয়ে গেছে। শুধু মানসীই যেন থেমে আছে চলবার মত পায়ের জোর নেই, মনে উৎসাহ নেই, সামনে পথের নিশানা নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

আর মাত্র দু'ঘণ্টা সময়। তার পরেই অফিসে যাবার উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করে দিতে পারবে মানসী। অফিসে গিয়ে একবার কাজের মধ্যে যদি নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে, তাহলে আর কোন ভাবনা নেই। সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে কাজই তাকে মুক্তি দেবে। কিন্তু এই দু'ঘণ্টা কি করে কাটাবে মানসী? এর প্রতিটি মিনিট-সেকেণ্ড সীসার মত ভারি হয়ে রয়েছে। অচল ঘড়ির মত সময় তার গতি বন্ধ করে রেখেছে।

মা আর মায়া রান্নাবান্নার যে আয়োজন করছে মানসী গিয়ে সে কাজে হাত দিতে পারে। কিন্তু মা অবাক হয়ে যাবেন। মানসী তো ঘরের কাজ বড় একটা করে না। মা তাকে আজও হয়তো কিছু করতে দেবেন না। আগে আগে তিনি এই নিয়ে তাকে কথা শোনাতে ছাড়তেন না। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ জানিয়ে বলতেন 'ঘর-সংসারের কাজ যে মোটে হাত দিয়ে ছুঁতেই চাসনে, পরিণাম কি হবে বল্‌তো?'

মানসী পরম নির্ভাবনায় বলত, 'কি আবার হবে!'

মা বলতেন, 'নিজের ঘর-সংসার তো একদিন করতে হবে। তখন তো আর আমি সঙ্গে যাব না, বোনেরাও সঙ্গে যাবে না।'

মানসী হেসে বলত, 'অত ভাবছ কেন, গণ্ডা কয়েক দাস-দাসী ঠাকুর-চাকর রেখে দেব। তারাই সব করে দেবে।'

মা বলতেন, 'ঈস্‌, কত বড় নবাবের বেটি। তেমন ভাগ্য নিয়েই জন্মেছ কিনা।'

মাধুরী একদিন ঠাট্টা করে করেছিল, 'ওর জন্যে ভেব না মা। মানসীর সংসার কি আর তোমার মত সংসার হবে? ওর সংসারের একটা দিক তুলে নেবে ঠাকুর-চাকর, আর একটা দিক কাঁধে নেবে স্বামী। আর যদি দশ নম্বর ফ্ল্যাটের অবস্থাটা করে নিতে পারে, তাহলে তো কোন কথাই নেই।'

মা জানতে চেয়েছিলেন, 'সে আবার কি?'

মাধুরী বলেছিল, 'জানো না বুঝি? দশ নম্বর ফ্ল্যাটের অরুণবাবু তাঁর স্ত্রীর সব কাজ করে দেন। বিছানা পাতেন, মশারি টানান, স্ত্রীর ভিজে শাড়িখানা পর্যন্ত মেলে দিয়ে আসেন। সবাই অরুণবাবুকে বলে অরুণা দেবী, আর তাঁর স্ত্রী প্রণতিদিকে বলে প্রণববাবু। আমাদের মানসীও যদি-অমন মানসকুমার হতে পারে—।'

মায়া-মঞ্জু সবাই হেসে উঠেছিল।

মানসী প্রথমে হাসলেও শেষে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। দিদির ঠাট্টা হজম করতে পারেনি।

মা বসে বসে চন্দ্রপুলি পিঠে তৈরি করছিলেন। তিনি সস্নেহে মানসীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন, 'তা তোমরা যতই বল, কাজকর্মের জন্যে

ঘর-সংসার কারো আটকে থাকে না। বাপের বাড়ি থেকে আমি যখন তোমাদের সংসারে এলাম, সব কাজ কি আর শিখে এসেছিলাম? না কি মাথার ওপর শেখাবার মত কেউ ছিল? সব নিজের দরকারে নিজের আন্দাজ আর পছন্দ-মত আস্তে আস্তে শিখে নিয়েছি। তোমরাও তাই শিখবে। ভগবান যদি মুখ তুলে তাকান, ঘর-সংসারের সুখ তোমাদের ভাগ্যে যদি থাকে, তোমরাও যার-যার নিজের সংসার নিজের মত করে গড়ে নেবে। সবাইর হাতের রান্না যেমন একরকমের হয় না, সবাইর পাতা সংসারও তেমনি একরকমের নয়।

অদ্ভুত মায়ের স্বভাব। তিনি দিদিকে আর মায়াকে ভালবাসেন ঘরের কাজ করতে দিয়ে, আবার মানসী আর মঞ্জুকে ভালবাসেন ঘরের কাজ না করতে দিয়ে। মানসী যা ভালবাসে তাই করুক, অফিসের কাজকর্ম চিন্তা-ভাবনা নিয়ে থাকুক, মঞ্জু যখন সাজসজ্জা ভালবাসে, সে না হয় তার সাধ-আহ্লাদ খানিকটা মিটাক। তিনি শাসনও করেন, খোঁটাও দেন, আবার গোপনে গোপনে আস্কারাও দিয়ে থাকেন। এক এক মেয়ের ভিতর দিয়ে যেন এক এক রকমের সাধ মিটাতে চান মা। চাকরি করবার সাধ, সাজসজ্জা করবার সাধ, স্বাধীনভাবে ভালবাসবার সাধ, সব সাধই মা'র কোন না কোন মেয়ের ভিতর দিয়ে পূর্ণ হতে চায়। মানসী হাসল। ভালবাসবার সাধ; কিন্তু ভালবেসে কি সাধ মেটে? মেটে না, মেটে না। কখন যে কিভাবে সে সাধে বাদ পড়বে, তা আগে থেকে ঠিক করে রাখবার জো নেই। নইলে তার নিজের দিদি কিনা—। অথচ এই দিদির জন্যে সে কী না করেছে? বাবার যুক্তিহীন শাসনের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছে, অনুপযুক্ত কোন পাত্রের হাতে তাকে গছিয়ে দেবার চক্রান্ত ভেদ করেছে। নিজের জীবনের কোন কথা গোপন করেনি। অসীমের সঙ্গে তার সম্পর্কের আগাগোড়া কাহিনী বলেছে, অনেক চিঠিপত্র দেখিয়েছে, অসঙ্কোচে অসীমের সমালোচনা করেছে। কে জানে, সেইসব কথা অসীমকে লাগিয়ে লাগিয়েই দিদি হয়তো ওর কান ভারি করেছে, মানসীর ওপর চরম বিরূপতা, বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছে। সে মাঝে মাঝে অসীমের নিন্দা করেছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে যে অভিমান ছিল, অতিশয়োক্তির কৌতুক ছিল, বলবার সময় মাধুরী নিশ্চয়ই তা বাদ দিয়ে বলেছে। সেই নির্জলা নিন্দায় কোন রঙও নেই, রসও নেই। সহানুভূতির গোপন বেদনাই কি তাতে আছে?

'মানসী?'

মাধুরীর গলা টের পেয়েও মানসী মুখ ফিরাল না; যেমন জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মাধুরী বলল, 'একা একা কি করছিস এখানে?'

মানসী বলল, 'কি আবার করব?'

মাধুরী আরো একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

মানসী নিজের মনেই হাসল। কথা মানেই তো একরাশ মিথ্যা কথা। একটি নগ্ন সত্যকে ঢাকবার জন্যে পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যার পত্রপল্লব। মাধুরী এখন কত বানানো কৈফিয়তই না দেবে। কত রকমের কত জবাবদিহি। কিন্তু কৈফিয়ত তো মানসী চায়নি। সে জানে, কৈফিয়ত চাওয়া নিষ্ফল। মানসী যা নিজের চোখে দেখেছে, অনুভব করে জেনেছে, আর-একজনের মুখের বানানো কথায় তার চেয়ে কি কিছু বেশি জানবে?

'বেশ তো, কথা যদি থাকে বললেই হয়।'

মাধুরী একটু হাসল, 'হঠাৎ ভাববাচ্য শুরু করে দিলি যে! এখানে সব কথা বলা যাবে না। কেউ হয়তো এসে পড়তে পারে। চল্ না. বরং ছাদ থেকে আমরা একটু ঘুরে আসি। কি পার্কেও যাওয়া যায়। কালকের বৃষ্টিবাদলার পর আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। কেমন রোদ উঠেছে, তাই দেখ্।'

মানসী মনে মনে বলল, 'তুমি তো রোদের ঝিলিমিলি দেখবেই। দিনের বেলায় চাঁদের আলো দেখলেই-বা আজ তোমাকে আটকায় কে? কিন্তু আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।'

মাধুরী আবার বলল, 'কি রে, যাবি?'

মানসী বলল, 'না। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। যদি কিছু বলতে হয় এখানেই বল।'

মাধুরীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল একটু। কিন্তু মনের কথাকে কেন মুখে আনবে না মাধুরী? আনুক, আনুক। এমন দু-একটা কথা বলুক যার প্রতিবাদে মানসী মনের সাধ মিটিয়ে ঝগড়া করতে পারে। যত ক্ষোভ, যত আক্রোশ সেই কথার স্রোতে স্রোতে ভেসে যাক। জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিকে বুকের মধ্যে পুষে রাখতে মানসী আর পেরে উঠছে না।

মাধুরী বলল, 'বেশ. তাহলে আর-এক সময় বলব।'

মানসী বলল, 'তোমার যা খুশী।'

মাধুরী চলে যেতে যেতে ফিরে তাকাল, 'কাল বুঝি তুই প্রিয়গোপাল-বাবুর ওখানে গিয়েছিলি?'

মানসী বলল, 'হ্যাঁ গিয়েছিলাম। তাতে কি!'

মাধুরী বলল, 'না, কিছু না। তোকে আমরা ফোন করে করে পাইনি, তাই বলছিলাম।'

মানসী ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আমরা মানে?'

মাধুরী যে আরক্ত হল, অপ্রতিভ হল, তা মানসীর চোখ এড়াল না।

মাধুরী বলল, 'আমি বিকেলের দিকে একবার ফোন করেছিলাম। আরো মানে অসীমদা নাকি দু'বার—।'

মানসী অদ্ভুত একটু হাসল, 'যাক্ দ্বিচনের মানেটা এবার বোঝা গেল। কিন্তু আমি অফিসেই ছিলাম। কাজ ফেলে রেখে কোথাও বেরোইনি। হয়তো দু-চার মিনিটের জন্যে অন্য কোন ঘরে গিয়ে থাকব। প্রিয়গোপালবাবুর বাড়িতে গিয়েছি অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পরে। সে-ও একটা কাজেই গিয়েছিলাম।'

'তাই নাকি? কি কাজ?' মাধুরী একটু কৌতূহলী হল।

মানসী বলল, 'সে এখন অকাজ হয়ে গেছে। তোর শুনে কোন লাভ হবে না।'

মাধুরী আরো একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা।' তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ও চলে যাওয়ার পর নিজের বোকামির জন্যে মানসীর ভারি অনুশোচনা হল। মাধুরীর সঙ্গে গেলেই হতো। ছাদে কি পার্কে—যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই না হয় কিছুক্ষণের জন্যে যেত মানসী। গেলে মাধুরী কি বলে তা শুনতে তো পেত! বানানো কথা, মিথ্যা কথা, তবু ব্যাপারটাকে কিভাবে সাজায় তা তো মানসী দেখতে পেত। সুযোগটা হাতের কাছে পেয়ে সে হারিয়েছে। নিজের ভুলের জন্যে নিজের ওপরই এবার রাগ হতে লাগল মানসীর। এখন আর ওকে ডাকা যায় না। এখন আর বলা যায় না, 'চল, তোমার যেখানে খুশী সেখানে নিয়ে চল। তুমি যা বলবে তাই কান পেতে শুনব। তোমার কাহিনী যত সাজানো আর মিথ্যেই হোক, কোথাও প্রতিবাদ করব না।'

এখন আর তা বলবার জো নেই। বললে মানসীর আর কোন মর্যাদা থাকবে না। মাধুরীর কাছে আর-এক দফা হার হবে তার।

মাধুরী আর অসীম তাহলে প্রিয়গোপালবাবুর কথাও তুলেছে। এই প্রৌঢ় হিতৈষী অধ্যাপকের ওপর যে অসীমের চাপা ঈর্ষা আছে, মানসী তা জানে। কিন্তু সেই ঈর্ষাকে সে আমল দেয়নি। বরং তা নিয়ে মাঝে মাঝে কৌতুক করেছে। ব্রজবাবুকে নিয়ে মাধুরীর সঙ্গে যেমন ঠাট্টা-তামাশা করে মানসী, মাধুরীও তেমনি তার শোধ নেয় প্রিয়বাবুকে এনে। যদিও ব্রজবাবু আর প্রিয়গোপালবাবু এক প্রকৃতির নন, তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি মর্যাদাতেও অনেক তফাত। প্রিয়গোপালবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গুণী, কৃতী পুরুষ। ব্রজবাবুকে নিয়ে শুধু ঠাট্টাই করা চলে, বড় জোর কিছুটা সহানুভূতি আনতে পারা যায় তাঁর ওপর, কিন্তু প্রিয়গোপালবাবু শ্রদ্ধার দাবি রাখেন।

মানসী অসীমের কাছে তাঁর কথা মাঝে মাঝে লিখেছে। তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের কথা, মানসীর সঙ্গে তাঁর স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কের কথা সে অসীমকে জানিয়েছে। অবশ্য মাধুরীর মতই অসীম সেই সম্পর্ক নিয়ে কৌতুক করেছে, হেসে বলেছে, 'আমি কি ওঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারব?—বিদ্যা-বুদ্ধির ওই সাগরকে ছেড়ে তুমি কি আর আমার মত খাল-বিলের ধারে আসবে?' প্রিয়গোপালবাবু অবিবাহিত বলে এই কৌতুকের সুযোগটা আরো বেশি করে পেয়েছে অসীম। অবশ্য কৌতুক সব সময় শুধু কৌতুকই থাকেনি। মাঝে মাঝে সত্যিকারের ঈর্ষা তার ভিতর থেকে উঁকি দিয়েছে। সব হাসি-পরিহাসের মধ্যেই কি কিছু-না-কিছু সত্যের আভাস থাকে? প্রিয়বাবুর পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তার কথা, তাঁর স্নেহ-প্রীতি বন্ধুত্বের কথা কেন লিখত মানসী? অসীমের ঈর্ষার উদ্রেক করবার জন্যে? ঠিক তা নয়। অসীমকে ঈর্ষান্বিত করে তার লাভ কি? পৃথিবীতে নিজের গণ্ডির মধ্যে সার্থক, সুস্থ, নিজের ওপর আস্থাশীল মানুষও যে দু-চারজন খুব ধারে-কাছেই বাস করেন, এই কথাই মানসী বুঝাতে চেয়েছিল। অসীম যে প্রিয়গোপালবাবুর মত হবে এমন আশা অবশ্য মানসী করেনি। সে তো আর পাগল নয়! একই কর্মক্ষেত্রে, একই গুণপনার ক্ষেত্রে একজন আর-একজনের মত হয় না, অসীম আর প্রিয়গোপালবাবুর মধ্যে একজন পুলিস কর্মচারী এবং একজন খ্যাতিমান অধ্যাপকের মধ্যে তুলনার কথা তো উঠতেই পারে না। কিন্তু সংকল্পের দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, নিজের ইচ্ছামত রুচিমত নিজের পথ নিজে কেটে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, এসব তো মানুষের সাধারণ লক্ষণ। অসীমের কাছে মানসীর দাবি সেই সাধারণ হবার ন্যূনতম দাবি। অসীম অসাধারণ নাই-বা হতে পারল, নিম্নসাধারণ কেন হবে। সে তো অক্ষম নয়, অশিক্ষিত নয়, শুধু অসন্তুষ্ট। এক ধরনের অসন্তুষ্টি আছে যা মানুষকে উন্নত করে; শক্তিতে, সামর্থ্যে, কৃতিত্বে, সম্পদে ধাপে ধাপে তাকে উঁচু থেকে আরো উঁচু সিঁড়িতে তুলে দেয়। সেই অসন্তোষ শিল্পীর, গুণীর, বিদ্বানের, বিত্তবানের; যে কোন উচ্চাভিলাষী, জীবনাভিলাষী মানুষের। কিন্তু অসীমের অসন্তুষ্টির জাত আলাদা। সেই অসন্তোষ কখনো তার রোগ, বাতিক, কখনো-বা বিলাস। তা অসীমকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করে না, নৈরাশ্যে নৈষ্কর্মে নিমজ্জিত করে রাখে। এসব কথা মানসীর নিজের কথা নয়। চিঠিপত্রে আলাপ-আলোচনায় অসীম এভাবে নিজেই আত্মবিশ্লেষণ করেছে। কিন্তু মানসী যখন অসীমের কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে, আশ্চর্য, ও তখন রেগে যায়। অসীম আত্ম-নিন্দা ভালবাসে, কিন্তু পরের মুখে নিজের নিন্দা সহ্য করতে পারে না। সে পর যদি পরম বন্ধু হয়, তাহলেও না। তাই মানসীর মুখে এসব কথা শুনলে, কি চিঠিতে কোন উল্লেখ উদ্ধৃতি দেখলে অসীম ক্ষেপে যায়। বলে,

'তুমি প্রিয়গোপালবাবুর কথা মুখস্ত করে লিখেছ। তোমার চিঠিগুলি তাঁরই কণ্ঠস্বরের রেকর্ড।'

অসীমের ঈর্ষা কি শুধু প্রিয়গোপালবাবুকে? সবাইকে, পৃথিবীর সবাইকে। মানসী কোন কৃতী অধ্যাপকের নাম করুক, অসীম তাকে হিংসা করবে। কোন লেখক, গায়ক, অভিনেতা কি খেলোয়াড়ের নাম করুক, অসীম ভিতরে ভিতরে তাঁদের কাউকে সহ্য করতে পারবে না। কৃতী ক্ষমতাবান মানুষের সঙ্গে কর্মহীন, কৃতিহীন পুরুষের যোগাযোগ রাখবার একটিমাত্র সেতু। সেই সেতুর নাম ঈর্ষা। আধা পরিহাসের আড়ালে অসীম নিজেই একথা স্বীকার করেছে। 'সত্যি মানসী, তোমার আশেপাশে আর কাউকে আমি সহ্য করতে পারিনে। তুমি যদি আর কারো সঙ্গে কথা বলো কি আর কারো দিকে তাকিয়ে হাসো, আমার মনে হয় সেই হাসি, সেই কথা ক'টি থেকে আমি বঞ্চিত হলাম, অখণ্ড তোমাকে আর পেলাম না। আমি যদি সে যুগে জন্মাতাম, তোমাকে অসূর্যম্পশ্যা করে রেখে দিতাম।'

মানসী হেসে বলেছে, 'আমার বহু ভাগ্য যে, সে যুগে জন্মাইনি। জন্মালেও আমি সেই যুগের বাঁধন ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতাম। কোন পুরুষই আমাকে আটকে রাখতে পারত না। তা সে যত বড় জাঁদরেল পুরুষই হোক, আর সমাজ-শাসনের যত কড়া কড়া নিয়মকানুনই তার হাতে থাকুক।'

অসীম জবাব দিয়েছে, 'বলছ বটে, কিন্তু সেকালে জন্মালে তুমি এ যুগের মনও পেতে না, এ যুগের ভাষাও পেতে না। বারো বছরে তোমার বিয়ে হয়ে যেত। আরো বারো বছরের মধ্যে সাত-আটটি ছেলেমেয়ের মা হয়ে পর্দার আড়ালে দিব্যি সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করতে। গ্রাম-অঞ্চলে কি সমাজের অন্য কোন স্তরে এখনো সে ধরনের সুখিনী গৃহিণীর অভাব নেই। তুমিও তেমনি সুখী হতে। এত সব বড় বড় কথা তোমার মনেও আসত না, মুখেও জোগাত না।'

আর কিছু না হোক, কথা অসীমের মুখে খুব জোগায়। সেদিনের আলাপের কথা মনে পড়ায় মানসী মৃদু হাসল।

'সেজদি!'

মানসী ফিরে তাকাল, 'কি রে নন্দু।'

'বাজার থেকে আজ পোনামাছের ভাগ নিয়ে এলাম।'

মানসী একটু হেসে বলল, 'বেশ করেছিস।'

নন্দু বলল, 'কিন্তু দেখ কাণ্ড, অসীমদা এখনই চলে যেতে চাইছেন। না খেয়ে না দেয়ে—।'

মানসীর মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, 'সেকি!'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তার যদি দরকার থাকে যাবেই তো।'

নন্দু হেসে বলল, 'খুব নাকি জরুরী দরকার। চাকরি-বাকরি সংক্রান্ত—।'

মানসী বলল, 'হুঁ, জরুরী কাজ তো এই দুদিন ধরে করে একেবারে উল্টে দিচ্ছেন। সবই জানা আছে আমার।'

হঠাৎ মানসীর কি একটা কথা মনে পড়ে গেল। বলল. 'নন্দু, দাঁড়া। তোর হাতেই চিঠিখানা দিয়ে দিই।'

'কিসের চিঠি সেজদি।'

'ওঁরই ওই সব জরুরী কাজের চিঠি।'

ব্যাগের ভিতর থেকে একখানা খাম বের করে মানসী একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'আচ্ছা যা, বল গিয়ে আমিই আসছি। আমার সঙ্গে দেখা না করে যেন চলে না যায়।'

নন্দু মুখ টিপে হাসল, 'সেজদি?'

'কি বলছিস।'

'চিঠিখানা নিজে লিখে নিজের হাতেই ডেলিভারি দেবে?'

মানসীও হেসে ফেলল, 'অসভ্য কোথাকার। এত ফাজিল হয়েছিস তুই! আমার লেখা চিঠি তোকে কে বললে?'

'তবে?'

'প্রিয়গোপালবাবুর লেখা সুপারিশ চিঠি।'

নন্দু বলল. 'ও তাই বল। আমি ভাবলাম তুমি বুঝি অসীমদার সঙ্গে কথা বন্ধ করে চিঠিতে চিঠিতে মসীযুদ্ধ চালাচ্ছ।'

মানসী ছোট ভাইকে সস্নেহে তাড়া দিয়ে বলল. 'যা এখান থেকে। বাঁদর কোথাকার।'

নন্দু হাসতে হাসতে ছুটে পালাল। আর সেই সঙ্গে মানসীর মনের পুঞ্জীভূত মেঘও যেন উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

হ্যাঁ, নিজের হাতেই চিঠিখানা দেবে মানসী। ছুটির পর কেন যে আলিপুরের প্রিয়গোপালবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল, সেখানে কেন যে অত দেরি করেছিল, নিজের হাতে তার কারণ দেখাবে। প্রিয়গোপালবাবু সহজে কাউকে এ ধরনের কোন চিঠি দিতে চান না। নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের জন্যেও অন্যের সামান্য অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়া তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। অনেক কষ্টে, অনেক কৌশলে কথাটা তাঁর কাছে পাড়তে হয়েছে মানসীর। প্রস্তাবনাটা সেরে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রিয়গোপালবাবুর জবাব পাওয়ার জন্যে। মনে মনে ভয় হয়েছে, যদি 'না' বলেন, তাহলে আর মান থাকবে না। তাহলে

শিগ্‌গির আর ওঁকে মুখ দেখাতে পারবে না মানসী। টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় ইতিহাসের গবেষক অধ্যাপকের মুখ আরো গুরুগম্ভীর এবং দূর যুগের রহস্যাচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছে।

মানসী অস্ফুট স্বরে বলেছে, 'অবশ্য আপনার যদি অসুবিধে হয় তাহলে থাক।'

প্রিয়গোপালবাবু হঠাৎ নিজের নামাঙ্কিত প্যাডটা টেনে নিয়ে বলেছেন, 'না, থাকবে কেন, দিচ্ছি লিখে। দেখ যদি কোন কাজ হয়।' বলে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিলেন প্রিয়গোপালবাবু, 'তাহলে তোমাদের বিরহ-বেদনার অবসান হবে।'

মানসী লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

কতদিন তার মনে হয়েছে প্রিয়গোপালবাবুর কাছে অসীমের অস্তিত্বের কথা একেবারে গোপন করে যাবে। কেন যেন মনে হয়েছে, অসীমের কথা শুনলে তিনি খুব খুশী হবেন না। কিন্তু মানসীর এই গোপন আকাঙ্ক্ষাকে কি করে যেন টের পেয়েছেন প্রিয়গোপালবাবু। আর তার ফলে তাঁর সহজ হবার আগ্রহ আরো বেড়ে গেছে। সহজ ব্যবহারের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টার যেন সীমা থাকেনি। তিনি সমবয়সী বন্ধুর মত খুঁটে খুঁটে মানসীর কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছেন। অসীমের সঙ্গে তার প্রথম আলাপের কথা, সেই আলাপ কি করে ধীরে ধীরে বন্ধুত্বে পেঁছিল তার বিবরণ, তাদের চিঠিপত্র বিনিময়ের কথা, তাদের মিল-অমিল, রুচি-আদর্শের বিভিন্নতার সমস্যা—কিছুই তাঁর কাছে গোপন রাখতে পারেনি মানসী। গবেষক যেন পণ করেছেন, তিনি মানসীর জীবন-পুঁথির সমস্ত অস্পষ্ট সঙ্কেতলিপির পাঠোদ্ধার করে নেবেন। পাঠক হিসাবে তিনি যে আনন্দ পেয়েছেন তা মানসীর বুঝতে বাকি থাকেনি। পঠিত হওয়ার মধ্যেও যে এক অনাস্বাদিত আনন্দ আছে তাও কি মানসী স্বীকার না করে পারে?

গল্পে গল্পে পুরো একটি সন্ধ্যা কাটিয়ে দেওয়ার পর কোন কোন দিন মানসী হয়তো বলেছে, 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করে গেলাম।'

প্রিয়গোপালবাবু স্মিতমুখে জবাব দিয়েছেন, 'কিসের সময়? ইতিহাস চর্চার? তুমি কি ভাব আমি শুধু ইতিহাসই পড়ি? তোমাদের একালের নভেল-টবেল কিছু পড়িনে?'

মানসী হেসে বলেছে, 'কই আর পড়েন? আমি তো দেখতে পাইনে।'

তিনি বলেছেন, 'তুমি না পেলে কি হবে, আমি ঠিকই পড়ে যাচ্ছি। শুধু একটি জীবনের উপন্যাস নয়, একখানি জীবন্ত উপন্যাস। পাঠক মাঝে মাঝে তাঁর পুঁথির সঙ্গে যে একাত্মতা বোধ করে, আমিও তাই করছি।'

শুনতে শুনতে শিউরে উঠেছিল মানসী। মনে হয়েছিল, তিনি যেন

তাকে স্পর্শ করেছেন। কথার ধ্বনিতরঙ্গ শুধু কি শ্রুতিতে নয়, ত্বকেও স্পর্শের অনুভব নিয়ে আসে?

সেই থেকে বন্ধুত্ব। বয়সে মিল নেই, বিদ্যাবুদ্ধিতে মিল নেই, প্রতিষ্ঠায় মর্যাদায় মিল নেই, তবু একজনের মননের সঙ্গে আর-একজনের মনের মিল হয়েছে। এই বন্ধুত্বকে ঠিক স্নেহ বলা চলে না, তার চেয়ে গাঢ়: প্রীতি বলতেও মন সরে না, তার চেয়েও প্রগাঢ়; তবু প্রেমের সঙ্গে এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। মানসী অসীমের সঙ্গিনী আর ঐতিহাসিকের হাতে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি। নিজেকে একজন রসিক পাঠকের হাতে বই হিসাবে কল্পনা করতে অদ্ভুত লেগেছিল মানসীর। সেই অভিনবত্বের স্বাদ মাধুরী ভাবতে পারে না, অসীমও না।

রান্নাঘর থেকে মায়া এসে হাজির হল, 'সেজদি।'

প্রথম দৌবারিককে মানসী ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে, এবার দ্বিতীয়া।

'কি ব্যাপার?'

'দেখ এসে নন্দুর কাণ্ড। অসীমদা চলে যেতে চাইছেন, আর নন্দু ওঁর বিছানা স্যুটকেস কেড়ে রেখেছে।'

মানসী হেসে বলল, 'কাণ্ডটা তাহলে একজনের নয়, দুজনের।'

কিন্তু মানসীর সঙ্গে দেখা না করে, তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই অসীম সব নিয়ে চলে যাবে? এ-ই বা কি রকম?

মানসী তাড়াতাড়ি অসীমের ঘরে এল।

পাটভাঙা জামা-কাপড়ে অসীম সত্যিই যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে। আর নন্দু তার বিছানা স্যুটকেসের সম্পত্তি আগলাচ্ছে। মা আর মায়া এসে দাঁড়িয়েছে জানলার কাছে। শুধু মাধুরীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মানসী চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নন্দুকে শাসনের সুরে বলল, 'ছিঃ, ও কি হচ্ছে। সরে এসো। আর তুমি একটু বাইরে যাও নন্দু। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

কি করে আদেশ দিতে হয় মানসী তা জানে। শুধু নন্দু নয় মায়াকে নিয়ে সুহাসিনীও সরে গেলেন।

মানসী এক মুহূর্ত অসীমের দিকে তাকাল। মনে হল, যুগ-যুগান্তরের বিচ্ছেদের পর মানসী যেন নতুন করে নিজের ঈপ্সিতকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু অসীম তার দিকে যেন ভাল করে তাকাতে পারছে না; তার চোখ যেন এড়িয়ে যেতে চাইছে অসীম। মানসী মনে মনে বলল, 'ওগো ভীরু, আমি তোমার সব দোষ ক্ষমা করলাম। সব ত্রুটি দুর্বলতা ধুয়ে নিলাম।'

কোন প্রকার ভূমিকা করল না মানসী, কোন প্রশ্ন করল না, কোন কৈফিয়ত চাইল না। যেন কালকের রাতটি একটি দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

আজ ভোরে ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে যেন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে।
মানসী বলল, 'তোমার একটা চিঠি আছে।'

'কিসের চিঠি?' অসীম হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে খামের ওপরের নাম-ঠিকানায় একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'কিন্তু এ চিঠি তো আমার নয়।'

মানসী একটু হেসে বলল, 'তোমার নয়, কিন্তু তোমারই জন্যে। তোমাদের ডেপুটি মিনিস্টার আর প্রিয়গোপালবাবু একই সঙ্গে জেল খেটেছিলেন। সেই সময় থেকে বন্ধুত্ব। তিনি চিঠি লিখে দিয়েছেন। আজই গিয়ে দেখা কোরো। মনে তো হয় একটা সুরাহা হয়ে যাবে।'

অসীম এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে, কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, 'এ চিঠি তো আমার আর কোন দরকার নেই। এ চিঠি আমি নিতে পারব না মানসী।'

'নিতে পারবে না! কেন?'

দুটি প্রশ্নের মধ্যে বিস্ময় আর আর্ততা মাখামাখি হয়ে রইল।

অসীম সেই একই নেতিবাচক জবাবের পুনরাবৃত্তি করল, 'না, তোমার এ চিঠি আমি নিতে পারব না।'

মানসী এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে অসীমের দিকে তাকিয়ে রইল। তার গহন মনের গভীরে গিয়ে যেন বুঝতে চেষ্টা করল, এই নিতে না পারার অর্থটা কি! তারপর পরম ঘৃণায় অসীমের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কাগজগুলি দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'তুমি যখন নিতে পারবে না, এ চিঠি দিয়ে আর কী হবে।'

'মানসী!'

মাধুরী কখন এসে দোরের কাছে দাঁড়িয়েছে। মানসী মুখে কোন সাড়া দিল না, শুধু চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু আশ্চর্য সাহস মাধুরীর। মানসীর সেই চোখকে ভয় করল না, লজ্জা করল না। বরং দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে আরো কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল, তারপর মৃদু কিন্তু স্পষ্টস্বরে বলল, 'মানসী, যদি কিছু বলবার থাকে আমাকে বল। আর কারো কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার, সব অপরাধ আমার—।'

মানসীর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল, যেন নতুন করে ধাক্কা খেল একটা। এই কথা বলবার জন্যেই কি মাধুরী আড়াল খুঁজেছিল? প্রাণভরে পেতে চেয়েছিল এই ত্রুটি স্বীকারের গৌরব? কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল মানসী। বিদ্রূপভরা দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে মাধুরীকে স্তব্ধ করে একটু হেসে বলল, 'চুপ কর দিদি, চুপ কর। এ তো নিরালা ছাদ নয়,

নির্জন পার্ক নয়, বাড়িতে নন্দ, মায়া আছে। তারা কেউ শুনে ফেলবে। তুই চুপ কর।'

ওদের কাউকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে মানসী দোর ঠেলে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বাইরে এখন আর শুধু ঝিলিমিলি নয়, মেঘান্তরিত রোদ এবার প্রখর হতে শুরু করেছে।

বাইরে রোদ. কিন্তু ঘরে তো ছায়া। তবু ঘরের ভিতরে যে ঘর সেখানে যদি আগুন জ্বলে, চারদিকের দেয়াল আর মাথার ওপরে ছাদ একটু রইল কি না রইল, তা নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে যায়।

মানসী ঘরে এসেও জ্বলতে লাগল। যে প্রচণ্ড ক্রোধে, যে তীব্র হিংস্রতায় অসীমের ফিরিয়ে দেওয়া চিঠিখানা সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে ঠিক সেইভাবে এই গোটা দুনিয়াটাকেই যদি অমন কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে পারত. তাহলে যেন বেঁচে যেত মানসী। কিন্তু তা তো আর পারা যায় না। না পেরে নিজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে যে দুনিয়াটা আছে, মানুষ মাঝে মাঝে তাকেই ভেঙেচুরে পুড়িয়ে পুড়িয়ে জগৎ-ধ্বংসের সাধ মিটায়।

হাতের কাছে কোন কাজ না পেয়ে, মনের কাছে কোন অবলম্বন না পেয়ে মানসী নিজের ট্রাঙ্কটা এসে খুলে ফেলল। বড়দির যেবার বিয়ে হয়. বাবা তাকে শাড়ি গয়না ট্রাঙ্ক স্যুটকেস যৌতুক দেওয়ার সময়. মাধুরী আর মানসীকেও একটা করে মাঝারি ধরনের ট্রাঙ্ক দিয়েছিলেন।

মা হেসে বলেছিলেন, 'ও আবার কি. তুমি কি একসঙ্গে তিন মেয়ে পার করতে চাও নাকি।'

বাবা বলেছিলেন, 'কি যে বল। একসঙ্গে তিনজনের বিয়ে দেবার সাধ্য থাকলেও আমি তা দিতাম না। আমার ঘর খালি হয়ে যেত না তাহলে?'

বাবার তখন চাকরি ছিল, আর মনের মায়া-মমতাও এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

বাবা বলেছিলেন, 'ওদের তো জিনিসপত্র রাখবার আলাদা জায়গা নেই—এই ট্রাঙ্কে রাখবে।'

সেই থেকে ট্রাঙ্কটা আছে। মানসী ইচ্ছা করলে বদলাতে পারত. বড় ট্রাঙ্ক একটা কিনতে পারত, কিন্তু কিনি কিনি করে কেনা আর হয়নি। কিনলে তো আর একটা কিনলে হয় না। দিদির জন্যেও কিনতে হয়। দিদিকে মানসী কিসের ভাগই-বা না দিয়েছে। কিন্তু দিদি যে আরো বেশি চাইবে তা কে জানত!

ট্রাঙ্কের ভিতরের গন্ধটা বড় ভাল লাগে মানসীর। এ কি শুধু শাড়ি ব্লাউস ন্যাপথালিনের গন্ধ? এ কি শুধু পিতৃস্নেহের প্রতীক? তাও নয়।

এই ট্রাঙ্কটার মধ্যে যেন আরো অনেক কিছু আছে। অনেক স্মৃতি, অনেক রূপকথা—যে রূপের কথা বলা যায় না, বর্ণনা করা যায় না। বাবা একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'আগেকার দিনের বউ-ঝিদের এই ট্রাঙ্কের মধ্যেই সব থাকত। দেখিসনে তোর মা'র ট্রাঙ্কটা? যত বিষয় বেসাতি সব ওর মধ্যে। কত যে রহস্য, কত যে গোপন কারবার আছে তোর মা'র—।'

মা বলেছিলেন, 'আমার আবার গোপন কারবার কি আছে। সেই চৌদ্দ বছর বয়সে তোমার সংসারে এসেছি। তারপর থেকে কোন্ কথাটা তোমাকে লুকিয়েছি বল? কোন্ কথাটা তোমার অজানা?'

তা ঠিক। অত কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে মা'র কিছু লুকোবার দরকার হয়নি। কিন্তু মানসীর বেলায় তো আর তা ঘটেনি। তার জীবনে ধীরে ধীরে লুকোবার বস্তু এসে জমা হয়েছে। এই যে রঙীন ফিতেয় বাঁধা রঙীন খামের চিঠির তাড়া, এই যে দু-তিন খণ্ড ডায়েরী, নিজের ডায়েরী আর অসীমের ডায়েরী, এগুলিকে তো বাইরে ফেলে রাখবার সাহস হয়নি মানসীর, এগুলি তাকে লুকিয়েই রাখতে হয়েছে। ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রেখেছে রাশ রাশ চিঠি আর চিঠির মধ্যে লুকোন রয়েছে একটি সম্পর্কের মধুর ইতিহাস। রাশ রাশ চিঠি ফের যদি খুলে পড়ে মানসী—সেই পুরোন দিন আবার মৌমাছির মত গুন গুন করে উঠবে। কিন্তু এই গুনগুনানির কোন মানে আর নেই। তা আজ মিথ্যে হয়ে গেছে। কাল যা সত্য ছিল আজ তা মরীচিকা। কাল যা জীবন্ত ছিল আজ তা যাদুঘরের মরা হাড়। কি হবে এই হাড়ের মালা গলায় পরে? এই পরাজয়ের কাহিনীকে বাক্সবন্দী করে রেখে? প্রিয়গোপালবাবুর সুপারিশ চিঠি যেমন ছিঁড়ে ফেলেছে মানসী, অসীমের এই রাশ রাশ চিঠিও সে তেমনি নষ্ট করে ফেলবে। না কি অসীমকে সব ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, 'নাও, তোমার মিথ্যে কথার বেসাতি নিয়ে যা করবার তাই করো। এগুলি তোমার কাজে লাগবে। যখন আর কাউকে চিঠি লিখবে এইসব কথাই তুলে তুলে দিতে পারবে।'

'মানসী, তুই কি আজ অফিসে যাবি নে?' মা এসে দাঁড়িয়েছেন।

মানসী তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করল। বলল, 'হ্যাঁ যাব।'

'তাহলে ওঠ। নাইতে-টাইতে যা। আমার রান্না অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আমার জন্যে তোমাদের দেরি হয়ে গেল একথা কিন্তু বলতে পারবে না।'

মানসী একটু হেসে বলল, 'না মা, তা বলব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

সুহাসিনী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'মানসী, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'বেশ তো, কর না!'

'ঠিক জবাব দিবি তো?'

'তোমার জিজ্ঞাসাটা আগে শুনি।'

সুহাসিনী বললেন, 'কাল থেকে তোর কি হয়েছে বল তো? মুখখানা যেন একেবারে কালিমাখা। কি হয়েছে তোর?'

মানসী মুখে জোর করে একটু হাসি টেনে বলল, 'কিছু হয়নি মা। তোমার দেখবার ভুল।'

সুহাসিনী বললেন, 'আমাকে ভোলাচ্ছিস কেন মানসী। তুই কি তা পারবি? আমি তোর পেটে হয়েছি না তুই আমার পেটে হয়েছিস? ওরে, তোদের মুখ দেখলেই তোদের মনের অশান্তির কথা আমি টের পাই। তোরা খুলে কিছু বলিস আর না বলিস, আমি বুঝতে পারি।'

মানসী ভাবল, সত্যিই কি তাই? মা কি কিছু টের পেয়েছেন? তার লজ্জাকর পরাজয়ের কাহিনী বুঝতে পেরেছেন? ছি ছি ছি। মানসী তা মরলেও স্বীকার করবে না। হোক মা। তবু ওঁর কাছে নিজের অগৌরবের কথা প্রকাশ করবে না। নালিশ করবে না নিজের দুঃখ নিয়ে। কিন্তু জানাতে পারলে যেন ভাল হতো। এমন সহানুভূতি, এমন আন্তরিক সমবেদনা সে আর কার কাছে পাবে? মানসী ছেলেবেলায় ভাবত, মা দিদিকেই বেশি ভালবাসেন! সে ঘর-সংসারের কাজ করতে পারে বলে তার ওপরই মা'র বেশি পক্ষপাত। বড় হবার পর সেই হিংসুটে ভাব আর নেই। মানসী দেখেছে, সংসার চালাবার ব্যাপারে, টাকা-পয়সার হিসেবের সময় মা মানসীর ওপরই বেশি নির্ভর করেন। মাসের শেষে হাতের টাকা ফুরিয়ে গেলে সব ব্যবস্থা করবার ভার মানসীর ওপর ছাড়া মা আর কারো ওপর দেন না। তার বুদ্ধির ওপর, কর্মশক্তির ওপর এই নির্ভরতা মানসীর ভাল লাগে। এই নির্ভরতার দিক দিয়ে মা যেন আরো কাছে আসেন। আরো আপনার হয়ে পড়েন। মা'র মত আপন কেউ নেই। তবু বড় হয়ে গেলে সব কথা তাঁকেও জানানো যায় না। বরং অনেক কথাই গোপন রাখতে হয়। না হলে শুধু ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কোন লাভ হয় না।

সুহাসিনী রান্নাঘরে ফিরে যাওয়ার সময় বললেন, 'বেশ, না বলতে চাস না বলবি। তবু আমি একটা কথা তোকে বলে যাই মানসী। আমি তোদের মুখ্যুসুখ্যু মা। তোদের মত লেখাপড়া শেখার সুযোগ-সুবিধে কিছু পাইনি। তবু আমার কথাটা একটু ভেবে দেখিস। মানুষের দোষত্রুটি ভুলচুকটাকেই সব সময় বড় বলে ধরে রাখিসনে। মানুষমাত্রেই ভুল ত্রুটি হয়, যারা আপন-জন তারা যদি সেই ভুল শুধরে না নেয় তো আর কে শোধরাবে?'

সুহাসিনী চলে গেলেন।

মানসী ভাবল, ও সব কথা বলা সহজ। কিন্তু সত্যি সত্যি ক্ষমা করা সহজ নয়, বোধ হয় উচিতও নয়। এমন অনেক ভুল আছে, আপনই হোক

আর পরই হোক, কেউ তা সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া ভুল বলে যে ব্যাপারটাকে ওদের কেউ স্বীকার করেনি। অসীমকে কোন কথা বলতে না বলতেই মাধুরী বাঘিনীর মত ছুটে এসে মাঝখানে পড়েছে। বলেছে বটে, সব অপরাধ তার। কিন্তু অপরাধিনীর লজ্জা-সংকোচ কি তার কথার মধ্যে ছিল? মানসীর তা মনে হল না। বরং চাপা উল্লাসই ছিল মাধুরীর গলার স্বরে, চোখের দৃষ্টিতে। ছিল বিজয়িনীর গৌরব। আর অসীম? সে একটি প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না, একটু শব্দ পর্যন্ত নয়। বিনাবাক্যে মেনে নিল সে বিজিত হয়েছে। অধিকৃত হয়েছে। তার হৃদয়ের ওপর আর-এক নারী তার জয়পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। চুপ করে থেকে অসীম সবই স্বীকার করে নিয়েছে। এর পর আর মানসীর আশা করবার কি থাকতে পারে?

কালকের মত আজও তাড়াতাড়ি নাওয়া-খাওয়া শেষ করে নিল। কালও সে মনে রাগ নিয়েই বেরিয়েছিল। অসীম নিজের নিশ্চেষ্টতার অভ্যাসকে বদলাতে রাজী নয়, সেইজন্য রাগ। প্রিয়গোপালবাবুর ওপর তার অহেতুক ঈর্ষা আছে এবং তার হাসি-তামাশা ভদ্রতার সীমা পার হয়ে গেছে, সেইজন্য রাগ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি রাগ হয়েছিল মাধুরীর ওপর তার মনোভাবের পরিচয় পেয়ে। মানসীকে এড়িয়ে এড়িয়ে অসীম তার সঙ্গে গল্প করছিল, হাসাহাসি করছিল। তার চোখ লোভ আর বাসনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল। মানসী কি এতই কম বয়সী কাঁচা মেয়ে যে, অসীমের এই উন্মুখতার অর্থ সে বুঝতে পারবে না?

তবু কালকের রাগের মধ্যে একটা আশা ছিল। মানসী ভেবেছিল, তার রাগ আর অভিমান অসীম নিজেই ভাঙাবে। প্রিয়গোপালবাবুর কাছ থেকে সুপারিশ চিঠি এনে সে অসীমকে বিস্মিত করে দেবে। মুখে যাই বলুক, অসীম মনে মনে খুশীই হবে। মফঃস্বল থেকে কলকাতায় আসতে কে না চায়। বিশেষ করে মানসীকে যখন কলকাতায় থাকতেই হবে। সে তো আর বদলী হতে পারে না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে শ্যামও রাখতে হবে কুলও রাখতে হবে। চাকরিও রাখতে হবে সংসারও রাখতে হবে। তাই অসীম কলকাতায় আসবার সুযোগ পেলে সব সমস্যার সমাধান হবে এই কথাই ভেবেছিল মানসী। ভেবেছিল অসীম তাতে সুখী হবে।

কিন্তু একদিনের মধ্যে কি এমন ওলট-পালট হয়ে গেল যাতে মানসীর হিসাব-নিকাশ ভাবনা-ধারণা কোন কাজেই এল না।

ঝোল দিয়ে ভাত মেখে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছিল মানসী। সুহাসিনী বললেন, 'একটু আস্তে আস্তে খা। যদি খানিকক্ষণ আগে এসে বসিস তাহলে

আর এমন নাকে-মুখে গুঁজতে হয় না। তোদের সবই এক সৃষ্টিছাড়া কান্ড।'

মানসী কোন জবাব দিল না।

সুহাসিনী বললেন, 'অসীম নাকি এ-বেলাই চলে যাবে। সেও তো নেয়ে-খেয়ে নিতে পারত। গেল কোথায় সব?'

মায়া বলল, 'ওঁরা যেন কোথায় বেরোলেন মা। এক্ষুণি নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। মেজদিরও তো ইস্কুল-টিস্কুল আছে।'

মানসী একটা বিষম খেতে খেতে বেঁচে গেল। কাল ট্যাক্সিতে করে রাতদুপুর পর্যন্ত বেড়িয়েও সাধ মেটেনি? আবার আজ দিনদুপুরে বেড়াতে বেরিয়েছে? এখন আর লজ্জা-সংকোচের বালাই নেই ওদের, এখন কোনরকম আড়াল রাখবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন ওরা সকলের চোখের ওপরেই যা খুশী তাই করতে পারে। ওরা কি মন স্থির করে ফেলেছে? ভেবেছে, পথের কোনরকম বাধা ওরা রাখবে না? সব কাঁটা তুলে নেবে? তাই ওদের আর কোন ভয় নেই লজ্জা নেই, সংকোচের সব সীমানা ওরা পার হয়ে গেছে?

মানসী বেরিয়ে এসে বাস-স্টপে দাঁড়াল। এরই মধ্যে অফিসযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। কয়েকটি চেনা মুখ চোখে পড়ল। একই পাড়ায় এঁরা থাকেন। রোজ দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আলাপ-পরিচয় নেই। কারো কারো অপলক দৃষ্টি দেখে মানসী বিরক্ত হল। অন্যদিন মানসী সহযাত্রীদের কান্ড দেখে নিজের মনেই হাসে। কিন্তু আজ তার ধৈর্য-স্থৈর্য, সহনশীলতার লোপ পেয়েছে।

এক ভদ্রলোক একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন দেখে মানসী বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। অসীম। মানসী ভাবে, যাদের চক্ষুলজ্জা নেই তাদের পক্ষে এই এক সুবিধে। তারা সব পারে। একজনকে নিয়ে পার্কে হাওয়া খেয়ে এসে অন্তরঙ্গভঙ্গিতে আর-একজনের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে তাদের বাঁধে না। মানসী কোন কথা না বলে একটু সরে দাঁড়িয়ে চুপ করে রইল। যেন আরো পাঁচটা অচেনা যাত্রীর সঙ্গে অসীমের কোন তফাত নেই।

অসীম মৃদু স্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। তুমি আজ নাই-বা অফিসে গেলে।'

মানসী বলল, 'মাফ করো। একজনের একটা কথা শোনবার জন্য অফিস আমাকে ছুটি দেবে না। আমার সে ছুটির দরকারও আর নেই।'

অসীম একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ, তুমি ছুটি নিতে না চাও না নিলে। আমি আসছি তোমার সঙ্গে।'

মানসী রূঢ়ভাবে বলল, 'না, সে চেষ্টা কোরো না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে কেলেঙ্কারী হবে। তুমি তো আমাকে চেন।'

শ্যামবাজারের একটা বাস এসে দাঁড়িয়েছিল। মানসী আর কোন কথা না বলে ভিড় ঠেলে তাতে উঠে পড়ল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, অসীম একবার উঠবার চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত পিছিয়ে গেল। ভিড়ের ভয়ে না মানসীর ভয়ে? একটা লেডীজ সীটের অর্ধাংশ দখল করতে করতে মানসী নিজের মনেই হাসল। খুব খুশী হল মানসী। আর কিছু না হোক, অন্তত এইটুকু অপমান তো করতে পেরেছে, এইটুকু শাস্তি তো দিতে পেরেছে। এতেও যদি ওর পৌরুষে ঘা না লাগে তাহলে পুরুষই নয় অসীম। বেশ হয়েছে, আচ্ছা জব্দ হয়েছে। মানসী এক পরম পরিতৃপ্তির স্বাদ পেল। এই অপমান অসীমকে নিঃশব্দে হজম করতে হবে। কিল খেয়ে কিল চুরি করবার মত মানসীর হাতে নিজের এই লাঞ্ছনার কথা সে কারো কাছে বলতে পারবে না। মুখ চুন করে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, না ঘরে গিয়ে মাধুরীর কাছে নালিশ করবে? মানসী হাসল। কিন্তু সেই নালিশ যদি মাধুরী শোনে? যদি সান্ত্বনা দেয়, আশ্বাস দেয়, আরো আপনার করে কাছে টেনে নেয়? নিশ্চয়ই তাই নেবে! নিশ্চয়ই মাধুরীর মত মায়াবিনী মেয়ে এই সুযোগ হারাবে না। তাহলে তো বড় ভুল করেছে মানসী। ইচ্ছা করে নিজের জেদে নিজের অনিষ্ট করেছে। রাগ করে অভিমান করে নিজেকে দূরে সরিয়ে এনে ওদের কাছাকাছি হবার সুবিধে করে দিয়েছে। ছি ছি ছি, এমন ভুল মানসী কেন করতে গেল? এ তো অপরাধীদের শাস্তিদান নয়, বিচারকের নিজের ওপরই দণ্ডবিধান। বিনা যুদ্ধে বিনা প্রতিবাদে মানসী পিছিয়ে এল, ভীরুর মত এককথায় ছেড়ে দিয়ে এল সসাগরা সাম্রাজ্য। এ কি কাণ্ড করল মানসী? নিজের মূঢ়তার জন্য এবার তার অনুশোচনা হতে লাগল। অন্ধ ক্রোধ আর জেদ তাকে ঠিক পথ দেখায় না; বার বার বিভ্রান্ত করে অন্য পথে নিয়ে যায়—যে পথে হাঁটলে মানসীর নিজেরই ক্ষতি, নিজেরই দু পা অসংখ্য কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়। সব জেনেও নিজেকে বদলাতে পারে না মানসী। বার বার একই ভুল করে। আর পরীক্ষক সেই ভুল লাল কালির আঁচড়ে কাটতে কাটতে চলেন। নিজের রোগ চেনা যত সহজ, চিকিৎসা তত সহজ নয়। কার কথা যেন? অসীমের? চিঠি ভরে অসীমের এইসব জ্ঞানগর্ভ কথা ছড়ানো। জেনারালাইজ করতে পারলে অসীম আর কিছু চায় না। মানসী হাসল। তারপর মুহূর্তের জন্য সব বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কোন্ প্রসঙ্গে কোন্ চিঠিতে অসীম কথাটা লিখেছিল, মানসী তা মনে করতে চেষ্টা করল।

শ্যামবাজার থেকে বাস বদলী করতে হল। দেখে স্বস্তি বোধ করল মানসী; এ বাসে সেই উপচে-পড়া ভিড় নেই। লেডীজ সীটে এক ভদ্রলোক

বসেছিলেন। মানসীকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। মানসী তাঁকে আসনের অর্ধাংশ দিয়ে উদারতা দেখাল।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার বাসের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। সার্কুলার রোড দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে গাড়ি। এই বেগ মানসীর ভাল লাগল। গাড়ি যদি আস্তে আস্তে চলে, কি কোথাও এসে বেশ কিছুক্ষণ থেমে থাকে, সে বড় বিরক্ত হয়। গাড়ি কেন থামবে। গাড়ি কেন আস্তে আস্তে চলবে। গাড়ি আর দ্রুতগতি যেন সমার্থক। জীবনও কি তাই? মানসী নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল, জীবন মানেই কি দ্রুতগতি? সব সময় দ্রুতগতি নয়, কখনো কখনো দুর্গতিও। তবু গতি নিশ্চয়ই। জীবন মানে থেমে থাকা নয়, নিশ্চলতা নয়। এই নিয়ে অসীমের সঙ্গে একদিন তর্ক হয়েছিল। এই বাসে করে যেতে যেতেই। অসীম বলেছিল, 'জীবনের গতি আছে বইকি, কিন্তু সে গতি সব সময় চোখে দেখা যায় না।'

মানসী বলেছিল, 'চোখে দেখা না যাক, অনুভব তো করা যায়।'

অসীম জবাব দিয়েছিল, 'কে অনুভব করছে তার ওপর নির্ভর করে। অনুভূতির শক্তি তো সবারই সমান নয়। কেউ কেউ হয়তো মনে করে ক্লাস-প্রমোশনের মত চাকরি-বাকরিতে, গাড়ি-বাড়িতে প্রমোশন পাওয়াই একমাত্র গতি। গতি মানে ওই একই ধরনের ঊর্ধ্বগতি।'

মানসী বলেছিল, 'কেউ কেউ মানে তো আমি? হ্যাঁ, আমি তা মনে করি। ঐহিক উন্নতিটা আমার মতে গতিরই মধ্যে। যিনি সন্ন্যাসী, যিনি অধ্যাত্ম সাধক তাঁর কথা আলাদা। তিনি আমাদের আলোচনার বাইরে। কিন্তু যিনি সংসারী, গৃহী, তাঁর গতির অন্য কি অর্থ হয় বল? চুরি-ডাকাতি না করে নীতি-নিয়ম মেনে তিনি যদি নিজের শক্তি আর সম্পদ বাড়াতে পারেন তাতে শুধু তাঁর নয়, সমাজেরও উন্নতি। তাতে আর পাঁচজনে তাঁর কাছে সাহায্য পায়। কিন্তু তিনি যদি তা না করেন, তিনি যদি দুর্বল আর দরিদ্র হয়ে থাকেন, তাহলে সারাজীবন তাঁকে আর পাঁচজনের সাহায্য নিয়ে চলতে হয়। সেও একধরনের গতি। তবে আমার মতে সেটা অধোগতি।'

অসীম বলেছিল, 'তোমার মত আমি জানি। কিন্তু কথা হচ্ছে নীতি-নিয়ম মেনে নিজের ব্যক্তিত্বকে অবিকৃত আর অবিক্রিত রেখে সেই ধরনের ঊর্ধ্বগতি সবার পক্ষে সম্ভব কিনা। যাদের পক্ষে তা সম্ভব নয় তারা নিশ্চয়ই অন্য পথ বেছে নেবে। জীবনের সার্থকতার অন্য মানে খুঁজবে। তাদের গতি বাইরে থেকে বোঝা যাবে না, চেনা যাবে না, তবু তাদের জীবন একেবারে গতিহীন নয়। হয়তো একখানা বই পড়ে তারা যে আনন্দ পাবে তার মধ্যে সেই গতির সঞ্চার থাকবে পাতায় পাতায়, পংক্তিতে পংক্তিতে, লেখকের চিন্তাস্রোতের সঙ্গে এক হয়ে যেতে যেতে সেই গতিবেগ তারা

অনুভব করবে। হয়তো নিজের মনে যে নতুন চিন্তা, নতুন রসের উদ্রেক হবে, তার সেই আনন্দের মধ্যে তারা গতির স্পন্দন পাবে। ফুলের মধ্যে গতি, মেঘের মধ্যে গতি, চিন্তার মধ্যে গতি। গতি নানা দিকে, নানা দেশে, নানা স্তরে। গতির অর্থ শুধু অর্থ নয়।'

মানসী হেসে বলেছিল, 'তা তো নয়ই। কিন্তু সাংসারিক জীবনে অর্থকে বাদ দিয়েও কিছু হয় না। সেই বই পড়ার শান্তি, ফুল আর মেঘ দেখার শান্তি, চিন্তার স্বাধীনতা, কিছুই দরিদ্রের জন্যে নয়। দারিদ্র্য যে কি তা আমি জানি। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম কাকে বলে, তা মানুষকে কতখানি নিচে নামিয়ে আনতে পারে, তা আমি বাবাকে দেখে জেনেছি। দরিদ্রের একটি-মাত্র চিন্তাই আছে, তার নাম অন্নচিন্তা।'

অসীম বলেছিল, 'তেমনি ধনীর একটিমাত্র চিন্তাই আছে, তার নাম অর্থচিন্তা। ক্ষমতাবানের একটিমাত্র চিন্তাই আছে—আধিপত্য বৃদ্ধির চিন্তা। অন্য সবরকম ঐশ্বর্যের উপভোগ থেকে সে বঞ্চিত। তা ছাড়া দারিদ্র্য কথাটা রিলেটিভ। তুমি যাকে দারিদ্র্য বল, আমি হয়তো তাকে দারিদ্র্য বলি না। প্রেমের জন্য তোমার হয়তো একটি প্রাসাদের প্রয়োজন, কিন্তু আমার কাছে প্রেমই প্রাসাদ।'

মাধুরীর সঙ্গেও এই নিয়ে মানসীর অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। শুধু ঘরে নয়, ছাদে নয়, পার্কে নয়, সিনেমা হলে নয়—স্কুলের লম্বা ছুটির দিনে মাধুরী কতদিন তাকে বাসে করে অফিস পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে। নানা আলোচনার মধ্যে এসব আলোচনাও হয়েছে তার সঙ্গে। মানসী লক্ষ্য করেছে, অসীমের মতের সঙ্গে মাধুরীর মোটামুটি মিল আছে। মাধুরীও বলে, নিজেদের মধ্যে ভালবাসা থাকলে কুঁড়ে ঘরে থেকেও শান্তি। নামে দরকার নেই, ধামে দরকার নেই, কর্মে প্রয়োজন নেই, শুধু প্রেম। কিন্তু মানসী এই নিরবয়ব প্রেমে বিশ্বাস করে না। অমূল তরু দু-দিনেই শুকিয়ে যায়। অসীম, তুমি ভুল বুঝেছ। প্রেম মানে আমার কাছে শুধু প্রাসাদ নয়, প্রেম মানে পৌরুষ। সেই পৌরুষ কখনো কখনো প্রাসাদও গড়ে। সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে ব্যবসা-বাণিজ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে সেই পৌরুষ আপনার জায়গা খুঁজে নেয়। আর তাতেই সভ্যতা এগোয়, সংস্কৃতির বিস্তার হয়। সব কিছুর মূলে পৌরুষ। তার সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা। সব কিছুর মূলে পৌরুষ। আর সেই মূলে রসসিঞ্চন করবার জন্যে আছে প্রেম। মূলকে তা শুধু সরস করে না, সতেজও করে। ফলবান করে। সেই তেজ আর রস তার ডালে-ডালে ফুলে-ফলে পাতায়-পাতায়। নিষ্ফল প্রেমে আমার বিশ্বাস নেই। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ অসীম। তুমি আমাকে বুঝতে পারনি, নাকি ইচ্ছা করেই বুঝতে চাওনি!

মাধুরী কি তাকে অন্যরকম বুঝিয়েছে? সে কি বলেছে, 'আমি কুঁড়ে ঘরের বেশি কিছু চাইনে। সেই ঘরেই আমি তোমার জন্যে স্বর্গ রচনা করব। আমি তোমাকে বদলাতে চেষ্টা করব না, শোধরাতে চেষ্টা করব না, বাড়াতে চেষ্টা করব না, তুমি যা আছ আমি তাতেই সন্তুষ্ট থাকব। আমি তোমার নাম চাইব না, খ্যাতি চাইব না, কীর্তি চাইব না, তোমার দেহ আর দেহজাত সুখকগুলি অভ্যাসের মধ্যেই আমি তৃপ্ত থাকব।'

মাধুরী কি এই আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে জয় করে নিয়েছে?

অসীম একদিন একটু ঠাট্টার সুরে বলেছিল, 'মানসী, তোমার আকাঙ্ক্ষা অত্যুচ্চ। আমার ভয় হয় আমি কোনদিনই পাল্লা দিয়ে উঠতে পারব না।'

নিজের আকাঙ্ক্ষার উচ্চতাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে মাধুরী কি তাকে অভয় দিয়েছে? বলেছে, 'তোমার ভীরুতাই আমার আশ্রয়, আমাদের যৌথ-জীবনের ভিত, তোমার ভীরুতাই আমার ভালবাসা?'

তাই যদি বলে থাকে, তাহলে ওরা একসঙ্গে থাকুক, সে-ই ভাল। যে অসীমকে নিয়ে মাধুরী ঘর বাঁধবে সে আর-এক অসীম। সে অসীম মানসীর অসীম নয়। যে অসীমকে সে ভালবেসেছিল, ভালবাসার শক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিল—মাধুরীর অসীম নিশ্চয়ই সেই অসীম হবে না। ঘর আর উঠান আর অফিসের চেয়ার-টেবিলের চতুঃসীমায় বন্দী নিতান্তই এক সীমাবদ্ধ গৃহস্থ। রাম শ্যাম যদু মধুর মতই শুধু ছেলেমেয়ের জন্মদাতা, তাদের পালক আর পোষাক। আগুন থেকে ভস্মে রূপান্তরিত সেই অসীমের স্ত্রী মাধুরী নিশ্চয়ই মানসীর সপত্নী হবে না। মানসী হাসিমুখে, প্রসন্ন মনে তাদের সেই সংসারে বেড়াতে যেতে পারবে, যেমন অন্য কোন বিবাহিতা বান্ধবীর ঘরকন্না দেখতে যায়। বলা যায় না, হয়তো ওদের ছেলেমেয়ের জন্যে কিছু উপহার-টুপহারও নিয়ে যাবে। তাদের খুশীর কলধ্বনি শুনতে শুনতে গৃহী আর গৃহিণীর মুখে তৃপ্তির, তুষ্টির ভোঁতা হাসি দেখে মানসী মনে মনে পরম কৌতুক বোধ করবে। সেদিনের সেই কুঁড়ে ঘরের, শান্তির নীড়ের উড়তে-ভুলে-যাওয়া বিহঙ্গ কি পূর্বজন্মের মানসীকে দেখে চিনতে পারবে? যে তার জীবনে ঝড়ের মত এসেছিল, আগুনের মত জ্বলেছিল আর জ্বালিয়েছিল? পারবে না, কিছুতেই চিনতে পারবে না। পারলেও চিনতে চাইবে না। গৃহস্থের ঝড়কে বড় ভয়, আগুনকেও বড় ভয়।

নাই-বা চিনল। তাতে কিছু এসে যাবে না। মানসী হাসিমুখে যাবে, হাসিমুখে বেরিয়ে আসবে। সেদিনের অসীম যেমন আজকের অসীম থাকবে না, সেদিনের মানসীও তেমনি আজকের মানসী থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আলাদা সুখ-দুঃখ, আলাদা আশা-আকাঙ্ক্ষা, আলাদা মন, আলাদা মানসী।

কণ্ডাক্টর ডাকল, 'চিড়িয়াখানা, চিড়িয়াখানা।' বাসটা দাঁড়িয়ে গেল, অনেক যাত্রী নেমে পড়েছে। বছর দুই আগে এক ছুটির দিনে অসীমকে জোর করেই এই চিড়িয়াখানায় নিয়ে এসেছিল মানসী। অসীম কিছুতেই আসতে চায় না। বলেছিল, 'চিড়িয়াখানার আবার কি দেখব। ওটা নাবালক নাবালিকাদের জন্যে। তোমরা মেয়েরা বালিকা বয়স কোনদিনই পার হও না, তাই জন্তুজানোয়ার তোমাদের চিরকাল আনন্দ দেয়।'

মানসী বলেছিল, 'আর তোমাদের মত জন্মবুড়ো পুরুষের জন্যে বুঝি শুধু মিউজিয়াম? আমি মেয়ে-পুরুষের এই ভেদ মানিনে। আমি মিউজিয়াম দেখেও খুশী হই, জীবজন্তু দেখেও আনন্দ পাই। আমার তো মনে হয় যাদুঘরে যাওয়ার চেয়ে জন্তুজানোয়ারের সংস্রবে তোমার বেশি আসা উচিত।'

অসীম জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন?'

মানসী হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'যাও, জানি না।'

দু-ঘণ্টা আড়াই-ঘণ্টা সেদিন চমৎকার কেটেছিল। ঔচিত্য-অনৌচিত্যের কথা কারোরই কিছুমাত্র মনে ছিল না। সাপে বাঘে সিংহে হাতীতে অসীমের উৎসাহ ঔৎসুক্য যে কিছু কম সেদিন তা মনে হয়নি।

মানসী ওকে বদলে নিতে পারত। যদি সময় পেত, নিশ্চয়ই বদলে নিতে পারত। কিন্তু আর সময় নেই। মানসী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, আর সময় নেই।

লাইব্রেরীর সামনে নেমে পড়ল মানসী। মণিবন্ধের ঘড়িতে একবার চোখ বুলাল। অফিসে ঠিক সময়েই এসে পৌঁচেছে। অন্য জায়গায় লেট হলেও এখানে অন্তত লেট হয়নি মানসী। আজও নয়।

এও উদ্যান। একটু আগে জন্তুর উদ্যান ছাড়িয়ে এসেছে মানসী: এখন গ্রন্থের উদ্যান। জড় নয়, এও জীবন, হয়তো মহত্তর জীবন। প্রথম যেদিন আসে, জীবিকার জন্যে নয়, জ্ঞান অর্জনের জন্যে মানসী আরো দুটি সহ-পাঠিনীর সঙ্গে এসেছিল এখানে। কিন্তু গ্রন্থজগতের জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের আগে শ্যামে-সবুজে ঘেরা এর বিস্তৃত উদ্যান দেখেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সিঁড়ির ওপরে উঠে লাইব্রেরী থেকে মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়েছিল মানসী। সম্মুখ আর পশ্চাৎ দুটি চোখের সঙ্গে বাঁধা। যেদিকে তাকাও সেদিকেই সম্মুখ, সেদিকেই মুখ। সেদিন অবশ্য তাই-ই মনে হয়েছিল মানসীর: মনে হয়েছিল, এই পৃথিবী অবিমিশ্র সুখের আধার। এর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল, কিন্তু চার ভাগই মধু। মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

সহপাঠিনী ললিতা বলেছিল, 'কিরে, তুই যে বাইরের শোভা দেখেই মজে গেলি। ভিতরে ঢুকবিনে?'

মানসী বলেছিল, 'ঢুকব। যাই বলিস, জায়গাটা কিন্তু বেশ ভাল। নিরিবিলি নির্জন। সেই যাকে বলে, নগরের কোলাহল নাহি আসে কানে। পড়াশুনোর উপযুক্ত জায়গা।'

ললিতা বলেছিল, 'যারা কালেভদ্রে আসে কি শখের পড়া পড়তে আসে, কি পড়ার নামে বেড়াতে আসে, তাদের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। কিন্তু ভেবে দেখ্, যারা দূরে থাকে তাদের অসুবিধে কত বেশি। তাদের যাওয়া-আসায় কতগুলি করে পয়সা লাগে, আর সময়।'

সেদিন সময় আর অর্থের অমন চুলচেরা হিসাব ভাল লাগেনি মানসীর। ললিতার মুখে পয়সা কথাটা বড় স্থূল শুনিয়েছিল। মানুষের অর্থ-সামর্থ্যকে একেবারে পয়সার হিসাবে নামিয়ে আনলে যেন বড় বেশি নেমে আসা হয়। মানসী সেদিন বলেছিল, 'সব বিষয়েই ভাল-মন্দ সুবিধে-অসুবিধে দুটো দিক আছে। এখানে এই একপ্রান্তে সরিয়ে না এনে লাইব্রেরীকে যদি বউবাজার বড়বাজারের হাটের মধ্যে ভরে রাখা হতো তাহলেই কি ভাল হতো ভেবেছিস? এমন প্রশস্ত জায়গা, এমন চমৎকার পরিবেশ মিলত আর কোথাও?'

দুদিন যেতে না যেতেই অবশ্য মানসী মনে মনে ললিতার দলভুক্ত হয়েছিল। তখন তো আর চাকরি-বাকরি ছিল না। ট্যুইশন সম্বল। লাইব্রেরীয়ানশিপ, পড়ার খরচ নিজেকেই জোগাতে হতো। মাইনে বইপত্রের দাম কিছুই বাবা কি দাদার কাছ থেকে পারতপক্ষে নিত না। সপ্তাহে এখানে একদিন কি দুদিন আসত। সেই যাতায়াতের ব্যয়টাকে মনে মনে পয়সার হিসাবেই গুনতে হতো। মুখে কিন্তু তা স্বীকার করত না মানসী। যখন ট্যুইশন থাকত না, খুবই অসুবিধায় পড়তে হতো। দিনান্তে চা-টোস্টের পয়সার পর্যন্ত টান পড়ত। কিন্তু নিজের অভাব-অনটনের কথা কারো কাছে মুখ ফুটে বলত না মানসী। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেও নয়। কেউ কেউ টের পেয়ে বলত, 'মানসী বড় শক্ত মেয়ে। ও ভাঙে, তবু মচকায় না।'

মানসী ভাবত, কেন মচকাবে? হৃদয় ভাঙলেই পা মচকাবে কেন? মুখ শুকোবে কেন?

অ্যাটেনড্যান্স খাতায় নাম সই করল মানসী। আর একটি দিনের শুরু। সে যে কাজ করতে এসেছে, সেই আগমনবার্তার স্বাক্ষর। যখন ছাত্রী ছিল, গুণী আর মানী ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সংগ্রহের শখ ছিল। ছোট খাতা ভরে তুলেছিল তাঁদের নামাবলীতে। একজন লেখক সই করতে করতে মৃদু হেসে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'একদিন তুমিও হয়তো অটোগ্রাফ দেবে।'

সে আশীর্বাদ ফলেনি, হয়তো কোনদিন আর ফলবেও না। কিন্তু তাতে খুব বেশি আফসোস হয়নি মানসীর। এক ধরনের অটোগ্রাফ সে তো রোজই দিয়ে যাচ্ছে। অফিসের এই হাজিরাখাতায় নিজের কর্মজীবনের সাঙ্কেতিক স্বাক্ষর। একদিক থেকে ধরতে গেলে এই স্বাক্ষরের কোন মূল্য নেই। এই সই শুধু অ্যাকাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্টের হিসাব-নিকাশের জন্যে। কিন্তু আর একদিক থেকে দেখলে মাস-মাইনের হিসাবে দৈনিক অর্থমূল্য ছাড়াও আরো বড় অর্থগৌরব এই স্বাক্ষরের মধ্যে আছে। এই স্বাক্ষর তার কর্মজীবনের প্রতীক। এই স্বাক্ষর 'প্রতিদিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকার' প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের মূল্য অসীম। অসীম, অসীম। এই শব্দটির মধ্যে কি সীমাহীন সুখই না একদিন লুকিয়েছিল!

সহকর্মিণী অপর্ণা হাত থেকে খাতাটা টেনে নিয়ে বলল, 'হল তোমার ? নাম সই করছ না কবিতা লিখছ ?'

মানসী হেসে বলল, 'কবিতা লিখছি।'

অপর্ণা বলল, 'ব্যাপারটা সেইরকমই মনে হচ্ছে। আমরাও সই-টই করতে জানি। একেবারে নিরক্ষরা নই।'

অপর্ণার পর রেবা, সীমা, শিখা, মনীষা, পরেশবাবু, সুনীলবাবুদের সইয়ের পালা চলতে লাগল।

নিজের চেয়ারে স্থির হয়ে বসল মানসী। এই কাজের আসনই সত্যি-কারের সিংহাসন। সুখাসন যোগাসন। 'দু-হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই।' শুধু মন দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে নয়। মানসী জানে, সবাই সে কথা ভাবে না। কেউ কেউ আছে যাদের কাছে মন নেই, সুখ নেই যেমন অসীম। সে কাজ থেকে কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কখনো সশরীরে, কখনো শুধু মনে। এই কর্মভীরু মানুষটিকে মানসী কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারল না। যে কাজকে ভয় করে, তার ভয় কিছুতেই যাবার নয়।

অসীম একদিন হেসে বলেছিল, 'কাজকে ভয় করলে হবে কি, কাজের মানুষকে ভালবাসি, কাজের মেয়েকেও ভালবাসি। যারা কাজ করে, তাদের কথা দিয়ে বন্দনা করাই আমার কাজ।'

মনে মনে খুশী হয়েছিল মানসী। তা ঠিক। বন্দনা ও করতে জানে। ওর কথার ঝঙ্কার সারাদিন কানে বাজে, কথার আলো সারা দিন-রাত মনের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে।

মানসী মুখে কিন্তু সেই মহিমা স্বীকার করেনি, হেসে বলেছিল 'বন্দনার বাংলা মানে চাটুকারিতা। যারা কাজ জানে না, কাজের মানুষকে তাদের খোশামোদ করতে জানতে হয়। তোমার বিদ্যেটা যদি যথাস্থানে খাটাতে তা সুদে-আসলে বাড়ত।'

অসীম জবাব দিয়েছিল, 'সেই বুদ্ধি আমি চাইনে মানসী।'

রিডিং-রুমে দু-চারজন করে অধ্যয়নপ্রার্থী আসতে শুরু করেছে। এবেলা তারা সংখ্যায় কম। দুপুরে, বিকেলে এই ঘর ভরে যাবে। সবাই যে গুরুতর বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করতে আসে তা নয়। কেউ কেউ দুষ্প্রাপ্য বই খোঁজে। কেউ-বা এখানে এসেও সুলভ নভেল-নাটকের মধ্যেই মজে থাকতে ভালবাসে। কেউ আসে শুধু এই পরিবেশের জন্যে, কেউ চায় বন্ধু-বান্ধবের সান্নিধ্য-সুখ। মানসীর কিছু অজানা নেই। প্রথম প্রথম সে বিরক্ত হতো। যারা অনধিকারী, তারা কেন অপ্রয়োজনে সত্যিকারের বিদ্যার্থীর জায়গা জুড়ে বসে থাকবে? কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানসীর মনে সহনশীলতা এসেছে। আহা আসুক। এই বিরাট গ্রন্থশালার আশ্রয়ে আবহাওয়ায় তারা নিঃশ্বাস নিক। যদি সস্তা নভেল-নাটকও এখানে এসে পড়ে, পাড়ার রকে বসে আড্ডা-ইয়ার্কি দেওয়ার চেয়ে, কি আরো পাঁচটা দুষ্কর্ম করার চেয়ে তা ঢের ভাল। রুচি কি একদিনে বদলায়? একদিনে গড়ে ওঠে? পাঠের রুচি, শিল্পের রুচি, জীবন-যাপনের রুচি, সব রুচি সম্পর্কেই সেই কথা।

করেস্‌পণ্ডেন্স্‌ ফাইলটা টেনে নিল মানসী। কোচবিহারের এক অধ্যাপক বাঙলার পারিবারিক জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একখানি বই লিখছেন। তাঁর সহায়ক বইপত্রের সন্ধান মানসীকে দিতে হবে। অফিসারের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে কাল পরামর্শ নিয়ে এসেছে মানসী। আজ সেই পরামর্শকে ভাষায় রূপ দিতে হবে। শুধু কি সমাজ-বিজ্ঞান? দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা—জ্ঞানবিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যা হাত দিয়ে না ছুঁতে হয় মানসীকে। লেখকসূচী আর গ্রন্থসূচী। মানসী এই সূচী-শিল্পের শিল্পী। ভাগ কর, সাজাও, তালিকা কর, নির্দেশ দাও, সন্ধান দাও—কোথায় কোন্‌ বই আছে, কোথায় কোন্‌ বস্তু পাওয়া যাবে। তার বেশি নয়। এই বিরাট গ্রন্থশালার দ্বারদেশে তুমি শুধু তকমা-আঁটা দ্বারী হয়ে থাকবার জন্যে এই বিপুল রসভাণ্ডারের প্রহরী; রসাস্বাদন তোমার জন্যে নয়, সেই অতল জ্ঞানসিন্ধুর গভীরে নিমজ্জন কোনদিন তোমার সাধ্যে কুলোবে না।

মানসী এখানে এসে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এক ক্ষুদ্র আসনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সহকর্মীদের মধ্যে কারো সঙ্গে সহ-যোগিতা, কারো সঙ্গে গোপনে গোপনে প্রতিযোগিতা চলে। অনেককে আদেশ, মানে দু-একজনকে আদেশ দিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়। কিন্তু আজ মানসীর হঠাৎ খেয়াল হল, সব তুচ্ছ, সব বাহ্য। এই বিরাট গ্রন্থরাজ্যের সীমানায় দাঁড়িয়ে সে শুধু রক্ষিণীর কাজ করে চলেছে। জ্ঞানের কোন একটি বিভাগের সে স্বাদ নিচ্ছে না, গ্রহণের আগ্রহ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে।

মানুষের সৃষ্ট সংগৃহীত এই জ্ঞান আর রসের ভাণ্ডারের কথা ভেবে মানসী মুহূর্তের জন্যে নিজেকে হঠাৎ ভারি অসহায় বোধ করল। যেমন ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে রাত্রির অসংখ্য তারায়-ভরা অসীম আকাশের দিকে চোখ পড়লে সেই বিপুল বিস্ময়ের কাছে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, বাসনা কামনা তুচ্ছ হয়ে যায়, তার কথা মনেই পড়ে না। এই অসংখ্য অক্ষরের তারায় খচিত জ্ঞানের আকাশও তার মনে সেই বিস্ময়রসের আভাস এনে দিল। সবচেয়ে বিস্ময়কর, এ আকাশ মানুষের নিজেরই সৃষ্টি, এর তারার মালা তার নিজেরই চিন্তার স্ফুলিঙ্গে গাঁথা, তার নিজেরই হৃদয়-রহস্যে ভরা। মানসীর মনে পড়ল—মহাকাশ নয়, রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারের তুলনা দিয়েছিলেন মহাসমুদ্রের সঙ্গে: 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।'

পরীক্ষার খাতায় পাঠাগার নিয়ে যে প্রবন্ধ লিখবে, উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করতে পারবে বলে এক সময় কথাগুলি মুখস্থ করে রেখেছিল মানসী। সেই মুখস্থবিদ্যা কাজে আসেনি। পাঠাগার নিয়ে প্রবন্ধ তাকে লিখতে হয়নি। এই বিরাট গ্রন্থশালার মধ্যে দিনের পর দিন কাজ করতে করতে সেকথা মনে পড়েনি। কি আশ্চর্য, আজ মনে পড়ল। আজ যখন মন আর-এক বেদনায় অভিভূত, আর-এক বেদনায় জর্জর, তখন হঠাৎ মনে এল, প্রেমের বঞ্চনার চেয়ে মূঢ়তার বেদনা আরো বেশি, জ্ঞানের দৈন্য আরো বেশি দুঃখের আর লজ্জার। একমাত্র জ্ঞানই কি মানুষকে সব দুঃখ, সব ভয় আর ভাবনা থেকে মুক্তি দিতে পারে? সব তৃষ্ণা আর বাসনার সমুদ্র পার হতে শিখায়? কিন্তু জ্ঞানের কি সীমা আছে? খানিকদূর এগিয়ে সব মানুষকেই তো শেষে একদিন সেই পরমজ্ঞানী সক্রেটিসের মত বলতে হবে, 'কিছুই জানি না আমি, এই মাত্র জানি।' কিছুই জানি না, কিছুই জানতে পারব না, এই কথা জানবার জন্যেই এই বিপুল গ্রন্থশালার সৃষ্টি, এই বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের আয়োজন! কিছুই জানি না, কিন্তু জানবার চেষ্টা করি, সেই চেষ্টার মধ্যেই জীবন, সেই সন্ধানের মধ্যেই কি মানুষের সিদ্ধি আর সার্থকতা? সেই মহৎ বেদনার, মহত্তর উপলব্ধির মধ্যেই কি মানুষ নিজেকে বার বার খুঁজে পায়?

হঠাৎ মানসী যেন যুগ-যুগান্তরের অগণিত জ্ঞানান্বেষী মানুষের সান্নিধ্য অনুভব করল। তাদের জয়ের গৌরব, পরাজয়ের বেদনা উপলব্ধি করল। বিদ্যা দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, শুধু বোধ দিয়ে সেই বিপুল মানব-ইতিহাসকে

...য়ে এল; শিশু যেমন তার দু-চোখের বিস্ময় আর আনন্দ দিয়ে অসীম ...াশকে স্পর্শ করে।

মানসী চোখ তুলে দেখল, রিডিং-রুমের অনেকগুলি আসন এবার ভরে ...ঠেছে। তরুণ জ্ঞানান্বেষীর দল। এদের অনেকের মুখ মানসীর চেনা। ...রো কারো নামও জানে। শুধু নাম আর মুখ। তাতেই আনন্দ, তাতেই ...। মানসীর মন এক গভীর আশ্বাসে ভরে উঠল। সেবায় আনন্দ, ...য়তায় আনন্দ, নিজের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাওয়ায় আনন্দ। তার ...য় বড় আনন্দ যেন কেউ কামনা না করে। তার চেয়ে বড় কিছু নেই। ই গ্রন্থশালায় নিজের অস্তিত্বকে যেন নতুন করে অনুভব করল মানসী, ...তুন সার্থকতার স্বাদ পেল।

প্রসন্ন মুখে নিজের কাজে মন দিল মানসী। কিন্তু বইয়ের তালিকা ...খতে লিখতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বিদ্যার্থী অসীমও এসে মাঝে মাঝে ...টি আসন দখল করে বসত। কিন্তু সব দিন কি বইতে মন থাকত তার? ...ট চোখ অক্ষরের শাসন মানত?

সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি যুক্তির স্তর ভেদ করে বাসনা-রঙীন আর-এক বেদনার ...কুর ফের মাথা তুলেছে। কিন্তু মানসী তাকে কিছুতেই বাড়তে দিল না। ...জের মনকে অনুশাসনে বাঁধল। ফাইল আর বইপত্রের আড়ালে সেই উদ্গত ...কুরকে অদৃশ্য করে রাখল মানসী।

তিন ঘণ্টা নিশ্ছিদ্র কাজের পর খানিক বিশ্রাম। চা খাওয়ার জন্যে ...ন্টিনে এল মানসী। অপর্ণা পিছু নিল। এগিয়ে এসে হেসে বলল, ...পার কি? আজ যে বড় এড়িয়ে এড়িয়ে চলছ।'

মানসী বলল, 'আমি কোন্ দিনই-বা জড়িয়ে জড়িয়ে চলি। আগেকার ...ই বঙ্গললনা তো নই যে,—ঘাটের পথে চলতে গিয়ে শরমে যায় পা জড়িয়ে।'

অপর্ণা বলল, 'বিয়ে-টিয়ে এখনো করনি, তাই এত বড়াই করতে পারছ। ...বার শ্বশুর-ঘরে গিয়ে ঢুকলে বুঝতে পারবে পা জড়ায় কি না জড়ায়।'

মানসী মৃদু হাসল। অপর্ণা সম্প্রতি শ্বশুরঘরে ঢুকেছে। সেই ...ভজ্ঞতার কথা প্রায়ই সে শোনায়। বাপের বাড়ির মত স্বাধীনতা শ্বশুর-...ড়িতে মেলেনি। বাইরের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ মেলামেশার ...পারে শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুশাসন মেনে নিতে হয়েছে। স্বামীরও সায় ...ই দিকে। কিন্তু বিয়ের পর অপর্ণা চাকরি করতে পারবে না এমন কোন ...শঙ্কা দেখা দেয়নি। বাপের সংসারই হোক, শ্বশুরের সংসারই হোক, টাকার ...কার। আর সে দরকার দিনে দিনে নিঃশ্বাসে বাড়ে। সে টাকার প্রবেশ-পথ ... বেশি খোলা থাকে ততই ভাল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্যদিক ...ক। অপর্ণার বাবা তাঁর মেয়ের উপার্জনের ওপর অনেকখানি নির্ভর

করতেন। কন্যাদান করবার সময় দক্ষিণাটাও ধরে দিতে হয়েছে। ফলে টানাটানি চলছে সে সংসারে। অপর্ণার দুই কুল রক্ষা করা দায় হয়ে পড়েছে ভাইবোনদের স্কুলের মাইনে বাকি পড়েছে শুনলে তার মন খারাপ হয়। আবার স্বামী আর শ্বশুর-শাশুড়ীর অসন্তুষ্টির ভয়ও আছে। তাছাড়া ওর বাবাও আগের মত মেয়ের কাছ থেকে সহজে টাকা নিতে পারেন না। তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। ভারি মুশকিলেই পড়েছে অপর্ণা। তার পক্ষে টাকা এখন দেওয়াও কঠিন, না দেওয়াও কঠিন।

অপর্ণা তার একজন পরিচিত ভদ্রলোককে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল মানসী তার জন্যে অপেক্ষা না করে ক্যাণ্টিনের ভিতরে ঢুকে কোণের একটি চেয়ার নিয়ে বসল। এখানে এখন জায়গা মেলাই শক্ত। আহারাথীর দল গিজ গিজ করছে। চেনা মুখ, অচেনা মুখ। কারো সঙ্গে সামান্য আলাপ আছে, কারো সঙ্গে নেই। কারো চোখ পরিচয়ে উদ্ভাসিত, কারো চোখে অপরিচয়ের আঁধার। চা আর অমলেটের অর্ডার দিল মানসী। অপর্ণা আর এল না। বোধ হয় অন্য কোথাও বসেছে। মানসী ভাবল, অপর্ণার সমস্যা অনেকটা ঠিক তাদের বাড়ির মত। মানসী যদি এখন বিয়ে করে, তার অবস্থাও ঠিক ওই রকমই হবে। সেও কি আর এখনকার মত বাবাকে পুরোপুরি সাহায্য করতে পারবে? মানসী হাসল। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাবার আর তার দরকার নেই। বিয়ে আর তাকে করতে হবে না। অপর্ণার মত সমস্যা জীবনে হয়তো কোনদিনই আসবে না। মানসী পরম নিশ্চিন্তভাবে যেমন আছে তেমনি থাকবে। চাকরি করতে করতে বুড়ো হবে। বেশি বুড়ো হয়ে গেলে চাকরি আর করতে হবে না। তারপর? তারপর আর কিছু নেই। তারপর দিগন্ত জুড়ে অন্ধকার আর শূন্যতা। কিন্তু একি অবসাদ! একি হাহাকার তার মনে! জ্ঞানে যার আনন্দ, কর্মে যার আনন্দ—এই নৈরাশ্য কি তার সাজে? মানসী কিছুতেই হার মানবে না। ভবিষ্যতে সেই সঙ্গীহীন জীবন যদি শূন্যতা হয়, সেই শূন্যতাকেই সে বরণ করে নেবে তবু অপমানের কাছে সে মাথা নোয়াবে না।

'মানসী!'

পুরুষের গলায় নিজের নাম শুনে মানসী চমকে সামনের দিকে তাকাল না অসীম নয়, উৎপল রায়।

কলেজের পুরোন সহপাঠী।

'একা একাই চা খাচ্ছ?'

মানসী হেসে বলল, 'খাবে?'

উৎপল সামনের চেয়ারটা ফাঁকা দেখে তাতে বসে পড়ে বলল, 'যদি খাওয়াও তো খেতে পারি। নিজের পকেট ফাঁকা।'

মানসী বলল, 'আচ্ছা, সেজন্যে ভেব না। শুধু চা? না আর কিছু খাবে?'

উৎপল বলল, 'না। শুধুই চা। বেশি ঋণী হতে ভরসা পাইনে। তোমাদের তো চিনি।'

মানসী বলল, 'চেন নাকি? এমন আত্মবিশ্বাস কোত্থেকে এল? তোমাদের মধ্যে যাঁরা বিষয়ী, সত্যিকারের জ্ঞানী, তাঁরা কিন্তু বলেছেন, আমাদের চরিত্র মানুষ তো ভাল, দেবেরও দুর্জ্ঞেয়।'

উৎপল বলল, 'তা হতে পারে। কিন্তু আমি সর্বস্ব খুইয়ে তোমাদের একজনকে চেনার জ্ঞানটুকু সঞ্চয় করে রেখেছি।'

মানসী একটু হেসে উৎপলের দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল। ও নিশ্চয়ই গীতা সান্যালের কথা বলছে। এক সময় ম্যাগাজিন আর সংস্কৃতি শাখা নিয়ে গীতাও মেতে উঠেছিল। সেই শাখা-প্রশাখার মধ্যস্থতায় ওদের বন্ধুত্ব ফুলে-পল্লবে ভরে উঠল। হিংসুটে বন্ধুদের মুখে মুখে আরো পল্লবিত হল। সবাই ভাবল, ওরা কলেজের সীমানা পার হয়েই একেবারে সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে ঢুকবে। কাকে কাকে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে ডাকবে তাই নিয়েও জল্পনা-কল্পনা চলল। কিন্তু পরীক্ষার ফল হল অকল্পনীয়। গীতা গণিতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়ে বেরোল, আর গেজেটে উৎপল রায়ের নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। উৎপল ঠাট্টা করে বলল, 'মেয়েরা যে ভিতরে ভিতরে হিসেবী তার আর-একবার প্রমাণ পাওয়া গেল।'

গীতা কিন্তু হাসল না। তার গম্ভীর মুখ দেখে সবাই দুঃখ করল, 'আহা, অনার্স পেয়েও বেচারা পুরো সুখ পেল না।'

তারপর কি যে ব্যাপার ঘটল। দ্বিতীয় বছরেও উৎপল বি.এ-র চৌকাঠ ডিঙাতে পারল না। তারপরের বছর পরীক্ষার ধারে-কাছে ঘেঁষল না। আর গীতা এই অঘটনের দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে দিব্যি আর একটি প্রথম সারির আসন নিয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে অবলীলায় বেরিয়ে এল।

কিন্তু গীতাকে দোষ দেওয়া যায় না। ও আরো অনেকদিন অপেক্ষা করেছিল। মানসী তা জানে। গীতা বলত, পরীক্ষার খাতা ছাড়াও কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্র পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন না কোন দিকে উৎপল সেই যোগ্যতার পরিচয় দিক। গীতা ততদিন কলেজে পড়াবে আর বসে বসে বরমাল্য গাঁথবে। কিন্তু চঞ্চলচিত্ত নিষ্ঠাহীন উৎপল নানা ক্ষেত্র চষে বেড়াল, কোথাও ফসল ফলাতে পারল না। গীতা গতবার বিলেতে গিয়ে শেষপর্যন্ত এক বিজাতীয়কে বিয়ে করেছে। কেউ বলে শাপে বর হয়েছে। কেউ-বা ধিক্কার দিয়েছে প্রেমের এই অমর্যাদায়। কিন্তু ওরা যত গালাগালই দিক, উৎপলকে সম্রাটের আসন দেওয়া কি গীতার পক্ষে সত্যিই সম্ভব ছিল? গোয়ার্তুমি করে বিয়ে যদি সে উৎপলকে করতই, অনুকম্পা আর সহানুভূতি

ছাড়া আর কী-বা সে স্বামীকে দিতে পারত? সেই জোরে বিয়ের বাঁধন কতদিন শক্ত থাকত?

মানসী চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'চিঠিপত্র মাঝে মাঝে লেখে নাকি?'

উৎপল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না, একবার লিখেছিল। আমি জবাব দিইনি।'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে মানসীর মনে হল, উল্টোটাই হয়তো সত্যি। হয়তো গীতাই নিরুত্তরা রয়েছে। এই লাইব্রেরীতে ওদের মাঝে মাঝে আসতে দেখেছে মানসী। এই ক্যান্টিনেই ওদের খেতে খেতে গল্প করতে দেখেছে। সাগর পাড়ি দেবার আগে কি শেষবারের মত সেতু-বন্ধনের দুঃসাধ্য চেষ্টা করে দেখেছিল গীতা? কে জানে! উৎপল কি স্মৃতি-বাসরে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যাওয়ার জন্যেই তেতে-পুড়ে এই মরুদ্যানে এসে মাঝে মাঝে বসে থাকে? নইলে পড়াশুনোয় ওর নতুন কোন আগ্রহ এসেছে বলে তো মনে হয় না। উৎপলের জন্যে সত্যিই দুঃখ হয় মানসীর। হঠাৎ তার মনে হল, এইরকম দুঃখ যদি সে অসীমকেও দিতে পারত! কি এইরকম প্রচণ্ড আঘাত। নিজে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারিণী হয়ে সেই অধিকারের শেলাঘাত যদি হানতে পারত মানসী, চমৎকার হতো। কিন্তু সেই ক্ষমতা তার হল কই! হল না বলেই আর-একজনের দেওয়া আঘাত তাকে বুক পেতে সইতে হল। আঘাত দিতে না জানলে আঘাত পেতে হয়, সইতে হয়। সংসারের নিয়মই এই।

উৎপলকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল মানসী। প্রিয়গোপাল-বাবুর কথা মনে পড়ল। তিনি কি আঘাত দিয়েছেন, না পেয়েছেন? ভাল করে বোঝা যায় না। যে মেয়েকে তিনি ভালবাসতেন, মানসীকে তাঁর নাম বলেননি, চেহারার বর্ণনা দেননি, কিছু যে একটা ঘটেছিল শুধু আভাসে বুঝতে দিয়েছে। তারপর মোটর দুর্ঘটনা, তারপর অঙ্গবৈকল্য। কিন্তু দেহের এই বিকলতাই কি সব? প্রত্যঙ্গের এই খুঁতকে সেই মেয়েটি কি ভালবাসা দিয়ে ভরে তুলতে পারত না? প্রিয়গোপালবাবুর এত জ্ঞান, এত বিদ্যা, এত সহানুভূতি থাকতেও কি সেই সামান্য খুঁত ঢাকা পড়ত না? সে ভরসা কি প্রিয়গোপালবাবু পাননি, না কি পেয়েও বিশ্বাস করতে চাননি? না কি যাকে ভালবাসেন তাকেই বাঁচিয়ে দিতে চেয়েছেন? একই সঙ্গে আঘাত দিয়েছেন আর পেয়েছেন? কিছুই স্পষ্ট করে জানা যায় না। প্রিয়গোপালবাবু বড় চাপা মানুষ। কিন্তু মানসী যদি হতো সেই মেয়ে—নিশ্চয়ই ওঁকে এমন করে ছেড়ে দিত না, এমন করে একা থাকতে দিত না। তাঁর অঙ্গের খুঁতকে বড় করে দেখত না, চিত্তের ঐশ্বর্যকেই বড় বলে মানত, মানাত।

ছি ছি ছি, ওঁর চিঠিটা মানসী ছিঁড়ে ফেলেছে। অমর্যাদা করেছে তাঁর

স্নেহের দানের। ফের দেখা হলে কি বলবে? বলবে, সে চিঠির কোন দরকার হয়নি। কেন দরকার হয়নি সেকথাও কি বলতে পারবে? এক হিসেবে চিঠিটা নষ্ট করে ভালই করেছে মানসী। ও চিঠি তো তিনি আর নিজের ইচ্ছায় লিখতে চাননি! মানসীই তাঁকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নিয়েছিল। সেই অনধিকার চর্চার শাস্তি মিলেছে।

আর একবার মাথা নাড়া দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের তুচ্ছ চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল মানসী। অফিসের কাজ করতে এসে এসব অকাজকে ও কেন প্রশ্রয় দিচ্ছে? ছি ছি ছি। গ্লানি, অবসাদ, পরাজয়--সব কিছুর ওপর একমাত্র কর্মই সত্য। সে কাজ যত তুচ্ছই হোক, মানুষের নিষ্ঠায় তা গৌরব পায়। মানসী সেই গৌরবেই অসামান্যা হবে। তার আর কোন কাম্য নেই।

চারটে নাগাদ ইনচার্জ ডেকে বললেন, 'মিস মুখার্জি, আপনার ফোন এসেছে।'

ফোন ধরতে গিয়ে হাত কাঁপল মানসীর, বুক কাঁপল। কাল নাকি দু-তিনবার ফোন করেছিল, আজ বুঝি এতক্ষণে মনে পড়ল?

না, মনে এখনো পড়েনি। অসীম নয়, মায়া। তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে ফোন করছে। কথাগুলি শুনে নিয়ে মানসী রিসিভারটা রেখে দিল।

ইনচার্জ বললেন, 'কি ব্যাপার! কোন খারাপ খবর নাকি?'

মানসী বলল, 'না, পুরোপুরি খারাপ নয়। ছোট ভাই আর বোন দুজনেই পরীক্ষা দিয়েছিল। বোনটি পাশ করেছে, ভাইটি ফেল।'

ইনচার্জ বললেন, 'যা হোক তবু আপনার বাড়িতে পাশের হার ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট হল—।'

নিজের টেবিলে ফিরে এল মানসী। মায়া বলেছে, বাবাই আগে জানতে পেরেছেন খবরটা। বিজুদার কাছে তিনি নিজেই গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বাড়িতে বিষম কাণ্ড শুরু করে দিয়েছেন। মানসী যেন ছুটির পর আর কোথাও দেরি না করে সোজা বাড়ি চলে যায়।

বেচারা নন্দু। ওর হতাশ-ম্লান মুখখানা মানসীর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

মায়া ফোনে বলেছে, 'এর চেয়ে উল্টোটা হলে ভাল হতো মেজদি। ও যদি পাশ করত, আর আমি ফেল করতাম, খুব ভাল হতো। ওর মুখের দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসো মেজদি।' মানসীর মনে পড়ল, সকালে এই মায়াই শুধুমাত্র নিজের পাশের জন্যে আশীর্বাদ চেয়েছিল।

তাড়াতাড়ি যাবে বইকি মানসী। ছুটি হয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়বে। দেরি আর কোথায় করতে যাবে মানসী? করবার কোন হেতু আর নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে মানসী একবার ডান দিকে তাকাল গাছপালার আড়ালে সূর্যাস্তের রক্তাক্ত আভাস। এই রঙ কি শুধু রক্তের, না বেদনার্ত হৃদয়ের? দিনের এই ক্ষীণ আলো, তার এই অবসানের মুহূর্তগুলি মানসীর মনে এক-একদিন অকারণ বিষণ্ণ ভাব এনে দেয়। সারাদিনের কর্ম-ব্যস্ততা, জীবনচাঞ্চল্য, উৎসাহ-উদ্দীপনার পর হঠাৎ এক-একদিন যখন এই 'দিনাবসানের বেদিতল' চোখে পড়ে যায়, মাথা আপনিই নত হয়ে আসে, ভারাক্রান্ত হৃদয় লুটিয়ে পড়তে চায়। মানসী বাসের জানলার কাছে বসে রোদ-মুছে-যাওয়া ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে দেখতে দেখতে চলল।

আজ অবশ্য এই বিষণ্ণতার কারণ আছে। এর সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। নন্দুটা শেষ পর্যন্ত ফেলই করে বসল। হতভাগা ছেলে সারা বছর পড়াশুনো করেনি। শুধু আড্ডা দিয়ে আর হৈ-হৈ করে বেড়িয়েছে। পড়াশুনো ছাড়া আর সব ব্যাপারেই নন্দুর উৎসাহ। পাড়ার ক্লাব চালানো, পূজাপার্বণে চাঁদা তোলা, যখন কোন হুজুগ থাকে না ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্যারাম খেলে কাটানো —কোন্‌টায় নন্দু নেই? শুধু বই-ই বেশিক্ষণ তার মন আটকে রাখতে পারে না। টেস্টের পর দু'মাস পড়ে কি কেউ পাশ করতে পারে? তাও কি তেমন ভাবে পড়েছে নন্দু? সংসারের কাজকর্ম করেও মায়া যে ভাবে পরীক্ষার জন্য খেটেছে, নন্দু যদি তার অর্ধেক, এমনকি চার আনিও পড়ত, নিশ্চয়ই পাশ করে যেত। কিন্তু কারো কথা কানে তুলবার, কারো শাসন গ্রাহ্য করবার মত ছেলে তো নন্দু নয়। মানসী যদি বলত, 'তুই যে বইয়ের ধারে-কাছেও যাসনে নন্দু। মায়া কি ভাবে পড়ে তাই দেখ,' নন্দু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত, 'মায়াদি পড়বে না তো করবে কি? মেয়েরা পড়বার জন্যেই জন্মেছে।'

মানসী ধমক দিত, 'আর ছেলেরা বুঝি ঘুরে বেড়াবার জন্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে? পাজী কোথাকার।' নন্দু বলত, 'কথাটা কিন্তু ঠিকই বলেছ সেজদি। ছেলেদের দশ জায়গায় না বেরোলে চলে না। তাদের পায়ের তলা সুড়সুড় করে। পাঁচ জায়গায় ঢুঁ মেরে বেড়াতে না পারলে মনে হয় দিনটাই মাটি। মেয়েদের তো তা নয়। কলেজের লেকচার নোট টুকে আর তা দিনরাত মুখস্থ করে তারা দিন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু গণ্ডীর বাইরে যেতে বললেই মেয়েরা ভয়ে আধ-মরা। তোমাকে বাদ দিয়ে বলছি সেজদি মেয়েদের মধ্যে তুমি একসেপসন্।' মাধুরী ছিল সামনে। রঙীন পেন্সিল দিয়ে ছাত্রীদের টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে মুখ তুলে হেসে বলেছিল, 'একসেপসন্ কেন, আসলে তোর সেজদি মেয়েই নয় রে নন্দু। শুনিসনি বাবা মাঝে মাঝে সেকালের সেই শ্যামা-সঙ্গীতটি গুন গুন করে গাইতেন—জানোনা রে মন নীরদবরণ শ্যামা কভু মেয়ে নয়। আমাদের মানসীও তাই। কভু মেয়ে নয়।'

মানসী বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে বলেছে, 'এসব কি হচ্ছে দিদি। নন্দুটা এমনিতেই ইঁচড়ে পাকা। তুমি ওকে আরো আস্কারা দিচ্ছ?' মাধুরী জবাব দিয়েছে, 'আস্কারা যে কে দেয় তা সবাই জানে।' মা মাঝে মাঝে বলেন, মানসী আমার ছেলের মত। ছেলের ওপর যেমন নির্ভর করা যায়, আমি ওর ওপরও তেমনি নির্ভর করি।' মা'র মুখের এসব কথা শুনে মানসীর মন প্রসন্নই হয়। আত্মগৌরব বাড়ে। কিন্তু মাধুরীর মুখে 'মেয়ে নয়,' কি 'পুরুষালি মেয়ে' খোঁটা শুনতে ভিতরে ভিতরে বড় খারাপ লাগে মানসীর। তার স্বভাবের মধ্যে যে দৃঢ়তা আছে মাধুরী কি শুধু সেই কথাই বলতে চায়, না কি ওর দেহের গড়নে যে নারীরূপের ক্ষীণতা, অপূর্ণতা আছে, মাধুরী সেই ইঙ্গিতও করে? মেয়েলী পুরুষ কথাটা শুনতে যেমন অতি মৃদুস্বভাবের পুরুষেরও ভালো লাগে না, পুরুষালি মেয়ে কথাটাও মানসীর কানে তেমনি শ্রুতিকটু লাগে। অথচ মজা এই, পুরুষ মেয়ে ভালোবাসে, মেয়ে পুরুষ ভালবাসে, কিন্তু কোন পুরুষই মেয়ে হতে চায় না, কোন মেয়েই পুরুষ হতে চায় না। চাইলেও মানসী কি একটা বইতে পড়েছিল, প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে খানিকটা করে নারীত্বের মিশেল থাকে, প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে একটি করে পুরুষ বাস করে। প্রত্যেক পুরুষ নিজের বাম অঙ্গে নারী, প্রত্যেক মেয়ে নিজের দক্ষিণ অঙ্গে পুরুষ। একজনের বামের সঙ্গে আর-একজনের দক্ষিণ যখন মিলে যায়, সেই মিলই হয় পুরোপুরি মিল।

এসপ্লানেডে এসে বাস দাঁড়িয়েছে। এবার আর ছায়া-ছায়া নয়, উজ্জ্বল আলো-ঝলমল বৈদ্যুতিক শহর। জীবন্ত প্রাণচঞ্চল। মোটর গাড়িগুলি দুর্বার প্রাণস্রোতের মতই ছুটে চলেছে। মানসী একবার তাকিয়ে দেখল। ডানদিকের ওই রেস্টুরেণ্টটা অসীমের খুব প্রিয় ছিল। এদিকে এলেই একবার এখানে তার চা খাওয়া চাই। মানসীর প্রথম প্রথম ভালো লাগত না। রেস্টুরেণ্টের গন্ধই অসহ্য মনে হতো। চা আর চপ-কাটলেট তো দূরের কথা, বাবার শাসনে থেকে থেকে অনেকদিন পর্যন্ত বাইরের খাবার খায়নি মানসী। বাবা শুধু নীতির নয়, স্বাস্থ্যনীতির দোহাই দিতেন।—'জানিস, যত সব বাজে মাংস, সস্তা মাংস বাজার থেকে ওরা কেনে। তাই দিয়ে তৈরি হয় বাবুদের সাধের চপ-কাটলেট কোর্মা-কারি। খেয়ে একবার পয়সা দাও রেস্টুরেণ্টের মালিককে, আর একবার পয়সা দাও ডাক্তার-কম্পাউণ্ডারকে। ওসব জায়গায় খাওয়া মানেই নিজের স্টমাকটিকে খাওয়া।' মানসীরা বলেছে, 'কিন্তু বাবা, অনেকেই তো খায়।' বাবা বলেছেন, 'খাবে না কেন। মুরগীর ঠ্যাংয়ের সঙ্গে নিজের স্বাস্থ্যটিকেও তারা মনের সুখে চিবোয়। তার পর মজা বোঝে শেষ বয়সে। এই শেষ বয়সের কথা ভেবেই প্রথম বয়স থেকে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে হয়। আচার বিচার নীতি নিয়ম সংযম সব এই জন্যে। পরকাল

মানে মৃত্যুর পরবর্তী কাল নয়, মৃত্যুর ঠিক পূর্ববর্তী কাল। Later life. সেই life-এর কথা ডেলি লাইফে আমাদের মনে থাকে না। মনে থাকে না, যৌবনের অহংকার যখন থাকবে না, ক্ষমতা যাবে, আধিপত্য যাবে, তখন আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু মানুষ সে কথা মনে রাখে না। যাঁরা মনে রাখেন, যাঁরা নিজের জীবনের আদি-অন্ত দেখতে পান, তাঁরাই ত্রিকালদর্শী।

সামান্য রেস্টুরেণ্টে খাওয়ার প্রসঙ্গ থেকে বাবা একেবারে ত্রিকালদর্শীতে চলে যেতেন।

মানসী হাসি চেপে বলত, 'কিন্তু বাবা, যত সাবধানেই মানুষ থাকুক যত হিসেব করে পা টিপে-টিপেই চলুক, বুড়ো তো তাকে হতেই হয়। অকালে মরে না গেলে কেউ কি আর জরার হাত এড়াতে পারে?'

বাবা বলেছিলেন, 'তা পারে না, কিন্তু পারার দুঃখ-দুর্ভোগ অনেক কমানো যায়। ডাক্তাররাও তাই বলেন। যারা প্রথম বয়সে যা ইচ্ছে তাই করে, যা খুশী তাই খায়, অনিয়ম অত্যাচারের সীমা রাখে না, শেষ বয়সে প্রকৃতি তাদের ওপর শোধ নেয়। শোধ মানে কি যে-সে শোধ? যাকে বলে চক্রবৃদ্ধি হার, একেবারে কম্পাউণ্ড ইণ্টারেস্ট সুদ গুণে নেয়। যাদের ঋণ যত কম, তাদের দুঃখ তত কম। যদি দেহের চরম দুঃখ কমাতে চাও, দেহের আপাত সুখ চেয়ো না। সব এই দেহতত্ত্ব। সব এই দেহের জন্যে। গাঁয়ের বৈরাগী-বাউল যখন ভিক্ষে করতে আসত, আমার বিধবা পিসীমা বলতেন—বাবা, একখানা দেহতত্ত্বের গান শোনাও। তখন অবাক হয়ে যেতাম। পিসীমা মনের কথা না শুনে দেহের কথা শুনতে চাইছেন কেন। তখন বুঝতে পারতাম না, এখন পারি। দেহতত্ত্বই বড় তত্ত্ব। এই দেহদুর্গই বড় দুর্গ। কোন্ দ্বারের কোন্ দ্বারী কখন যে শত্রুর কাছে দরজা খুলে দেয় তার ঠিক নেই। যেই খুলে দিলে অমনি পিল-পিল করে শত্রুসেনা ঢুকল। শাস্ত্রকাররা বলেন পাপ, ডাক্তাররা বলেন বীজাণু। কথা একই।'

বাবা নিজের মনে বিড়বিড় করতেন। মানসী এক ফাঁকে উঠে পালিয়ে আসত।

এই দেহতত্ত্বের কথাই আর-এক সুরে আর-এক ঝঙ্কারে আর-একজনের মুখ থেকে শুনেছিল মানসী। সে রেস্টুরেণ্টে এসে মাংসের চপ-কাটলেট খেয়ে আর খাইয়ে স্বাস্থ্যনীতি ভাঙত; শুধু কি স্বাস্থ্যনীতি? কোন্ নীতি আর নিষেধবাক্যের ওপরই-বা তার আস্থা ছিল?

প্রথম প্রথম মানসীর ভালো লাগত না। কেমন যেন এক ধরনের ভয় আর অস্বস্তি মনের মধ্যে লেগে থাকত। পর্দা-ঢাকা ছোট ছোট খুপরি। ঘরের মধ্যে ঘর। এমন একান্তে একজনের মুখোমুখি বসে থাকতে, বসে বসে খেতে লজ্জাও করত।

প্রথম দিন মানসী বলেছিল, 'আমি কিছু খাব না। তুমি খাও।'

অসীম বলেছিল, 'তাই কি হয়? একজন খাবে আর-একজন খাবে না, এখানে সে নিয়ম নেই।'

মানসী বলেছিল, 'তুমি নাকি কোন নিয়মই মানো না, তবে যে নিয়মের কথা বলছ? আমার ওসব খাওয়ার অভ্যাস নেই। খেতে ভালোও লাগে না। বাবা বলেন, ওসব খেলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়।'

অসীম জবাব দিয়েছিল—'বাবাদের বয়স পেলে ওসব কথা আমরাও বলব। অন্য বয়সে কী খেয়েছিলাম না খেয়েছিলাম, কী করেছিলাম না করেছিলাম, খানিকটা ইচ্ছায় ভুলব, খানিকটা অনিচ্ছায় ভুলব। তোমার বাবার যা বয়স তাতে ওইসব কথাই ওঁর মুখে মানায়।'

মানসী বলেছিল, 'কিন্তু এমন অনেক কথা আছে যা সব বয়স, সব সময়ের পক্ষে সত্য।'

অসীম হেসে বলেছিল, 'তুমি তোমাদের কলেজের ডিবেটিং ক্লাবের মেম্বার ছিলে বুঝি? সত্যকে মানুষ বার বার লঙ্ঘন করে একথাটাও অসত্য নয়। কিন্তু আমরা চা খেতে এসে যেসব আলোচনা করছি, একটা কাটলেটের চেয়ে তা অনেক বেশি দুষ্পাচ্য। নাও, খেতে শুরু করো।'

খাবারের প্লেটটা তার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল অসীম।

মানসী তবু আপত্তি করেছিল, 'ধরো, আমার যদি ভালো না লাগে, তবু খেতে হবে?'

অসীম তার জেদ ছাড়েনি, হেসে বলেছিল, 'খেতে হবে বইকি। প্রথমে আমার ভালো লাগার জন্যে খাবে। তারপর তোমার নিজের নতুন ভালো লাগাও আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে। আসলে সবই তো অভ্যাস। আমরা সবাই এক অভ্যাস ছেড়ে আর-এক অভ্যাস ধরি। এই প্রথা বর্জনের কাজ সারাজীবন ধরে চলে। বিশেষ করে তোমাদের মেয়েদের তো কথাই নেই। গোত্রান্তরিত হওয়ার পর তোমাদের কত অভ্যাস যে বদলাতে হয় তার কি কিছু ঠিক আছে।'

মানসী হেসে বলেছিল, 'ওই তো তোমাদের সুবিধে। তোমরা আমাদের বদলাতে বাধ্য কর, তারপর বল, আমরা ইচ্ছে করে বদলেছি, বদলে গিয়ে খুশী হয়েছি।'

কিন্তু যত তর্কই করুক, রেস্টুরেণ্টে খাওয়ার অভ্যাসই আস্তে আস্তে মানসীর আয়ত্তে এল। এখানকার বিশেষ এক ধরনের গন্ধভরা হাওয়া, এখানকার পরিবেশ তার আর অস্বস্তির কারণ হয়ে রইল না। কাঠের পার্টিশন দেওয়া ছোট ছোট খোপের সংকীর্ণতা সহনীয় হয়ে গেল। কী খাচ্ছে, কোথায়

বসে খাচ্ছে তা তুচ্ছ উপলক্ষমাত্র; লক্ষ্য, একান্ত সান্নিধ্য, সাহচর্য। একজনের সামনে বসে থাকতে পারায়, একজনের সঙ্গে বসে থাকতে পারায়, তার সঙ্গে সঙ্গে বিনা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ানোয় যে এত আনন্দ আছে তা কে জানত? এরই নাম কি মত্ততা? ভালোবাসার মধ্যে কি কোন মাদকদ্রব্য আছে, যাতে মানুষকে এমন আবিষ্ট আচ্ছন্ন করে রাখে?

একদিন সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে ঘাসের ওপর বসে অসীমকেই একথা জিজ্ঞাসা করেছিল মানসী, 'আচ্ছা, কেন একজনকে আর-একজনের এমন ভালো লাগে বলতো?'

অসীম বলেছিল, 'কেন ভালো লাগে তার নানা ব্যাখ্যা আছে। কতজনে কত কথা বলেন, কেউ বলেন, প্রকৃতির জীবনসৃষ্টির উদ্দেশ্যই এর মূলে। ভালো লাগাটা তার উপায়।'

মানসী লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'যাও, কী যে বল।'

অসীম বলেছিল, 'আমি তো আমার কথা বলিনি। অন্যের কথা কোট করেছিলাম। তোমাকে ভালোবাসি, আমার কাছে এই সত্যটুকুই যথেষ্ট।'

মানসী বলেছিল, 'কিন্তু কেন বাসো? আমার মধ্যে তুমি কী দেখতে পেয়েছ? আমি তো তোমার মত সুন্দর নই যে, চেয়ে চেয়ে দেখা যায়, চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।'

নিজের হাতের লেখা নিয়ে কোনদিন বিনয় করে না মানসী, নিজের রূপের দৈন্য নিয়েও নয়। সে ক্ষোভ নিজের মনের মধ্যেই সে পুষে রাখে। সেদিন এক অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল। তাতে মানসী লজ্জিত হয়নি।

অসীম একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'তোমার মধ্যে আমি কী দেখেছি এ কথার জবাবে আমি তোমার গুণের এক দীর্ঘ তালিকা দিতে পারি। নিশ্চয়ই তার সবগুলি না হোক, কোন কোন গুণ আমাকে প্রথমে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এখন তার তালিকা দিতেও আমার ইচ্ছা করে না, কোন একটি গুণকে আলাদা করে তুলে ধরতেও আমার দারুণ অনিচ্ছা।'

মানসী নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'গুণের কথা থাক, আমার এমন কোন্ গুণ আছে—।'

অসীম হেসে বলেছিল, 'তাহলে রূপের কথা বলি?'

মানসী বলেছিল, 'তুমি এবার ঠাট্টা শুরু করে দিলে। আমার রূপ তো একেবারেই নেই।'

অসীম জোর দিয়ে বলেছিল, 'ওকথা যে বলে সে মিথ্যে কথা বলে। আমি বলি, আছে আছে আছে। একটু আগে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, আমি তোমার মধ্যে কী দেখেছি। এবার অসংকোচে বলি, আমি তোমার মধ্যে

রূপ দেখেছি। সুরূপ নয়, কুরূপ নয়, শুধু রূপ। এই যে তুমি আমার সংগে এসেছ, আমার পাশে বসেছ, আমাকে একান্তভাবে ভালোবেসেছ, একটি রূপের মধ্যে তা সব ভরে রয়েছে, একটি বিশেষ রূপের সংগে তা জড়িয়ে রয়েছে, সেই রূপ তোমার এই দেহরূপ। তোমার এই বিশেষ আকার ছাড়া ওইসব দুর্লভ গুণের আমি কল্পনা করতে পারিনে, কল্পনা যদি-বা করতে পারি, তাকে ছুঁতে পারিনে। ধরতে পারিনে। কিন্তু তোমার দেহের মাধ্যমে সব পারি। তোমার দেহ আমার কাছে তাই বিশ্বরূপের আধার। একই সংগে আধার আর আধেয়, ফরম আর কনটেন্ট।'

আধা-অন্ধকারে জলের ধারে বসে সেই অবিরাম দেহবন্দনা শুনতে শুনতে সেদিন মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে গিয়েছিল মানসী। জলস্রোত আর বাণীস্রোত একই কল কল ধারায় বয়ে চলেছিল। তখনকার মত মনে হয়েছিল, এই দেহের আস্বাদের মধ্যেই জীবনের সব স্বাদ, সব পরিতৃপ্তি, সব চরিতার্থতা ধরা রয়েছে। শুধু একান্ত সান্নিধ্য-সুখ ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কিছু নেই, আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

আজ নদীর স্রোত সেই ধারায় বয়ে চলেছে, তার কলস্রোত বন্ধ হয়নি, কিন্তু একজনের বাক্যস্রোত হয়তো আর-একজনের দেহদ্বীপের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। মানসীর বুকের ভিতরটা আর একবার মোচড় দিয়ে উঠল। কে জানে, ওরা এখন কোথায়, কোন্ অবস্থায় রয়েছে। অভিমান করে নিজেকে সরিয়ে এনে বিনাযুদ্ধে পরাজয় মেনে মানসী তো ওদের পরম সুযোগ করে দিয়েছে। তার পুরো ব্যবহার না করে কি ওরা ছাড়বে!

শ্যামবাজারে এসে বাস বদল করবার সময় নন্দুর বন্ধু অমলকে দেখে ফের ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ল মানসীর। ওরা বোধ হয় এখনো কিছু জানে না। বেচারা নন্দু, পরীক্ষা দেওয়ার পর আর ভয়ের অন্ত ছিল না। শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই ফলল। বেচারা বড় দুঃখ পাবে। অবশ্য নিজের ভুলের জন্যই কষ্ট। কিন্তু মানুষ তো আর সেকথা মনে রাখে না। নিজের ভুল না পরের ভুল, সে হিসাব দুঃখের বেদনার মধ্যে তলিয়ে যায়। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় কোনদিন ফেল করেনি মানসী; কিন্তু করলেও করতে পারত। পরীক্ষা দেওয়ার পর নন্দুর মত সেও আশঙ্কা আর উদ্বেগ নিয়ে দিন গুণত, দুদিন আগে রেজাল্ট জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। এখনো মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে, হলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে বসেছে, কিন্তু কিছু লিখতে পারছে না, কি অনেক প্রশ্নের জবাব বাকি আছে, কিন্তু সময় আর নেই। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর নন্দুকে শাসন-টাসন করে কিছু লাভ নেই। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে হবে, 'সামনের বছরের জন্যে তুই তৈরি হতে থাক নন্দু। নিশ্চয়ই ভাল রেজাল্ট করে বেরোবি। কী এমন হয়েছে। বয়স

তো আর বেশি হয়ে যায়নি। দেখ গিয়ে তোর মত কত ছেলে এখনো স্কুলের গণ্ডী পার হতে পারেনি। সেই তুলনায় তুই তো—।'

ঘরের সামনে এসে কড়া নাড়তে হল না মানসীর। দোর আধখানা খোলা। তার ফাঁক দিয়ে বাবার চড়া গলা শুনতে পেল মানসী।—'বেরিয়ে গেছে যাক। যেন আর বাড়িতে না ফেরে। আমি অমন কুলাঙ্গার ছেলের মুখদর্শন করতে চাইনে।'

মানসী ঘরে ঢুকে দরজাটা ভাল করে ভেজিয়ে দিল। তারপর বাবার দিকে চেয়ে শান্তভাবে বলল, 'অমন চেঁচামেচি করছ কেন বাবা? হয়েছে কী!'

মনোমোহন দুখানা হাত নাচিয়ে বললেন, 'হবে আবার কী। তোমার গুণধর ভাই ফেল করেছেন।'

মানসী বলল, 'তা তো শুনলাম। কিন্তু এখন এই নিয়ে চেঁচামেচি করে কী আর হবে বল। হতভাগাটা গেল কোথায়?'

সুহাসিনী একটু দূরে বিষণ্ণমুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'কে জানে কোন্ চুলোয় গেছে। সেই দুপুরের পর থেকে ছেলের আর দেখা নেই। নাইল না, খেল না। তারপর উনি আবার মারধোরও করলেন।'

মানসী ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি আবার ওকে মারতে গেলে কেন বাবা? অত বড় ছেলের গায়ে তুমি যখন-তখন হাত তুলবে নাকি?'

মনোমোহন বললেন, 'বেশ মজা পেয়েছিস যা হোক। মেয়ে বড় হয়েছে তার গায়ে হাত তুলতে পারব না, ছেলে বড় হয়েছে তার গায়ে হাত তুলতে পারব না। স্ত্রী চিররোগা অবলা, তার গায়ে হাত তুলতে পারব না। হাতটা তুলব কার গায়ে শুনি?'

মানসী হাসি চেপে বলল, 'কিন্তু ফেল করে ও নিজেই কত দুঃখ পেয়েছে ভেবে দেখ। এর পর তোমরা যদি ওকে মারধোর কর—।'

মনোমোহন বললেন, 'সাধে কি মেরেছি। ফেল করেছিস, কোথায় লজ্জায় মুখ নিচু করে থাকবি, এই মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে আমার কতগুলি অর্থদণ্ড ঘটালি সেকথা ভেবে মরমে মরে থাকবি, তা না তো আমার মুখে মুখে তর্ক?'

মানসী বলল, 'তর্ক আবার কী নিয়ে করল?'

মনোমোহন বললেন, 'বলে কিনা আমি কি আই. এস-সি. পড়তে চেয়েছি? তোমরাই তো জোর করে আমাকে সায়েন্স পড়ালে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, টেস্টের বিরুদ্ধে তোমরা আমাকে ভর্তি করালে। কত বড় মিথ্যেবাদী তাই দেখ। ও কিন্তু বন্ধুদের দেখাদেখি নিজেই গরজ করে সায়েন্স নিলে—'

প্রলোভনটা অবশ্য মানসী-মাধুরীরাই তুলে ধরেছিল। —'মায়া আই. এ.

পড়ে পড়ুক। কিন্তু তুই কী পড়বি ভেবে দেখ। আই. এ., বি. এ. পাশ করে তো কোন প্রসপেক্ট নেই। সেই মাস্টারি না হয় কেরানীগিরি। তাও পাওয়া শক্ত। কিন্তু আই. এস-সি. পাশ করলে অনেক টেকনিক্যাল লাইন খোলা থাকে। অঙ্কটা যদি মেক-আপ করে নিতে পারিস তাহলে ভেবে দেখ।'

ভেবে দেখে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়াই ঠিক করেছিল নন্দু। কিন্তু দু মাস যেতে না যেতেই পড়াশুনোয় ওর মনোযোগের অভাব মানসী লক্ষ্য করেছিল। ফিজিকস্ কেমিস্ট্রির খাতায় ও বসে বসে প্রফেসরদর মুখ আঁকত, সহপাঠীদের মুখ আঁকত, দু'একজন সহপাঠিনীর মুখের রেখাও ধরে ফেলেছিল মানসী। ওকে বোধহয় আর্ট কলেজে ভর্তি করাই ভালো ছিল। কিন্তু তখন আর বদলাবার সময় নেই। তাছাড়া এদেশে আর্টিস্টেরই-বা কী প্রসপেক্ট আছে?

মানসী ঘরে এসে শাড়ি বদলাল। লক্ষ্য করল, মায়া সবাইকে এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওর যেন লজ্জার আর শেষ নেই। মানসী ওকে ডেকে হেসে বলল, 'কি রে দেখলি তো, আমার কথা কিরকম ফলল। তুই তাহলে পাশটা করে ফেললি মায়া?'

লজ্জায় মুখ নামিয়ে মায়া বলল, 'আর বোকো না সেজদি, আমার পাশ করার আর কোন মানে রইল না। যাই, তোমার খাবার নিয়ে আসি।'

মঞ্জু এদিক-ওদিক ঘুর ঘুর করছিল। ফাঁক পেয়ে মানসীর কাছে এসে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল, 'সেজদি, তোমার একটা জিনিস আমার কাছে আছে। পরে দেব। তুমি খেয়েদেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নাও।'

মানসী কোনরকম কৌতূহল বোধ করল না, বলল, 'আচ্ছা দিস।' তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'তোদের অসীমদা কি চলে গেছে নাকি রে?'

মঞ্জু ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'অসীমদা বুঝি শুধু আমাদের?'

মানসী ওকে ধমক দিয়ে বলল, 'বড্ড ফাজিল হয়েছিস। আর ইয়ার্কি করতে হবে না। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দে।'

মঞ্জু মুখ ভার করে বলল, 'তোমাদের কারো সঙ্গে একটা কথা বলবার জো নেই। সবাই একধার থেকে কেবল ধমকাচ্ছ। ছোড়দা ফেল করেছে তো আমরা কি করব:

মানসী একটু হেসে বলল, 'তোকে কিছু করতে হবে না। শুধু আমার কথার জবাবটা জানিস তো দিয়ে যা।'

জানবে না কেন, মঞ্জু সবই জানে। অসীমদা এখনো যাননি। ও-ঘরে বসে বই পড়ছেন। দুপুরের গাড়িতে যাব-যাব করছিলেন। সেই সময়ে বাবা নন্দুর ফেলের খবর নিয়ে এলেন। কথায় কথায় মা'র সঙ্গে তাই নিয়ে হুলস্থুল ঝগড়া। মহা হুলুস্থুল। এর মধ্যে অসীমদা যেতে পারেননি।

বাবাকে বুঝিয়েছেন, মাকে বুঝিয়েছেন।—ছেলেমানুষ, একবার ফেল করেছে তে হয়েছে কী। তা ছাড়া এ তো প্রাইভেট সোর্সে জানা খবর। ভুল খবরও তো হতে পারে। কিন্তু বোঝালে হবে কি, ঝগড়াঝাটি মারধোর কিছুই বাকি থাকেনি। এইসব অশান্তির মধ্যে অসীমদার আর যাওয়া হয়নি।

মানসী সব শুনে বলল, 'হুঁ। দিদি কোথায় রে? ওই ঘরে নাকি?'

বলেই সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হল। ছি ছি ছি, মঞ্জু কী মনে করল! কথার ধরনটা কি আর ও বুঝতে পারেনি, যা পাকা মেয়ে!

মঞ্জু বলল, 'ও ঘরে কেন হবে। মেজদি এখনো ফেরেইনি। স্কুলের পর টিউশনি আছে না তার?'

মাধুরী যে স্কুল কামাই করেনি তা শুনে মানসী খুশী হল। সারাদিন তাহলে বেশিক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পারেনি ওরা। কিন্তু বেশিক্ষণের কি দরকার হয়? সময়টা এসব ব্যাপারে বিবেচনার যোগ্যই নয়। তা যদি হতে, মাত্র দুদিনের মধ্যে মাধুরী কি ওকে অমন করে কেড়ে নিতে পারত? কই, মানসীর সাড়া পেয়েও তো অসীম ঘর থেকে বেরিয়ে এল না। কী এমন মহাগ্রন্থ পড়ছে সে? নন্দুর ফেলের জন্যে সে যাওয়া বন্ধ করেছে এটা বাজে কথা। লোক-দেখানো ভদ্রতা। আসলে সে প্রতীক্ষা করে আছে মাধুরীর জন্যে। মাধুরী এসে পেঁছয়নি বলেই তার যাওয়া হয়নি।

মঞ্জু বলল, 'সেজদি, তোমার জিনিসটা তাহলে এবার নাও।'

মানসী বিরক্ত হয়ে বলল, 'জিনিস জিনিস করে মাথা ধরিয়ে দিলি। কী জিনিস দেখি।'

মঞ্জু হেসে জামার ভিতর থেকে পুরু একখানা খাম বের করে বলল, 'এই নাও। অসীমদা চলে যাবেন ভেবে সারা দুপুর বসে চিঠিটা তোমার জন্যে লিখেছিলেন। যাওয়া হল না দেখে বার বার আমার কাছে ফেরত চেয়েছেন কিন্তু আমি আর দিইনি। কী মজা। সেজদি, এবার আমার প্রাপ্যটা আমাকে দিয়ে দাও। বেশি নয়, একখানা সিকি দিলেই হবে। এত মোটা চিঠি ডাকে এলে নিশ্চয়ই বেয়ারিং হয়ে আসত।'

মানসী ছোট বোনকে ধমক দিয়ে বলল, 'ফের বাঁদরামি হচ্ছে? যা এখান থেকে।'

চিঠিটা খুলে পড়ল না মানসী। স্যুটকেসের পকেটে রেখে দিল। চিঠি সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহল নেই। চিঠি সে এতকাল ধরে অনেক পেয়েছে।

সুহাসিনী এসে দাঁড়ালেন, 'কাণ্ডটা কী হল বল তো মানসী। ছেলেটা সেই যে গেছে তার আর দেখা নেই। নাওয়া হল না, খাওয়া হল না, কোথায় আছে একটা খোঁজ পর্যন্ত তোরা করবিনে?'

মানসী বলল, 'অত ভাববার কী আছে মা। নিশ্চয়ই বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে গিয়ে রয়েছে। যাবে কোথায়!'

সুহাসিনী রাগ করে বললেন, 'তোরা নিজেদের সুখ-দুঃখ মান-অভিমান নিয়েই মেতে আছিস বাপু। আর মানুষের দিকে তাকাবার তোদের ফুরসত কই। মনের ওই অবস্থা নিয়ে নন্দু পাড়ায় আড্ডা দিতে বেরিয়েছে একথা আমি মরলেও বিশ্বাস করব না। এইসব দুঃখে কাঁচ কাঁচ ছেলে দেশান্তরী হয়, আত্মঘাতী হয় তা জানিস?'

মানসী বলল, 'অত ভেব না মা। নন্দু তেমন ছেলেই নয়। আমি এক্ষুণি বেরোচ্ছি। নিশ্চয়ই পাড়ায় কারো বাড়িতে আছে।'

কথাটা মনোমোহনেরও কানে গেছে। তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'আত্মঘাতী হয় হবে। অমন ছেলের তাই হওয়াই ভালো। কুলাঙ্গার, বংশের কুলাঙ্গার। দিনরাত কেবল আড্ডা আর আড্ডা। ঘরে আড্ডা, বাইরে আড্ডা। যে বাড়িতে ছোট-বড় জ্ঞান নেই, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের খুনসুটি আর ফষ্টিনষ্টির সম্বন্ধ, সেখানে পড়াশুনোর মত পবিত্র কাজ কি হবার জো আছে? পড়াশুনো হল তপস্যা। তার জন্যে আলাদা অ্যাটমসফিয়ার চাই। এ বাড়ির মত এই উপবনে বসে কি আর পড়াশুনো করতে পারে?

তারপর অসীমের ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'অসীম, এসো তো বাবা, এসো একটু এগিয়ে দেখি।'

'কোথায় যাবেন মেসোমশাই?'

'এই হতভাগা ছেলের জন্যে কোথায় যে যাব আর যাব না, তা কি কিছু বলবার জো আছে? আমার জন্যে নয়। অমন ছেলের জন্যে আমার কোন মায়া-মমতা কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তোমার মাসীমা কেঁদে-কেটে কেমন অস্থির করে তুলেছেন তাই দেখ। চল, তুমি পুলিস অফিসার মানুষ, এসব ব্যাপারের অনেক আঁটঘাট তোমার জানা আছে। শেষপর্যন্ত যদি থানা হাসপাতালেই যেতে হয় তুমি সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে হবে।'

অসীম বলল, 'অত ভাববার কিছু নেই মেসোমশাই। একটু এগিয়ে দেখতে চান চলুন।'

জামাটা গায়ে দিয়ে অসীম মনোমোহনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

মানসীর দিকে একবার তাকাল না, তাকে ডেকে কোন কথা বলল না। তবু মানসীর ভালো লাগল। অসীম তার বাবার সঙ্গে তারই ভাইয়ের খোঁজে বেরিয়েছে। ওর এই সামান্য সৌজন্যে মানসীর মন এক অপূর্ব প্রসন্নতায় ভরে উঠল।

আটপৌরে শাড়িটা পালটে নন্দুর পাড়ার বন্ধুমহলে খোঁজ নেওয়ার জন্যে

মানসীও বেরোতে যাচ্ছিল, মাধুরী এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে একটা যে: খোঁচা খেল মানসী। অসীম যাঁর সঙ্গে গেছে সে তো মাধুরীরও বাবা, যার খোঁজে গেছে সে তো মাধুরীরও ভাই। অসীমের এই দাক্ষিণ্য আর সহৃদয়তার মূলে কে, তা কে বলবে?

মাধুরী মানসীর দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'কোথায় বেরোচ্ছিস?'

মানসী বলল, 'নন্দুর খোঁজে। ও ফেল করেছে। দুপুর বেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি।'

মাধুরী বলল, 'সব আসতে আসতে শুনলাম। মা মঞ্জু মায়া, বাড়ির সবাই গিয়ে বাস-স্টপে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা অশান্তি বাঁধাল ছেলেটা। চল, ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমরা দুজনেই একসঙ্গে বেরোই।'

মানসী চুপ করে রইল। না-ও করল না, হাঁ-ও করল না।

মাধুরী একটু হেসে বলল. 'বুঝতে পারছি আমার সঙ্গে বেরোতে তোর আর ইচ্ছে করছে না। কিন্তু তোর সঙ্গে আমার কতগুলি দরকারি কথা আছে: চল, যেতে যেতে সব বলে নেব।'

হঠাৎ মানসী দোরে খিল দিয়ে এসে বলল, 'দিদি, সেসব কথা তো পথে পথে হবে না। তোর যা বলবার আছে সংক্ষেপে এখানে এখনি বলে ফেল। শুনে তারপর বেরোই।'

দরজায় পিঠ লাগিয়ে মানসী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মাধুরীর দিকে চেয়ে অধীরভাবে বলল. 'কই, কী বলবি বল।'

মাধুরী একটু চুপ করে থেকে হেসে বলল, 'বলছি। দোরে যখন একবার খিল পড়েছে সহজে কেউ খিল ভেঙে ঘরে ঢুকতে পারবে না। দোর তোর পিঠ দিয়ে না আগলালেও চলবে। এদিকে এগিয়ে এসে শোন।'

মানসী দু'পা এগিয়ে এসে বিরক্তভাবে বলল, 'গৌরচন্দ্রিকা শোনার কিন্তু আমার সময় নেই। আমাকে এক্ষুণি বেরোতে হবে।'

মাধুরী বলল. 'বেরোতে আমাকেও হবে। তবু একেবারে চট করে বলে ফেলবার কথাও তো নয়। তুই তাহলে ভুল বুঝবি।'

মানসী বলল, 'আমি ভুল বুঝি বা ঠিক বুঝি তা নিয়ে তোর দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।'

মাধুরী বলল 'দুশ্চিন্তা কিছু করতে হয় বইকি। না হলে এসব কথা বলবার কোন দরকারই ছিল না। অসীমদাকেও আমি তাই বলেছিলাম। বলেছিলাম. এখন কিছু বলে কাজ নেই। পরে ধীরে সুস্থে ওকে বুঝিয়ে বললেই হবে। কিন্তু অসীমদা তোকে সব কথা জানাবার জন্যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। সামনাসামনি তোকে বলবার সুযোগ না পেয়ে—।'

মানসী বাধা দিয়ে বলল. 'সুযোগ পায়নি. না সাহস পায়নি?'

মাধুরী মানসীর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুই যেটা ভেবে খুশী হোস। সামনাসামনি তোকে বলতে না পেরে আজই চিঠিতে লিখে রেখে যাবে ঠিক করল। সে চিঠি বোধহয় তুই পেয়েওছিস।'

মানসী অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'পেয়েছি বইকি। কিন্তু তুই যখন এতই জানিস, সে চিঠিতে কী লেখা আছে তাও নিশ্চয়ই তোর অজানা নেই। তোকেই বোধ হয় সে চিঠি আগে শোনানো হয়েছে।'

মাধুরী বলল, 'না। সে চিঠিতে কী আছে না আছে আমি কিছু জানি নে। অসীমদা হয়তো সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নেবে। কী লিখতে কী লিখবে তাতে ব্যাপারটা আরো ঘুলিয়ে উঠবে। তাই—'

মানসী মনে মনে ভাবল, 'আহা কী দরদ! অসীমদাকে বাঁচাবার জন্যে এত মমতা তোমার কিসের শুনি? অসীমদা তোমার কে? ক' দিনের?'

মাধুরী মুখ নিচু করে যেন নিজের মনেই বলতে লাগল, 'তাই ভাবলাম আমারই বলা উচিত। যত লজ্জার কথাই হোক, শোনবার পর যত ঘৃণাই তুই আমাকে করিস, এ যে মুহূর্তের ভুল ছাড়া কিছু নয় সে কথা তোকে আমার জানিয়ে দিতে হবে।'

মানসী অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'দিদি, তোকে তো আমি গোড়াতেই বলেছি ইনিয়ে-বিনিয়ে ভূমিকা ফাঁদিসনে। তার সময় এখন নয়। সোজা কথায় যদি বলতে পারিস বল, না হলে কিছুই তোর আর বলে কাজ নেই। আমি বেরিয়ে পড়ি।'

মানসী দোরের দিকে পা বাড়াতেই মাধুরী ওকে বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়া। আর এক মিনিট। আমি সোজা কথায় বলছি। আমরা ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ এমন এক-একটা কাণ্ড করে ফেলি—। সেই কাজটা বরং সোজা কিন্তু তাকে প্রকাশ করে বলা সহজ নয়। কাল সারা দুপুর, বিকেল অসীমদা তোকে খুঁজেছে। খুঁজে পায়নি। যে কারণেই হোক তোর সঙ্গে দেখা হয়নি। তার কী করে যেন ধারণা হয়েছে, তুই ইচ্ছে করে তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছিস। সেই ভুল সন্দেহে তার মন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এই নিয়ে জেদ অভিমান—।'

মানসী বাধা দিয়ে একটু হেসে বলল, 'দিদি, ওকালতিটা বরং পরে করিস। দোষ কবুল করবার যদি সাহস না থাকে আমি তো বলেছি তোকে কিছুই করতে হবে না, তোর কিছুই বলে কাজ নেই।'

মাধুরী হঠাৎ বেশ একটু জোর দিয়ে বলল, 'না, আমাকে বলতেই হবে। কারণ দোষ আমারই। তার মনের ওই অবস্থায় তার সঙ্গে অমন ঠাট্টা-তামাশা করা আমার উচিত হয়নি।'

মানসী একটু হাসল, 'ঠাট্টা-তামাশাই যদি করে থাকিস তাহলে আর অত ভয় কিসের?'

মাধুরী তার নিজের কথার জের টেনে বলে যেতে লাগল, 'আমার উচিত হয়নি ট্যাক্সিতে—।'

মানসী অদ্ভুত একটু হাসল, 'ট্যাক্সিতে? আমি তাহলে ঠিকই অনুমান করেছিলাম, ট্যাক্সিতেই কিছু একটা কাণ্ড ঘটেছে। কী হয়েছিল বলবি দিদি? ঠাট্টার মাত্রাটা সেখানে তোরা কতখানি চড়িয়ে দিয়েছিলি সত্যি করে বলবি?'

মানসী আরো এগিয়ে এসে মাধুরীর কাঁধে হাত এবং চোখে চোখ রেখে বলল, 'সত্যি করে বলবি?'

মাধুরী নড়ল না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'সত্যি করেই বলব। সেই জল-বৃষ্টির মধ্যে তার মাথার ঠিক ছিল না। আমারও বাধা দেওয়ার শক্তি ছিল না। সেখানে সে আমাকে চুমু খেয়েছে।'

কথাটা অনেক আগেই মানসী মনে মনে জানে। কিন্তু মাধুরীর এই নগ্ন স্বীকৃতির মধ্যে যেন নতুন করে জানল, নতুন এক বিষাক্ত শেল বুক পেতে গ্রহণ করল।

মানসী বলতে যাচ্ছিল, 'তারপর?'

কিন্তু মাধুরীর গভীর আবেগের মধ্যে তার সেই ব্যঙ্গ আর বক্রোক্তি তলিয়ে গেল।

মাধুরী বলতে লাগল, 'কিন্তু আমাকে নয় মানসী, সত্যি বলছি আমাকে নয়। তার জেদ, প্রতিশোধ, নিরাশা, ব্যর্থতা সব কিছুকে মিলিয়ে সে যে তখনকার মত এক মূর্তি তৈরি করেছিল, ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে আমি মিলে গেছি। কিন্তু ভেবে দেখ—।'

মানসী নির্মম কণ্ঠে বলল, 'আর ভেবে দেখবার কিছু নেই দিদি। যা হয়েছে বেশ হয়েছে।'

মাধুরী হেসে হাতখানা ধরে বলল, 'না মানসী, সে যে ভুল করতে যাচ্ছে তুই সেই ভুল করিসনে। সে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে একটা ভুলকে যদি স্থায়ী করতে চায় তাই কি আমরা হতে দিতে পারি? মুহূর্তের ভুলের জন্যে সারাজীবনের প্রায়শ্চিত্ত আমি করতে যাব কেন? সে বলে, আমাকে সে অপমানিত হতে দেবে না, আমাকে সে অসম্মান করতে পারে না। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, তার এই ভুল আমার পক্ষে কত বড় অসম্মানের। তুই তাকে বুঝিয়ে বল তুই তার ভুল ভেঙে দে। একমাত্র তুই-ই তা পারিস। তুই যে তাকে ভালোবেসেছিস।'

মানসী বলল, 'দিদি, ও শব্দ তুই আর মুখে আনিসনে। ও কথার আর কোন মানে নেই। ভুল হোক, ঠিক হোক, ব্যাপারটা তোদের দুজনের। নিজেদের সমস্যা তোরা নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারবি। তার ওপর আমার আর কোন

দাবি নেই, মমতা নেই, কোনরকম কোন সহানুভূতি নেই। তাকে নিয়ে তুই এখন যা খুশী তাই করতে পারিস। কিন্তু খুব বেশি বিশ্বাস করলে ঠকবি। আজ তোকে দেখে ভুলেছে, কাল আর-একজনকে দেখে ভুলবে।'

মাধুরী বলল, 'ছিঃ, এসব তুই কী বলছিস।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজ আমার মনে হচ্ছে কি জানিস। শুধু নন্দুই নয়, যে-যার পরীক্ষায় আমরা প্রত্যেকেই ফেল করেছি। আমরা—।'

তার কথা শেষ হবার আগেই দরজায় ঘা পড়ল। 'মানসী, মাধুরী! দোর খোল, শিগ্‌গির দোর খুলে দে।'

সুহাসিনীর গলা।

মানসী এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

সুহাসিনী ভিতরে ঢুকে দোর ভেজিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দুই মেয়ের দিকে তাকালেন।

মানসী একটু ভয় পেয়ে বলল, 'কী হয়েছে মা?'

সুহাসিনী বললেন, 'কী না হয়েছে শুনি? তোমরা কী ভেবেছ বলতো? আমি কিছু বুঝি না? আমি পাশ পরীক্ষা না দিতে পারি, তোমাদের মত চাকরি-বাকরি না করতে পারি, কিন্তু সব বুঝি, টের পাই। দু'দিন ধরে তোমরা কী করছ না করছ, কী নিয়ে তোমাদের এই খুনোখুনি, আমি সব জানি। আমার কিছু টের পেতে বাকি নেই।'

মাধুরী অস্ফুট স্বরে বলল, 'মা, কী বলছ তুমি। চুপ করো, চুপ করো।'

সুহাসিনী বললেন, 'এতদিন ধরে তো চুপ করেই ছিলাম। ভেবেছিলাম, তোরা বড় হয়েছিস, লেখাপড়া শিখেছিস, তোদের চালচলন আচার-ব্যবহার নিয়ে আমি কেন কথা বলতে যাব। যতদিন ছোট ছিলি শিখিয়েছি, এখন শেখাতে হবে কেন? কিন্তু তোদের কান্ড দেখে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আমার দুঃখ রাখবার আর জায়গা নেই। ছি ছি ছি। ছোট ভাইটা সারাদিন না খেয়ে না দেয়ে কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আছে কি নেই, তা কে বলবে। তা নিয়ে তোদের কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, তোরা—তোদের কাছে এখন কাড়াকাড়ি মারামারিটাই বড় হল। ছিঃ। আমি আর অসীমকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দেব না।'

মাধুরী বলল, 'এসব কী বলছ তুমি!'

সুহাসিনী বললেন, 'ঠিকই বলছি। কোথায় তোরা নন্দুর খোঁজ করবি তা নয়, নিজেরা ঝগড়া করে কূল পাচ্ছিসনে। যাক, তোদের কাউকে আর খোঁজ নিতে হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব।'

দোর খুলে সুহাসিনী রাস্তার দিকে চললেন। মানসী তার পিছনে পিছনে এসে ধমকের সুরে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল মা?

এই রাত্রে একা একা তুমি কোথায় যাবে শুনি? তুমি কি একা একা বাস-ট্রামে চলতে পার? না কলকাতা শহরের জায়গা চেন? তুমি তাকে কোথায় খুঁজবে?'

সুহাসিনী বললেন, 'যাক বাপু, তোমাদের আর দরদ দেখিয়ে দরকার নেই।'

মানসী বলল, 'তুমি কেন অত উতলা হচ্ছ বল তো। নন্দু কি এর আগে কোনদিন রাগ করে বাড়ির বাইরে গিয়ে থাকেনি? তাছাড়া তাকে খোঁজবার জন্যে বাবা তো বেরিয়েছেন। ওঁরা কোন জায়গা খুঁজতে বাকি রাখবেন না। দরকার বোধ করলে থানা হাসপাতালেও খবর নেবেন।'

সুহাসিনী পথের মধ্যে থেমে দাঁড়ালেন, 'থাম তুই থাম। ও সব অলক্ষুণে নাম আর মুখে আনিসনে। হাসপাতালের কথা শুনলেই আমার বুক কাঁপে।'

মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে পাঠিয়ে মানসী বাস-স্টপের দিকে এগোতে লাগল।

রাস্তায় বাস আর লরী চলাচলের বিরাম নেই। এককেটা লরীর চেহারা অতিকায় জন্তুর মত। রাস্তার আলোয় সবখানি অন্ধকার যেন কাটেনি। রাত্রির ছোঁয়ায় জায়গাটার চেহারাটাই যেন পালটে গেছে। না কি আতঙ্কের ছোঁয়ায় এমন হয়েছে? একটিও চেনা লোক চোখে পড়ছে না। রাস্তার ওপারে পানবিড়ির দোকানের সামনে যে ক'টি লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে তাদের দেখাচ্ছে অনেকটা ভূতের মত। রাস্তার এপারে দাঁড়িয়ে মানসী ভাবতে লাগল, বাসে করে শ্যামবাজারের দিকেই যাবে, না কি এ পাড়ায় নন্দুর যে সব বন্ধু আছে তাদের বাড়িতে গিয়ে আগে খোঁজ নিয়ে দেখবে। অবশ্য কাছাকাছি জায়গায় খোঁজ-খবর নিতে বাবা নিশ্চয়ই আর বাকি রাখেননি। নন্দু হতভাগাটা সবাইকে আচ্ছা ঝঞ্ঝাটেই ফেলেছে যা হোক। ফেল করেছিস বলে তোর একেবারে বাড়ি-ছাড়া হয়ে থাকতে হবে, এমন কি কথা আছে? কিছু বললে কী হবে, তাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারে ছেলের পরীক্ষায় ফেল করা এক গুরুতর দুর্বিপাকের ব্যাপার। এমন অঘটন ঘটলে যেন কাউকে মুখ দেখানো যায় না, মেয়ের কুলত্যাগের চেয়েও যেন এতে সাংঘাতিক লজ্জা আর কলঙ্ক। মানসী ভাবল, বাবাই এর জন্যে দায়ী। তিনিই নন্দুর মনে এধরনের আত্ম-ধিক্কার আর হীনতাবোধ এনে দিয়েছেন। কিন্তু বাবাই-বা এসব পেলেন কোথায়? তিনিও তো আর পাঁচজনকে দেখে শিখেছেন। চালচলনে ধারণায় ভাবনায় তাদের অনুকরণ করেছেন? তবে কি আমরা আলাদা কেউ নই? শুধু পাঁচজনের ছাঁচে গড়া!

মানসী রাস্তা পার হতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে মাধুরীর গলা শুনল, 'মানু, দাঁড়া আমিও আসছি।' মানসী ফিরে তাকিয়ে দেখল, মাধুরী একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাধুরী বলল, 'এই রাত্রে একা একা কোথায় যাবি? চল, আমিও আসছি সঙ্গে।'

আশ্চর্য, দিদির গলায় সেই আগেকার স্নেহ আর বন্ধুত্বের সুর ফিরে এসেছে। একটু আগে ও যখন অসীমের ভুলের কথা বলছিল, নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করছিল, তখনো তো এত অন্তরঙ্গ সুর বাজেনি। মা'র কাছে দুজনে মিলে একসঙ্গে গাল খেয়েছে বলেই কি এই সমব্যথা, এই সহানুভূতি?

মানসী বলল, 'দিদি, তুই বরং বাড়িতেই থাক, এ সময় সবাই মিলে বাড়ির বাইরে যাওয়া কি ঠিক হবে? তুই বরং বাড়িতে থেকে মাকে আগলে রাখ। ওঁদের সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি। অত অস্থির হবার কী হয়েছে বলতো?'

মাধুরী একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা তুই তাহলে ঘুরে দেখ। আমি বরং পাড়ায়—কিন্তু পাড়ায় নাকি সব জায়গায় মা খোঁজ-খবর করিয়েছেন। কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি।' ওর গলাও যেন কেমন-কেমন। মাধুরীও কি ভয় পেয়েছে?

মানসীর নিজের মনেও এবার একটু উদ্বেগের ছায়া পড়ল। গেল কোথায় ছেলেটা? মনে যত সৃষ্টিছাড়া আশঙ্কা ভিড় করে আসে। তার সঙ্গে যুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেইসব অযৌক্তিক আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে মানসী জোর করে হেসে বলল, 'যাই বলিস, ওঁরা সবাই বড় বেশি অস্থির হয়ে উঠেছেন। অত ভাববার কী আছে। নন্দু বাড়ি ছেড়ে কতক্ষণ আর লুকিয়ে থাকবে।'

মাধুরী হাসল না, বরং একটু গম্ভীরভাবেই বলল, 'কিন্তু গেছেও তো অনেকক্ষণ। ফিরে না আসা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হবার আর জো নেই।'

মানসী বলল, 'তুই বরং হাতমুখটুক ধুয়ে চা-টা কিছু খেয়েনে। স্কুল থেকে ফিরে এসে কিছু তো আর মুখে দিসনি।'

নিজের কানেই কথাটা যেন কেমন শোনাল মানসীর। মাধুরী কি মনে মনে হাসছে? নিজের দিদির সঙ্গে সে মৌখিক ভদ্রতা করতে শুরু করে দিয়েছে বলেই কি ভাবছে মাধুরী? কেন, ওইসব ঘটেছে বলে সে কি তাকে খেতে বলতে পারে না? সত্যি সত্যি অসীমের সঙ্গে যদি ওর বিয়েই হয়—। মানসীর মনের ঈর্ষার সিন্ধু আবার উত্তাল হয়ে উঠল। যদি বিয়ে হয় কেন, বিয়ে হবেই। হবে বলেই মাধুরী নির্লজ্জভাবে ওকথা স্বীকার করতে পেরেছে। নইলে ওকথা কি কেউ মুখ ফুটে বলতে পারে? সহজভাবে বলা যায় না বলেই মাধুরী অমন একটা ভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছে। —'জল-বৃষ্টিতে তার মাথার ঠিক ছিল না, আমিও বাধা দেওয়ার শক্তি হারিয়েছিলাম।'

এসব কথার মানে কি? একজনের মাথা খারাপ করা এবং আর-একজনের হৃদয়কে দুর্বল করা ছাড়া বৃষ্টির আর যেন কোন কাজ ছিল না। অসীম নাকি বলেছে, মাধুরীকে অসম্মানিত হতে দেবে না। তার মানে কি? চুমু খেয়ে যে মান হরণ করেছে, বিয়ে করে সুদে আসলে সেই মান ফেরৎ দেবে? কিন্তু এ ধরনের অভিজ্ঞতা কি অসীমের এই প্রথম? আর-একজনকে তাহলে কত হাজার বার বিয়ে করতে হয় সে কি তা হিসাব করে দেখেছে?

মাধুরী বলল, 'আমি তাহলে যাই। পাড়ার ছেলেদের কাছেই আর একবার খোঁজ-খবর করে দেখি। তুই যদি ঘুরে আসতে হয় ঘুরে আয়। বেশি দেরি করিসনে যেন।'

মানসী শুনতে পেল কি পেল না, ঘাড় কাত করে সায় দিল।

নিশ্চয়ই তাই। নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে মানসী যতক্ষণ অফিসে ছিল সেই সময়ের মধ্যে ওরা ফন্দিটা ঠিক করে ফেলেছে —কে কোন্ ভাষায় কোন্ ভঙ্গিতে বলবে। আসল কথাটাকে কত ঘুরিয়ে জড়িয়ে, কত নিপুণ কুশলতায় এক স্বেচ্ছাকৃত লোভ আর লালসা অনিবার্যতার মহিমা পাবে, তা ওরা নিশ্চয়ই ভেবে ভেবে ঠিক করেছে; ওরা জানে, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মানসী পরম ঘৃণায় দূরে সরে আসবে। কোনরকম দুঃখ করবে না, ক্ষোভ করবে না, দাবি করবে না, অভিযোগ করবে না। ভালোই হল। এই বন্ধন-মুক্তির চেয়ে বড় কাম্য আর তার এখন নেই।

মানসী আর একবার রাস্তাটা পার হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা বাস এসে স্টপ ছাড়িয়ে প্রায় তার সামনে দাঁড়াল। একেবারে সব বন্ধন-মুক্তির ব্যবস্থা হচ্ছিল। সরে যেতে যেতে নিজের মনেই হাসল মানসী।

বাস থেকে কয়েকজন যাত্রী নামলেন। তাঁদের মধ্যে মনোমোহনও আছেন। তিনি মানসীকে দেখে বললেন, 'কি রে, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে? সে ফিরেছে?'

মানসী বলল, 'না।'

মনোমোহন বললেন, 'আমি জানতাম। আমার মনই বলছিল সে ফেরেনি। দেখ, কোনদিন ফেরে কিনা।'

মানসী ধমক দিয়ে বলল, 'ছিঃ বাবা। ওসব তুমি কী বলছ। তুমি দেখি মা'র চেয়েও বাড়া হয়ে গেলে। চল ভিতরে চল।'

প্রায় জোর করেই মানসী তাঁকে ঘরে নিয়ে চলল।

সাড়া পেয়ে সুহাসিনীও সামনে এসে দাঁড়ালেন। মায়া-মঞ্জুরা রইল দূরে দূরে। প্রত্যেকের মুখে ভয় আর দুর্ভাবনার ছাপ। সারা বাড়ির আবহাওয়া থমথমে। যেন সত্যিই একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং আর একটা বৃহত্তর

দুর্ঘটনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সুহাসিনী বললেন, 'একা এলে যে?'

মনোমোহন বললেন, 'খুঁজে না পেলে একা আসব না কী করব?'

সুহাসিনী বললেন, 'পেলে না?'

মনোমোহন বললেন, 'কোথাও না।'

সুহাসিনী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ও আবার কি কথার ছিরি। ভঙ্গি দেখলে গা জ্বলে। খুঁজতে কোথায় কোথায় গিয়েছিলে শুনি?'

মনোমোহন বললেন, 'জানাশোনা সব জায়গায় গিয়েছি। ন্যায়রত্ন লেনে তোমার ছোটকাকার বাড়ি—।'

সুহাসিনী বললেন, 'সেখানে সে কোনদিন যায় না।'

মনোমোহন বললেন, 'আহা লোকে তো আত্মীয়-স্বজনের বাড়িই আগে খোঁজ করে। নাকি রাস্তায় রাস্তায় প্রত্যেক বাড়ির কড়া নেড়ে জিজ্ঞেস করতে করতে যাব 'আমার ছেলে এসেছে? আমার ছেলে এসেছে?' তাই করতে বলছ তুমি?'

সুহাসিনী বললেন, 'আমি তোমাকে আর কিছুই করতে বলছিনে। যতখানি করে তুলেছ তার ধাক্কাই আগে সামলাই।'

মনোমোহন এবার মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বউবাজারে গেলাম শীতাংশু চক্রবর্তী—আরে আমার পিসতুতো ভাই শীতাংশু—তার ওখানে। নন্দুর সঙ্গে তার বেশ খাতির। একসঙ্গে ফুটবল খেলাটেলা দেখেছে। সেখানেও নেই।'

সুহাসিনী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি আর জ্বালিও না। ছেলে ফেল করে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে কুটুম্বিতা করতে গেছে! কত সুখ তার মনে? অমন বুদ্ধি না হলে কি আর এমনসব গুণধর ছেলেমেয়ে জন্মায়?'

মনোমোহন একথার কোন জবাব না দিয়ে মানসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তারপর অসীম বলল শঙ্করের কথা। নন্দু তার দাদার ওখানে যদি গিয়ে থাকে, একবার খোঁজ নিয়ে দেখলে হয়।'

মাধুরী বলল, 'গিয়েছিলে?'

মনোমোহন বললেন, 'গিয়েছিলাম বইকি। তোমাদের জন্যে আমার কোন্ অপকর্মটাই-বা না করতে হল? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ও কুলাঙ্গারের বাড়িতে আমি জলগ্রহণ তো ভালো, প্রস্রাব করতেও যাব না। কিন্তু আর-এক হারামজাদা কুলাঙ্গারের জন্যে যেতে বাধ্য হলাম।'

মাধুরী বলল, 'দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে বাবা?'

মনোমোহন বললেন, 'না, কোত্থেকে দেখা হবে! বাবু টিউশনিতে বেরিয়েছেন। দু-হাতে পয়সা কামাচ্ছেন আর ফুর্তি করছেন।'

সুহাসিনী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যাক, ওসব বাজে কথা রাখো। সেখানে কি নন্দু গিয়েছিল?'

মনোমোহন মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'গেলে কি আর তাকে আমি সেখানে ফেলে আসতাম? যায়নি সেখানে।'

মাধুরী বলল 'বউদি কি কিছু বলল?'

মনোমোহন বললেন, 'তোমরা একালের মেয়ে। মনের মধ্যে যাই থাকুক মুখের ভদ্রতা তো খুব শিখেছ। খুব আদরযত্ন—'বাবা, আপনি সুস্থ হয়ে বসুন, অত ভাবছেন কেন? চা করে দিই, খাবার করে দিই।' শ্রদ্ধা আর ভক্তির শেষ নেই। বললাম, 'মা, তোমার এখানে আমি খেতে আসিনি। সে মনের অবস্থা আমার নয়। হতচ্ছাড়া হারামজাদাটা যদি আসে, কি কোন খোঁজ-টোজ পাও দয়া করে একবার খবর দিয়ো। তাহলেই আমার মহা উপকার করা হবে। আর কোন উপকার তোমাদের কাছে আমি প্রত্যাশা করি না।'

সুহাসিনী বললেন, 'অসীম? সে কোথায়? সে কি সেখানেই রয়ে গেল নাকি?'

প্রশ্নটা মানসীর নিজের মনেই উঠেছিল। মা'র মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে আসায় সে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হল।

মনোমোহন বললেন, 'সেখানে রয়ে যাবে কেন। সে এল আমার সঙ্গে সঙ্গে। ছেলে বটে একটি। নিজের ছেলেও এতখানি করে না। সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। যেখানে যেতে বলেছি সেখানে গিয়েছে। বাসে-ট্রামে একবারও আমাকে টিকিট কাটতে দেয়নি। সব নিজে করেছে।'

বাবার সারল্য দেখে মানসীর চোখে জল এল। মনে মনে বলল, 'ওর এই অসামান্য ভদ্রতায় তুমি মুগ্ধ হয়ে গেলে বাবা! তুমি তো জানো না লোকটি কত ছোট, কত হীন, আর কী প্রতারক।'

সুহাসিনী বললেন, 'সে তাহলে গেল কোথায়?'

মনোমোহন বললেন, 'অসীমের কথা বলছ? শ্যামবাজারে নেমে গেল। আমিই বললাম থানায় একটা খবর দিয়ে রাখতে। আর হাসপাতাল-টাসপাতালগুলিতে—।'

সুহাসিনী চীৎকার করে বললেন, 'তোমরা কি আমাকে পাগল করে ছাড়বে? হাসপাতালের কথা এর মধ্যে আসে কিসে?'

মনোমোহন বললেন, 'বলা যায় না। গড্ ফরবিড, যদি কোন বিপদ-আপদ হয়ই, লোকে তো ওইসব জায়গাতেই আগে খোঁজখবর নেয়।'

সুহাসিনী ফের চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমাদের জ্বালায় কি আমি মাথা খুঁড়ে মরব? নিজে আমি নিজের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি। সেই তখন

থেকে ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি। আমার মন কী যে বলছে আর না বলছে তা আমার অন্তর্যামীই জানেন। তারপর প্রত্যেকের মুখে অকথা আর কুকথা, অকথা আর কুকথা। আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না তোমরা, সবাই মিলে কি সেই ষড়যন্ত্র করেছ?'

তিনি আর না দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। বোধ হয় গিয়ে কাঁদতে শুরু করবেন।

বিপদের আশঙ্কটা সংক্রামক। মানসী বেশ বুঝতে পারছে, তার সমস্ত যুক্তি বুদ্ধি ছাপিয়ে বাবা-মা'র ভয়ার্ততা সবার মনে কালো ছায়া ফেলেছে। অন্ধ ভয়, অন্ধ স্নেহ, অন্ধ কামনা-বাসনা। মানুষের দুটি চোখ তো আসলে চোখ নয়, চোখের ছলনা মাত্র।

মানসী আর থাকতে না পেরে বলল, 'দিদি, চল, আমরা আর একবার এগিয়ে দেখে আসি।'

মাধুরী বলল, 'চল।'

কিন্তু দুজনে বেরোতে না বেরোতেই দেখল, রাস্তার ওদিক থেকে মঞ্জু প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে।

ও যে কখন বেরিয়ে গিয়েছিল, বাবার কথা শুনতে শুনতে মানসী লক্ষ্য করেনি।

মানসী মাধুরী দুজনে প্রায় এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে মঞ্জু?'

মঞ্জু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সেজদি, ছোড়দা এসেছে।'

মানসী বলল, 'এসেছে? কোথায়?'

মঞ্জু বলল, 'ওর যে বন্ধু বীরুদা, গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে ফিসফিস করে কী যেন কথা বলছে। আমি দেখতে পেয়ে ছুটে চলে এসেছি। ওরা একসঙ্গে বাসটা থেকে নামল সেজদি।'

মানসী সম্রাজ্ঞীর মত হুকুম দিল, 'নিয়ে আয়, ওর কান ধরে হিড হিড় করে টেনে নিয়ে আয়।'

কান ধরে আনতে হল না, নন্দু আস্তে আস্তে নিজেই এসে হাজির হল।

ঘরে এসে ঢুকবার পর সবাই একমুহূর্ত গম্ভীর হয়ে রইল। যেন কিছুই হয়নি, নন্দু তেমনি ভঙ্গিতে কারো দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, সুহাসিনীই তাকে বাধা দিলেন, 'দাঁড়া, কোথায় যাচ্ছিস?'

নন্দু শান্তভাবে বলল, 'ঘরে।'

সুহাসিনীই বললেন, 'তোর আবার ঘর কিসের রে? তোর কি ঘর বলে কিছু আছে নাকি, ঘরের কারো জন্যে কোন চিন্তা তুই করিস? সারা বাড়িসুদ্ধ লোক তোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। কী দুশ্চিন্তায়, কী দুর্ভাবনায় যে কেটেছে—'

নন্দু বলল, 'দুশ্চিন্তার কী আছে।'

মনোমোহন তেড়ে এগিয়ে গেলেন, 'হতভাগা, গাধা, শুয়োর। দুশ্চিন্তার কী আছে! দুশ্চিন্তার কী আছে তা তুই কী করে বুঝবি রে উল্লুক?'

মানসী তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, 'যাক, বাবা যাক। এখন আর ওসব কিছু বলে লাভ নেই।'

মনোমোহন বললেন, 'লাভ নেই মানে? এত টাইম আর এনার্জি যে আমার নষ্ট হল তার দাম দেবে কে? আর উদ্বেগ! উঃ, হতভাগা এই কয়েক ঘণ্টায় আমার দশ বছরের আয়ু কমিয়ে দিয়েছে।'

নন্দু মা'র দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'অত উদ্বেগের কী হয়েছে? তোমরা কি ভেবেছিলে আমি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাব, না সুইসাইড করব?'

বাবাকে থামিয়েছিল মানসী, কিন্তু মাকে পারল না। তিনি ধাঁ করে নন্দুর গালে এক চড় বসিয়ে দিলেন, 'ফের চোপা? ফের মুখে মুখে তর্ক? লজ্জা করে না হতভাগা? তোর লজ্জা করে না? সুইসাইড করবে! তাতেও ক্ষমতার দরকার হয়, সাহসের দরকার হয়। তা করলে তো বাঁচতাম, আমার হাড় জুড়োত। আমি চিরশান্তি পেতাম।'

নন্দু আর কোন প্রতিবাদ করল না, গালে হাত বুলাতে বুলাতে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মানসী নিজের মনে হাসল। এতক্ষণ মা'র ভাবনা ছিল, পাছে নন্দু অঘটন কিছু ঘটায়। ও নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসবার পর এখন বলছেন, তেমন কিছু ঘটলেই উনি রক্ষা পেতেন। যাক, বাঁচা গেছে। ভালোয় ভালোয় ও যে ফিরে এসেছে সেই ভালো। মানসী কারো কাছে প্রকাশ করেনি, কিন্তু তার মনেও কুডাক ডাকার অন্ত ছিল না। সেই আদিম ভয় আর আদিম সংস্কার মনের চোদ্দ আনি জুড়ে আছে। বুদ্ধির আলো সেখানে জোনাকির আলোর মত ক্ষণিক আর ক্ষীণপ্রভ।

মানসী ঘরে এসে দেখল, মায়া, মঞ্জু, মাধুরী সবাই নন্দুকে ততক্ষণে ঘিরে ধরেছে। এতক্ষণ ও কোথায় ছিল তা জানবার জন্যে মানসীও কৌতূহল বোধ করল।

মাধুরী জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি করে বলতো, সারাদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলি তুই?'

নন্দু জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'বাঃ, লুকোব কেন। সোদপুর গিয়েছিলাম। সেখানকার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে আমি একটা অ্যাপ্রেনটিস সিপ পেয়ে যাব মেজদি। বীরুর মামা সেখানে সুপারভাইজার। তিনিই সব ঠিক করে দেবেন। সেইজন্যেই বীরুকে নিয়ে গেলাম। মামার জোর ছাড়া আজকাল তো কোন কাজ হয় না। পড়া একেবারে ছেড়ে দেব না।

নাইট-ক্লাসে ভর্তি হবার একটা চান্স নেব। কিন্তু তোমাদের খরচে আর নয়, তোমাদের কারো কাছে আর হাত পাতব না। তোমাদের পয়সা যথেষ্ট নষ্ট করেছি সেজদি, আর নয়।'

মানসী হেসে বলল, 'হয়েছে। আর বীরত্ব ফলাতে হবে না তোর। এবার কিছু খাবি তো খা গিয়ে।'

নন্দু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'অসীমদা কোথায়? তিনি কি চলে গেছেন নাকি?'

নন্দু প্রথমে মানসী, তারপরে মাধুরীর দিকে তাকাল। মাধুরী কোন জবাব দিল না। মানসীও চুপ করে রইল। সেই অবাঞ্ছিত অতিথির কথা আর কেন? এই পারিবারিক পুনর্মিলনে তার তো আর কোন প্রয়োজন নেই।

সুহাসিনী বললেন, 'চলে যাবে কেন। সে বোধহয় সারা শহর তোকে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

নন্দু এবার হেসে বলল, 'বাঃ, নিজেরা কিছু করতে না পেরে তোমরা আমার পিছনে পুলিস লাগিয়ে দিয়েছ নাকি মেজদি। কী মজা, কাল আমরা অসীমদাকে খুঁজেছি। আর অসীমদা আজ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এ যেন সেই চোর চোর খেলা। তাই নয় মেজদি?'

মানসী লক্ষ্য করল, কালকের প্রসঙ্গ ওঠায় মাধুরী ফের মুখ নামিয়ে নিয়েছে।

সুহাসিনী ছেলেকে ধমক দিলেন, 'থাক, আর বাহাদুরি করতে হবে না। এবার আয়, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাবি তো খেয়ে নে।'

নন্দু মা'র কথার জবাব না দিয়ে মানসীর দিকে তাকাল, 'কিন্তু আমি নিজে ধরা না দিলে আমাকে খুঁজে বের করা অত সহজ নয় সেজদি। অসীমদা তো অসীমদা. স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেরও সাধ্য ছিল না—।'

সুহাসিনী বললেন, 'আঃ। ফের বকবক করছিস?'

নন্দু বলল, 'তুমি যাও মা। আমি কিচ্ছু খাব না।'

সুহাসিনী বললেন, 'না, খাবেন না! তুই খাবি না তো তোর ঘাড়ে খাবে। খুব কীর্তি করেছ. আর মান-অভিমানের দরকার নেই। এবার দুটো গিলে আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে এসো।'

চটি জুতোর শব্দ করতে করতে মনোমোহন এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মারধোর তো যথেষ্টই করেছ। এবার একটু ভালোমুখে কথা বলে হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে যাও। আরে আজ ওর দুঃখই কি কম হয়েছে? আমি কি তা বুঝিনে? খুবই বুঝি। বুঝব না কেন। আমি নিজেও যে ওই ফেল-করাদের দলে। দু-দুবার চেষ্টা করেও আই. এ.-র

চৌকাঠ ডিঙাতে পারিনি। হতভাগা আমি আজ তিন বারের বার ফেল করলাম। একপুরুষে নয়, দুপুরুষ ধরে ফেল করে চলেছি। আরো ক পুরুষ করব কে জানে।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ডলতে ডলতে মনোমোহন সরে গেলেন। কিন্তু একখানি হাত আর একটি চোখ মানসীর চোখের সামনে যেন অনেকক্ষণ ধরে ভাসতে লাগল। ঘরে সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল। একটু বাদে ফের সুহাসিনী বললেন, 'আয়, খাবি আয়।'

নন্দু মায়া মঞ্জুকে একসঙ্গে বসিয়ে দিলেন সুহাসিনী। মিনু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে ডেকে তুলে খাওয়ালেন।

তারপর মনোমোহনের কাছে গিয়ে শান্ত-স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'এসো, দুই মেয়েকে নিয়ে তুমিও এবার বসো এসে।'

মনোমোহন বললেন, 'কিন্তু অসীম যে এখনো এল না।'

সুহাসিনী বললেন, 'সে বোধহয় আর আসবে না। রাত এগারটা হল। হয়তো কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে গেছে। আর যদি এসেই পড়ে, তার ভাত তো বাড়াই থাকবে—।'

মনোমোহন বললেন, 'তাহলে দিয়ে দাও।'

বাবা-মা'র কথাবার্তা সবই কানে গেল মানসীর। কিন্তু ডাকাডাকি সত্ত্বেও সে খেতে গেল না।

মাধুরীও বলতে লাগল, সে খাবে না, তার ক্ষিদে নেই।

মানসী বলল, 'আমারও ক্ষিদে নেই মা। আমারও কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

সুহাসিনী রাগ করে বললেন, 'ক্ষিদে না থাকবার কী হয়েছে? কী খেয়েছিস তোরা যে ক্ষিদে নেই।'

মানসী মনে মনে বলল, 'বিষ খেয়েছি মা। সুধা মনে করে বিষ খেয়েছি। তাতে ক্ষিদে মরে গেছে, প্রাণ মরে গেছে। পৃথিবীতে কিছুই আর বেঁচে নেই।'

কিন্তু মা কিছুতেই ছাড়লেন না। বাবার পাশে তাকে আর দিদিকে জোর করে বসিয়ে দিলেন। মানসী কোনরকমে দুটি মুখে দিয়ে উঠে এল। বেশ বুঝতে পারল, বাবা ভুলে গেলেও মা ভোলেননি। তিনি অসীমকে ক্ষমা করেননি। অতিথির জন্যে আজ আর তাঁর মনে কোন দাক্ষিণ্য নেই। এই তিন দিন ধরে একজনকে ঘিরে কতজনের মনের কত পরিবর্তনই না হল।

মাধুরী বলল, 'মা, তুমিও খেয়ে নাও। সে বোধহয় আর আসবে না।'

সুহাসিনী বললেন, 'আসবে না, তার বাক্স-বিছানা পড়ে রয়েছে যে!'

মানসী বুঝতে পারল, মা অমনি ধরে নিয়েছেন সে কোনদিনই আসবে না। নাও আসতে পারে। বাক্স-বিছানা রয়ে গেছে তো কী হয়েছে? তার

দাম কি এতই বেশি? আর মানসী-মাধুরী? তারা বোধ হয় এখন বাক্স-বিছানার চেয়েও তুচ্ছ। ভীরু কাপুরুষ! না পালিয়ে গিয়ে তার কি আর উপায় ছিল?

কিন্তু দিদি কি করে জানল যে, সে আর আসবে না? তাকে কি তাহলে গোপনে বলে গেছে? যেতেও পারে। মানসীকে বলে যেতে সাহস পায়নি। চিঠি লিখে গেছে। এতক্ষণে সেই চিঠির কথা ফের মনে পড়ল মানসীর। দেখা যাক কী লিখেছে চিঠিতে। কোন্ অজুহাত, কোন্ কৈফিয়ত দিয়েছে।

স্যুটকেশ খুলে মানসী চিঠিখানা বের করে আনল।

ঘরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মাধুরী একখানা নভেল পড়বার ভান করে বই নিয়ে কাত হয়ে রয়েছে। মানসী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জানলার ধারে এসে চিঠিখানা খুলে ফেলল।

মানসী,

চিঠি লেখার দূরত্বে তুমি নেই, তবু নিজের কথা বলবার জন্যে আজও চিঠিরই শরণ নিয়েছি। ভেবেছিলাম, তোমার কাছে বসে, তোমাকে কাছে বসিয়ে মুখেই সব কথা বলব; মুখে বলবার সুবিধে এই, সব কিছুই ভাষায় বলতে হয় না। মুখে বলবার সুবিধে এই, সব কথা নিজের মুখে না বললেও চলে। আর-একজনের জিজ্ঞাসার মধ্যে নিজের জবাবটিকে অর্ধোচ্চারিত, এমনকি অনুচ্চারিত ভাবে ছেড়ে দেওয়া যায়। দুর্বোধ, আয়ত্তের অতীত নিজের মনকে আর-একজনের অনুমান আর অনুভবের আশ্রয়ে রেখে চুপ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা চলে। কিন্তু চিঠি তো তা নয়। চিঠি স্টেজের উপরে দাঁড়িয়ে একটানা স্বগতোক্তি। তবে হল-ভরা দর্শকদলের কাছে নয়, শুধু একজনের কাছে। চিঠিতে অসুবিধে অনেক। শুধু কয়েকটি শব্দ যা প্রকাশ করবে তার ওপরই ভরসা। কয়েকটি অক্ষরের মধ্যে নিজেকে ধরে দেওয়ার জাদু যাঁরা জানেন তাঁদের কোন ভয় নেই। কিন্তু যারা তা জানে না তাদের পদে পদে সংশয়, ঠিক কথাটিকে কি বলতে পেরেছি, না পারিনি, যা বলতে চেয়েছি তা কি বলা হল, না হল না। তাই চিঠি স্বগতোক্তি হলেও আর-একজনের কানে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে সে যে সব সময় উৎকর্ণ হয়ে থাকে না তা জানি, তবু কথাগুলি তার কানে পৌঁছল কিনা তা না জানা পর্যন্ত মনে শান্তি নেই। শুধু কানই যদি লক্ষ্য হতো তাহলে কথা ছিল না। আমার কথাগুলিকে তার কর্ণমূলে আভরণ করে নিতাম। কিন্তু পৌঁছাবার শক্তি থাকুক আর না থাকুক, লক্ষ্য যে আরো দূরে, লক্ষ্য যে সেই মর্মমূল পর্যন্ত।

তুমি বিরক্ত হচ্ছ মানসী, তা জানি। আমার এসব কথা তোমার কাছে

আজ হয়তো শুধু বাগবিস্তার বলেই মনে হচ্ছে। কেন এত কথা লিখছি- একটি কথা বলবার জন্যে, না একটি কথা লুকোবার জন্যে, তা আমি নিজে জানিনে।

লুকোন খুবই সহজ ছিল। মাধুরীকে বলে দিলেই হতো—কিছু বল না। নিজের মনকে চোখ ঠারলেই হতো, কিছু বলে দরকার কি। কিন্তু আমি সে পথ নিইনি মানসী। আমি জানি, তোমার কাছে লুকোলেও নিজের কাছে লুকোতে পারব না। নিজের হাতে ধরা আমাকে দিতেই হবে। আর সে হাত সবচেয়ে শক্ত হাত। সে হাতে না ধরা দিলেও, শাস্তি না দিলেও রেহাই নেই

আমার সবচেয়ে বড় শত্রু কে জানো? আমি নিজে। আমার অখণ্ড সত্তাকে আমি নিজেই দুখণ্ডে কেটেছি। তারা নিত্য কাটাকাটি করে মরে। এক অর্ধ যা গড়ে তোলে, আর-এক অর্ধ তা টুকরো টুকরো করে ভাঙে। আমি সেই চূর্ণিত-বিচূর্ণিত আশা আর বাসনা, স্বপ্ন আর সংকল্পের স্তূপ। নিজের সেই রূপ, নিজের সেই ধ্বংসাবশেষ আমি রোজ দেখি আর রোজ শিউরে উঠি। বিলাসে আমার এক অর্ধের বিলাস, আর-এক অর্ধের আর্তনাদ সেই কান্না আমি রোজ কান পেতে শুনি।

নিজের পরম শত্রু যেমন আমি নিজে, সেই শত্রুর শাস্তাও আমি স্বয়ং তাঁর হাতে কেবল একই দণ্ড আছে—মৃত্যুদণ্ড। সে দণ্ড পলে পলে চলে তাই অতি প্রিয়জনের নিন্দা তিরস্কারও আমার কাছে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'র মত অসহ্য হয়ে ওঠে।

মানসী, আমি জানি, আমি তোমার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি। নিজের প্রত্যাশার কাছেই কি পৌঁছতে পেরেছি? তাই আমি যা কিছু লিখতে যাই আমার কলম থেকে বার বার একই কথা বেরিয়ে আসে—এক অচরিতার্থের চরিতকথা।

কোন্ কাজের জন্যে আমি এসেছি, কী কাজ আমি পারি, মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করি। চেষ্টা সামান্যই সফল হয়। যে স্বপ্ন দেখে, তাকে যেন ইট-কাঠ-পাথরে ভরা নিরেট বস্তু-জগতে টেনে এনে হাতে হাতুড়ি গুঁজে দিয়ে বলা হল, কাজ করো, কাজ করো, কাজ করো। যার ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন, ঘুমের পরে কাজ, তার শক্তিকে ঈর্ষা করি। কিন্তু যার নিদ্রা আর জাগরণ দুই-ই স্বপ্নে আচ্ছন্ন, তার দুর্ভাগ্য কে নেবে?

মানসী, এই পৃথিবীতে স্বপ্ন-দর্শকেরও জায়গা আছে। সে জায়গা যথেষ্ট প্রশস্ত। কিন্তু সেই সম্মান, সেই প্রশস্তি কার জন্যে জানো? সে শুধু সাধারণ দর্শক নয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শকও—যে শুধু দেখে না, দেখাতে চায় দেখাতে জানে। দ্রষ্টার সেই স্বপ্ন পাথর ফেটে বেরোয়, রেখায় রঙে ফোটে স্বর থেকে স্বরে, অক্ষরে অক্ষরে নির্ঝর হয়ে ঝরে। তার স্বপ্ন নিয়ে কারো

অভিযোগ নেই। কারণ, সেই স্বপ্নের সঙ্গে সারা পৃথিবীতে সংযোগ। কিন্তু এই রূপ-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হওয়ার বেশি যে আর কিছু হতে জানে না, করতে জানে না, তার লোনা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর উপায় কি? সে যদি রূপ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যায় তা সঙ্গে সঙ্গে শুকোবে। রূপের সঙ্গে শুধু দৃষ্টির সম্পর্ক নয়, রূপের সঙ্গে সৃষ্টিরও সম্পর্ক।

কিন্তু আমি মূর্তিমান অনাসৃষ্টি। আমার কৃতকর্মের জন্যে যতটুকু অনুতাপ, তার চেয়ে ঢের বেশি অনুশোচনা পর্বতপ্রমাণ অকৃতকর্মের জন্যে। শুধু প্রবল কর্মস্রোত সেই অচল মূঢ়তার অবসন্নতার পাহাড়কে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর আমার ধারণা, সত্য কিনা জানিনে, প্রেমস্রোতেরও সেই সাধ্য আছে। অসাধ্য সাধনের সেও এক স্রোতস্বতী। দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে কখনো তার প্লাবনের প্রলয়লীলা, কখনো সে অন্তরালে নিভৃত অন্তঃপুরে অন্তঃশীলা।

সেই স্রোতস্বিনীকে তো আমি দেখেছিলাম। অনুভব করেছিলাম তার শক্তি। তার ধারা ক্ষীণ হল কেন? এই প্রশ্ন বার বার আমার মনকে পীড়া দিয়েছে। তবে কি আমার নৈষ্কর্মের শিলাস্তূপ, অসার্থকতার পাহাড় এমনই অচল অনড় অটুট দৃঢ়মূল, যা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাঙে না, ক্ষয় পায় না, ভেসে যায় না? আমি তোমার দোষ দিইনে মানসী, দোষ আমারই।

তারপর আমার সেই পীড়িত ক্ষতবিক্ষত খণ্ডিত সত্তার কাছে আর-একটি ধারাকে আমি দেখলাম, অনুভব করলাম। মনে হল, তা ক্ষতকে ধুয়ে দেবে, ক্ষতিকে মেনে নেবে, দুটি ছলছল চোখে যে অপূর্ণ অসম্পূর্ণ, তারও পূর্ণতার আভাস প্রতিবিম্বিত হবে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার ভুল ভাঙল। একটি ধারাকে দুটি অশ্রু-ধারায় দেখতে পেলাম। আমার মনে হল, ক্ষতবিক্ষত লাঞ্ছিত হৃদয়ের সম্বল নিয়ে তার তীরে দাঁড়াবার তো আমার অধিকার নেই। একজনের কাছে আমি যদি শুধু জ্বালা জুড়োবার জন্যেই যাই, দুদিন বাদে সব জুড়িয়ে হিম হয়ে যাবে। তখন সেই হৈমবতীকে নিয়ে আমি কি করব? তার চেয়ে প্রজ্জ্বলন ভালো। জ্বলা আর জ্বালার মধ্যেই জীবন। সে জ্বালা যদি অনুশোচনার জ্বালাও হয় তাও শ্রেয়। অনুতাপের মধ্যে পূর্বজীবনের উত্তাপকেই অনুভব করি। তাপহীনতা আর প্রাণহীনতা একই বস্তুধর্ম। কিন্তু তাকে, সেই ধারাকে, যে আমার ক্ষতচিহ্নিত হৃদয়কে মুহূর্তের জন্যেও ধারণ করেছে, শুশ্রূষায় স্নিগ্ধ করেছে, যে আমার দাহকে মনে করেছে দীপ্তি, জ্বালায় দেখেছে উজ্জ্বলতার রূপ, তাকে অপমান করবার অধিকার তো আমার নেই। তোমার কাছে অস্বীকার করব না মানসী, একথা তাকে আমি বলেছি। সে মুখ নিচু করে জবাব দিয়েছে, 'এ তো শুধু মান-অপমানের কথা নয়।'

আর একটি কথা বললে কি তুমি বিশ্বাস করবে? সেই আনতমুখের পাশে আর একটি মুখের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। আমি অন্ধ নই মানসী। সেই মুখে চিত্রকল্প দুটি চোখও ক্ষণে ক্ষণে আমি প্রত্যক্ষ করছি তাতে বিদ্যুতের জ্বালা, আষাঢ়ের মেঘ, জন্ম-জন্মের স্মৃতি। আমি স্মৃতিভ্রংশ নই। শুধু স্মৃতি। মুহূর্তপূর্বের অনুভূতির স্বাদকেও যদি পূর্বস্মৃতি বলি, তাহলে এই অপূর্বজীবন শুধু পূর্বজীবনেই ভরা।

গ্রন্থি-বন্ধনের জন্যে এসেছিলাম। গ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে চললাম। কিন্তু এই ছেদ বাইরের। ভিতরে ভিতরে যে অসংখ্য গিঁট পড়ল তা কে ছিঁড়বে, কে খুলবে! সেই নৈপুণ্য শুধু সময়েরই আছে। সময়ের সেই কালো পর্দার আড়ালে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে চললাম। দীর্ঘ স্বগতোক্তির পর নট তার নেপথ্যলোকে নির্বাসিত হোক। সেখানে আলো নেই, মালা নেই, বেশ নেই, ভূষণ নেই, তাই বলে কি জ্বালার অভাব আছে? ইতি—

অসীম

চিঠিটা শেষ করে মানসী চুপ করে বসে রইল। সব মিলিয়ে কথাগুলির যেন কোন অর্থবোধ হল না। যেন এক পুঞ্জীভূত ধ্বনি আর পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্পাবেশ তাকে আচ্ছন্ন করে ধরেছে। শুধু শব্দ, শুধু শব্দ। অর্থহীন ধ্বনি, প্রেম, বাসনা, কামনা, প্রাপ্তি, বঞ্চনা সবই কি এই শব্দতরঙ্গ? অর্থহীন আর অর্থাতীত ন্যায়-নীতি যুক্তির বাঁধনমুক্ত ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি?

দ্বিতীয়বার চিঠিটা পড়তে চেষ্টা করল মানসী। তাতে বাক্যাংশ যেন আরো বিচ্ছিন্ন, শব্দগুলি অর্থের সঙ্গে আরো অসম্পৃক্ত হয়ে উঠল। হতাশ হয়ে চিঠিখানা ভাঁজ করে ফের খামের মধ্যে ভরে বালিশের তলায় রেখে হাত বাড়িয়ে বেড-সুইচটা অফ্ করতে যাচ্ছে—হঠাৎ শুনতে পেল—'কড়া নাড়ার শব্দ হল না?'

কড়া নাড়ার শব্দ নয়, মাধুরীর গলার শব্দই শুনতে পেল মানসী। ও যে জেগে আছে, এত কাছে আছে, তাই যেন মানসীর এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। এতক্ষণ মানসী যেন এক নির্জন দ্বীপের অধিবাসিনী হয়ে ছিল। সেই দ্বীপের চারদিকে তরঙ্গিত মহাসিন্ধু। বাসনায় বেদনায় বিক্ষুব্ধ।

'কিসের শব্দ বললি?' মানসী অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

মাধুরী বলল, 'কে যেন কড়া নাড়ছে। যা খুলে দিয়ে আয়।'

মানসীর মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল, 'না দিদি, আমি পারব না। আমার ভয় করছে।'

মাধুরী যে অবাক হয়েছে মানসী তা বুঝতে পারল; কিন্তু ছদ্ম বীরত্ব দিয়ে নিজের সেই দুর্বল ভীরুতাকে ঢাকতে চেষ্টা করল না।

মাধুরী মানসীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'কিসের ভয়? চোর? ডাকাত? না ভূত?'

মানসী কোন জবাব দিল না। দিদি কি জানে না, এই মুহূর্তে যাদের নাম ও করল এই মাঝরাত্রে তারা যদি কেউ আসে, কড়া নেড়ে আসে না? দিদি কি জানে না এই অন্ধকার রাত্রে সবচেয়ে যে বড় ভয়ঙ্কর সে দুঃসংবাদের দূত। দিদি কি জানে না সব সময় ভয়ের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই, অন্ধকারই তার আকার, তারই মত সে সর্বগ্রাসী।

মাধুরী বলল, 'আয় তাহলে দুজনে একসঙ্গে যাই।'

মানসী মনে মনে বলল, 'দিদি, তাহলে তোরও ভয় করছে? তোরও একা যেতে সাহস নেই? তুইও চাস একসঙ্গে যাই, সেই ভয়ের সমুদ্রে একসঙ্গে ঝাঁপ দিই, একসঙ্গে মরি?'

মাধুরীই গিয়ে ঘরের দরজা খুলল। মানসী এল পিছনে পিছনে। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের বেরোবার আগেই প্যাসেজের মধ্যে আলো জ্বলেছে। নন্দু উঠে গিয়ে সদরের দরজা খুলে দিয়েছে। ও কি আজ আর ঘুমোয়নি? ফেল করার দুঃখে সারারাত জেগে বসেছিল?

দরজা খুলে দিয়েই নন্দু বলে উঠল, 'অসীমদা!'

মানসী যেন কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। তারপর নন্দু যখন তাকে নিয়ে ভিতরে এল তখন চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না, আশ্চর্য, সে ফের এসেছে।

নন্দু বলল, 'আমি জানতাম আপনি ঠিক আসবেন।'

নন্দু কি শুধু একার কথা বলছে? মানসীও কি জানত? নিঃসংশয় ছিল?

কিন্তু মানসী ওদের দিকে তাকাল না। চোখ এড়িয়ে গেল। অনেক সময় না দেখে শুধু শুনতে ইচ্ছা করে। চোখের চেয়ে কানের ওপর নির্ভর করতে বেশি ভালো লাগে। চোখকে বড় ভয়, কী দেখতে কী দেখব। চোখকে বড় লজ্জা, সে যে ধরিয়ে দেয়, অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেয়, সত্তাকে অসহায় অনাবৃত করে রাখে।

আশ্চর্য, অমন করে বিদায় নিয়ে সে আবার ফিরে আসতে পেরেছে? কিন্তু কেন? কার জন্যে?

মাধুরীও মুখ বুজে আছে? নন্দুর ওপর কি তারও ভার? নন্দু কি দুজনেরই মোক্তার?

'কোথায় ছিলেন অসীমদা? কোথায় গিয়েছিলেন?'

অসীম একটু হাসল, 'তুমি যতদূর গিয়েছিলে, সেই সোদপুর পর্যন্ত।'

নন্দু যেন লাফিয়ে উঠল, 'বলছেন কি? কী করে টের পেলেন? নিশ্চয়ই কারো কাছে শুনেছেন? কার কাছে শুনেছেন বলুন?'

অসীম বলল, 'সে কথা কি বলা ঠিক? তুমি কি কারো কাছে ব...
বেরিয়েছিলে?'

নন্দ বলল, 'তবু বলুন, নাম বলুন। আমি সেই ট্রেইটরকে চিনে রাখি। বীরু ছাড়া আর দুজনে জানে। ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের জিতেশ আর তারাপদ। কে সেই বিশ্বাসঘাতক, আমাকে বলে দিন তো। ওরা বলেছিল, মরে গেলেও কথাটা ফাঁস করবে না।'

অসীম একটু হাসল, 'ফিরে যখন এসেছ, কথাটা ফাঁস হয়ে গেলে আর লজ্জা কিসের?'

নন্দ বলল, 'আপনি কি ভেবেছিলেন ফিরে আসব না?'

অসীম বলল, 'তা কেন ভাবব?'

নন্দ বলল 'তবে যে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন!'

অসীম বলল, 'শুধু কি তোমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম!'

এতক্ষণে সেই চিঠির অসীমের সঙ্গে এই রাত সাড়ে বারটায় ফিরে-আসা পরিশ্রান্ত অন্বেষক অসীমের মিল খুঁজে পেল মানসী। একটু আগে কোন সাদৃশ্য ছিল না। এই মুহূর্তে যে মানুষ গম্ভীর, পরমুহূর্তে সে তরল; এই মুহূর্তে যে বিষাদে মগ্ন, পরমুহূর্তে সে কৌতুকসায়রের সাঁতারু। মানুষ প্রতি মুহূর্তে অপূর্ব। অসীম লিখেছে, জীবন পূর্বজীবনে ভরা। এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে, মানুষের স্বভাবই হল তার পূর্বজীবনকে অস্বীকার করা। প্রতিটি মানুষ একই সঙ্গে সব তত্ত্বের বাদ আর প্রতিবাদ। সব সত্যের অঙ্গীকার আর অস্বীকার। এত উল্লাস এত আনন্দ কাকে দেখে অসীমের? শুধু কি নন্দুকে দেখতে পেয়ে? নাকি তার কোন দিদিকে? কোন্ দিদিকে?

নন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে ছাড়া আর কাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন অসীমদা?'

এই শক্ত প্রশ্নের জবাব অসীমকে আর দিতে হল না। তার আগেই মনোমোহন দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছেন।

'এই যে অসীম, এসো এসো। আমি দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারছিলাম না। কেবলি ভাবছিলাম, এক ছেলে তো এল, আর-এক ছেলে যে ফিরল না—। এই রাত্রে কোথায় কোথায় ঘুরছে। কিন্তু যে যাই বলুক অসীম, আমি ঠিক জানি তুমি আসবে। নন্দুর খবর না নিয়ে তুমি আজ রাত্রে অন্য কোথাও বাস করতে পারবে না। আমি মানুষ চিনি অসীম। দায়িত্বজ্ঞান কার আছে কার নেই, তা বড় বড় কাজ দিয়ে নয়, এইসব ছোট ছোট কাজেই টের পাওয়া যায়। প্রাণের টান আছে বলে তুমি এসেছ, দায়িত্বজ্ঞান আছে বলে তুমি সোদপুর পর্যন্ত ছুটেছ। কিন্তু কই, সেই বরানগরের হারামজাদা তো একবার এল না। তার তো নিজের ছোট ভাই। খবরটা তো

সেও পেয়েছে। কিন্তু কই। মায়া-মমতা তো নেই-ই, সাধারণ একটা Curiosity পর্যন্ত থাকতে নেই?'

সুহাসিনীও কিছুক্ষণ আগে উঠে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'থাক, এই রাতদুপুরের সময় তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। মুখ খুললেই মহাভারত এ আর সব সময় সহ্য হয় না বাপু। মানুষের সময় আছে অসময় আছে, মন আছে, মেজাজ আছে।—এসো অসীম, হাত-মুখ ধুয়ে এসো। তোমাকে খেতে দিই।'

অসীম বলল, 'না মাসীমা, এত রাত্রে আর কিছু খাব না। ক্ষিদেও নেই।'

মনোমোহন বললেন, 'না না অসীম। নিশা উপবাস মোটেই ভালো নয় অসীম। যা-হোক কিছু তোমাকে মুখে দুটি দিতেই হবে। ভাবতে আমার এত খারাপ লাগছে বাবা, তুমি আমার ছেলেকে খুঁজবার জন্যে সারা শহর টৈ টৈ করে বেড়াচ্ছ, আর আমরা সব দিব্যি খেয়ে—।'

খাওয়া-দাওয়ার কথায় মানসীও লজ্জিত হল। সত্যি, তারাও তো কেউ আর অপেক্ষা করে বসে নেই।

অসীম বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে মেসোমশাই।'

মনোমোহন বললেন, 'না বাবা, ত্রুটি হয়েছে বইকি, অবশ্যই ত্রুটি হয়েছে। এই যে আমাদের দিন-রাত্রির ছোটখাট আচার-আচরণ, চাল-চলন, এইসব দিয়েই তো আমরা আমাদের চরিত্র গড়ি, চরিত্র ভাঙি। সেই জমা-খরচ যোগ-বিয়োগের পর যা দাঁড়ায় আমরা শুধু সেইটুকু। তার চেয়ে একরত্তিও বেশি নই অসীম। ছোটকে ছোট বলবার আমাদের সাধ্য কি?—

"প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি ক্ষুদ্র অপরাধ
ক্রমে টানে পাপপথে, ঘটায় প্রমাদ;
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী
এ ধরায় স্বর্গসুখ নিত্য দেয় আনি।"

সুহাসিনী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা মাধুরী, তোরা কি এই শেষ রাত্রে কেবল হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পদ্য শুনবি? তাতেই কি সব কাজ হয়ে যাবে? রাত পোয়াতে না পোয়াতে ফের তো উঠতে হবে আমাকে? তোমাদের যজ্ঞশালা একদিনও তো আমাকে ছাড়া চলবে না।'

মাধুরী বলল, 'যাই মা।'

রান্নাঘর ছাড়া খাওয়ার আর জায়গা কোথায়। বিছানা পেতে সব জায়গাকেই এখন শোবার জায়গা করে নেওয়া হয়েছে।

রান্নাঘরের মধ্যেই একক অতিথিকে এখন খেতে দেওয়া হল। মানসীকে মা ডাকলেন না, সে খাওয়ার কাছে গেলও না। কিন্তু আশ্চর্য, মাধুরীকে

বার বার ডাকা সত্ত্বেও সে শুধু আসন পেতে ভরাজলের গ্লাসটি রেখে চলে এল। এসে দাঁড়াল জানলার সামনে। এ কি লজ্জা, না গোপন অনুরাগ? কই, অসীমের কাছে এত সঙ্কোচ তো মাধুরীর এর আগে ছিল না। নতুন সম্পর্কের রঙে রাতারাতি সব পালটে গেছে যে। চিরদিনের চেনা মানুষ হয়েছে অচিন দেশের রাজপুত্র।

রাজঅতিথিকে মা পরিবেশন করতে লাগলেন, বাবা সামনে বসে উপদেশ-অমৃতে তাকে আপ্যায়ন করতে লাগলেন। মানসী ওদিকে আর গেল না। নন্দু ফের মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ল। মানসী দূর থেকে লক্ষ্য করল, মাধুরী সেই যে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। আঁধারের মধ্যে জ্যোৎস্না-ধারা দেখতে পাচ্ছে নাকি। প্রথম প্রথম অমন দেখা যায়, তারপর জ্যোৎস্নাই রঙ বদলে বদলে আঁধার হয়ে ওঠে।

মুখ ধুয়ে আসবার পর মনোমোহন আর দাঁড়াতে দিলেন না অসীমকে। বললেন, 'আর রাত জেগে দরকার নেই অসীম। তোমার মাসীমা আবার ফের তাড়া লাগাবেন। খেতে শাসন শুতে শাসন। শাসনের আর শেষ নেই।'

অসীম বলল, 'হ্যাঁ, চলুন। আমাকেও তো কাল ভোরে উঠে গাড়ি ধরতে হবে।'

মানসীর মনে হল, নিজেকে নট বলে যে লিখেছিল অসীম, ঠিকই লিখেছিল। এমন সুপটু অভিনেতা আর নেই। এতবড় অঘটন ঘটিয়েও যেন কিছুই ঘটেনি এমনি বাধ্য বশংবদ ভালো ছেলের মত বাবার পিছনে পিছনে চলে যাচ্ছে। মানসীকে যেন ও চেনেই না, তার সঙ্গে পরিচয়টুকু পর্যন্ত যেন নেই। একখানি চিঠি লিখেই যেন সমস্ত কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। ভোর বেলায় উঠে পালিয়ে যেতে পারলে আর কে ওর নাগাল পায়!

অসীম ডাকল না, কিন্তু বাবা ডাকলেন, 'মানসী, অসীমের বিছানাটা একটু ঝেড়ে-টেড়ে দিয়ে যা তো, মশারিটা ফেলে দিয়ে যা।'

এসব কাজের জন্য আবার মানসীকে কেন। তাঁর সেবা-নিপুণা যে আর-এক মেয়ে আছে তাকে ডাকলেই হয়। সে-ই এসে সব করুক। সে-ই সব পারবে।

বাবা আর একবার তাড়া দিলেন, 'মানসী, আর রাত করিসনে মা।'

না গেলে আরো বেশি হাঁকডাক হবে। তাই মানসী ঘরে ঢুকে অসীমের বিছানাটা ঠিক করে দিতে লাগল। অসীম বলল, 'আমিই তো করে নিতে পারতাম।' মানসী সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বালিশের উলটে যাওয়া ফুলতোলা ঢাকনিটা ঠিক করে দিতে লাগল।

তার আগেই অসীম নিচে নেমে মনোমোহনের বিছানায় গিয়ে বসেছে। মনোমোহন বললেন, 'তুমি করবে কি অসীম! এসব মেয়েদের কাজ,

ওরা করে না দিলে কি আর চলে। এতখানি বয়স হল তবু ভালো করে মশারিটা টানিয়ে নিতে পারিনে। আমাদের এই পরাধীনতার সুযোগ নিয়েই তো, হে হে হে—।'

কথা শেষ না করে হাসতে লাগলেন মনোমোহন।

মাধুরী এসে ঘরে ঢুকল, 'বাবা।'

মানসী জানে, ঢুকবেই। ও কি আর এখন না এসে পারে। পান না সুপুরি, কোন্ অজুহাত হাতে করে নিয়ে এসেছে?

মাধুরী বলল, 'বাবা।'

মনোমোহন বললেন, 'কি রে। তুই শুতে যাসনি মাধুরী? আমি ভাবলাম, তুই বুঝি শুয়ে পড়েছিস, তাই মানসীকে ডাকলাম। কি রে মানসী, তোর মশারি টানানো হল?'

মানসী একথার কোন জবাব দিল না।

মাধুরী বলল, 'বাবা, একটা কথা তোমার কাছে বলব।'

মনোমোহন বললেন, 'বল না!'

মাধুরী বলল, 'সবাই এখন এক জায়গায় আছে, এখনই বলা সুবিধে। কাল আবার অসীমদা চলে যাবে।'

মনোমোহন একটু হেসে বললেন, 'যাবেই তো মা। কাজকর্ম রয়েছে সেখানে।'

মাধুরী বলল, 'কাল ভোরে তাড়াহুড়ো লেগে যাবে। কাল আর বলা হবে না। তাই আজই বলতে এসেছি।'

মনোমোহন বললেন, 'যা বলবি বল না। অত ভণিতা করছিস কেন।'

মাধুরী বলল, 'কথাটা অসীমদারই বলবার কথা ছিল বাবা। কিন্তু সংকোচে বলতে পারেনি।'

মানসী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হাতের দড়ি আর পেরেকে উঠল না। মনে মনে বলল, গলায় দড়ি। অসীমদা বলতে পারেনি তাই তুমি নিজের মুখে বলতে এসেছ। এত বড় বেহায়া না হলে কি আর—। ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়। একজনকে পাবার জন্যে তুমি সব ছেড়েছ।

মনোমোহন বললেন, 'আমার কাছে আবার সংকোচ কিসের। থাকগে, ব্যাপারটা কি?'

মাধুরী একটু হেসে বলল, 'ঘটনাটা এক বছর আগেই ঘটে গেছে বাবা। কিন্তু ওরা গোপন করে রেখেছিল। আমার কাছেও গোপন করেছিল। আমি এবার জানলাম। ওরা বিয়ে করেছে বাবা।'

মনোমোহন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী করেছে!'

মাধুরী বলল, 'রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে।'

অসীম বলল, 'এ তুমি কী বলছ মাধুরী!'

মানসীও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'দিদি, এ তুই কী বলছিস। না না না, কখনো তা হয়নি।'

মাধুরী হেসে বলল, 'ওরা এখন ভয়ে চেপে রাখতে চায় বাবা। স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু সবই যখন হয়ে গেছে, চেপে রাখা কি আর ভালো? তুমি বল।'

মনোমোহন এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে আবেগভরা গলায় বললেন 'আমাকে আর ভালো-মন্দের কথা জিজ্ঞেস করো না মা। আমার ভালোও নেই মন্দও নেই। আমার বিচারের সঙ্গে তোমাদের বিচারের কি কোনদিন মিল হয়েছে যে আজ হবে? ছি ছি ছি, আমাকে না জানিয়ে এমন কাজ যারা করতে পারে তারা তো আমাকে খুনও করে ফেলতে পারে মাধুরী।'

অসীম বাধা দিয়ে বলল, 'মেসোমশাই শুনুন। আপনি না জেনেশুনে ওর কথা বিশ্বাস করে—।'

মনোমোহন অসীমকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না, পরম ক্ষোভের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'বিশ্বাস করে আমি ঠকেছি অসীম, ভয়ঙ্কর ঠকেছি। বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। তুমিও তো রাজকর্মচারী।—ওগো শুনছ? —মাধুরী, তোর মা কি ঘুমিয়েছে না মরে আছে? তাকে একবার ডেকে দেতো। তার মেয়ের কীর্তি-কাহিনী এসে শুনুক।'

মাধুরী বলল, 'যাই বাবা। মাকে গিয়ে ডেকে দিই।'

মানসী প্রায় মাধুরীর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে বলল, 'দিদি, কেন তুই আমার নামে এমন করে মিথ্যে কথা বললি। বাবার কাছে এমন করে ছোট করে দিলি। তুই তো জানিস, সব মিথ্যে।'

মাধুরী বলল, 'ঠিক আগাগোড়া মিথ্যে নয়, আগাগোড়াই সত্যি। একটু মিথ্যের ছিটে কাল লেগেছিল, আর একটু ফোঁটা আজকে পড়ল। আসছে কাল কি পরশু ধুয়ে ফেলিস, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সুহাসিনী সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে আর জাগাল না মাধুরী। সেও ঘরে এসে লাইট নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

খানিকক্ষণ অন্ধকারে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মানসীও শুতে এল।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

মানসী ডাকল, 'দিদি!'

মাধুরী কোন সাড়া দিল না।

মানসী এবার আরো কাছে এগিয়ে এল, 'দিদি, ঘুমিয়েছিস?'

মাধুরী বলল, 'না।'

মানসী অস্ফুট আবেগরুদ্ধ গলায় বলল, 'এ তুই কী করলি বলতো।'

মাধুরী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মানসী, কাল রাত্রে ঠিক এই সময়ে তুই ঠিক এমন কথাই বলেছিলি,—দিদি তুই কী করলি, দিদি তুই কী করলি। তোর হয়তো মনে নেই, তুই হয়তো ঘুমের মধ্যে বলেছিলি। ঘুমের চেয়েও যা আরো বেশি অসহায় করে তোলে, সেই অসহ্য অতল ব্যথার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে বলেছিলি।'

মানসী বলল, 'কই, আমার তো মনে পড়ছে না।'

মাধুরী বলল, 'তাহলে হয়তো তোর মুখ থেকে কথাটা বেরোয়নি। আমার বুকের ভিতর থেকেই তা বেরিয়ে এসেছিল। একই কথা। প্রথমে ভেবেছিলাম, মরব।'

মানসী ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ছি দিদি। তুই এত—।'

সেণ্টিমেণ্টাল গালিটা আর মুখ থেকে বের করল না মানসী।

মাধুরী বলতে লাগল, 'কিন্তু দিনের আলোয় আবার আমার প্রাণের তৃষ্ণা জেগে উঠল। সব রকমের তৃষ্ণা। স্কুল করলাম, টিউশনি করলাম, সেই তৃষ্ণা আমার বুকের মধ্যে বসে রইল। সারাদিন তার সঙ্গে আমার যুদ্ধে যুদ্ধে কেটেছে। তারপর দেখলাম নন্দুকে। সে হেরেও হারল না, ফেল করেও তার বড়াই যায় না। দেখলাম বাবাকে। রোজই তো দেখি। কিন্তু আজ যেন সব অন্যরকম। নন্দুকে যতক্ষণ পাওয়া যায়নি, একটা পাতা পড়লেও মনে হয়েছে অশুভ লক্ষণ। নিজেকে যখন ফিরে পেলাম তখন সবকিছুর মধ্যে শুভ লক্ষণ, আশ্বাস আর সান্ত্বনা দেখতে পেলাম, মানসী। আমার কাছে সমস্ত জগৎটাই একটা সিম্বল হয়ে উঠল। তুই, নন্দু, বাবা, বাবার প্রতিটি কথা, পুরোন পদের প্রতিটি পংক্তি আমাকে একই কথা বলতে লাগল। কিন্তু আর নয় মানসী, রাত অনেক হল। এবার ঘুমো।'

মানসী বলল, 'কিন্তু দিদি, আমি যে হেরে গেলাম।'

মাধুরী বলল, 'আবার জিতলিও তো।'

ও হাসল কিনা মানসী অন্ধকারে তা বুঝতে পারল না। ও যে পাশ ফিরে শুয়েছে তা টের পেল।

কিন্তু এই কি জয়! না, এর মধ্যে জয়ের আনন্দ নেই, এ তো যুদ্ধ নয়, সন্ধি। নিজের প্রাপ্যকে আর-একজনের হাত থেকে দান হিসেবে গ্রহণ করা। হারানো বস্তুকে যে খুঁজে এনে দিল, ফিরিয়ে দিল, তার কাছে চিরকালের জন্যে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে হবে। জয়ের গৌরব কোথায় মানসীর?

অবশ্য ইচ্ছা করলে এই দয়ার দান সে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। ছিঁড়ে ফেলতে পারে মিথ্যার জাল। কিন্তু পারবে কি? নিজের ওপর সে ভরসা যেন আর রয় না। অসীম ঠিকই লিখেছে। একজন সংকল্প করে, আর-একজন তা টুকরো টুকরো করে ভাঙে। দুদিন ধরে এক অতি ক্ষুদ্র ঈর্ষা তাকে

মুহূর্তে মুহূর্তে নাচিয়েছে, কাঁদিয়েছে, আক্রোশ আর ক্ষোভের তরঙ্গ বালির ওপর আছড়ে আছড়ে ফেলেছে। অথচ কেন? কিসের জন্যে? অসীম কি কোনদিনই তার কাছে এত মূল্যবান, এত মহার্ঘ্য ছিল? আদর্শ পুরুষ তো ভালো, পুরুষের সম্মানই কি মানসী তাকে দিয়েছে? দেয়নি। তবু সেই অসীমের জন্যে মানসী কী দুঃসহ জ্বালাতেই না দগ্ধ হয়েছে। একটি কানাকড়িকে ছিনিয়ে নিয়ে ঠোঁটে ছুঁয়ে এক অসামান্য ইন্দ্রজালে মাধুরী যেন তাকে আর-এক রূপকথার স্পর্শমণি করে দিয়েছে। সেই মণি গলায় পরতে লজ্জা, আবার না পরলেও শান্তি নেই। না পরলেও মনে হয়, সব গেল, নিঃস্ব নিরাভরণা হয়ে রইলাম।

মানসী কি এই ইন্দ্রজাল দুহাতে ছিঁড়ে ফেলতে পারে না?

পারে না।

পারে না যে, তার প্রমাণ হয়ে গেছে। হঠাৎ মানসীর দুচোখ ফেটে জল এল। হারিয়েও কান্না, পেয়েও কান্না। দিয়েও কান্না, নিয়েও কান্না। তার পাশে শুয়ে আরো একজন যে নিঃশব্দে কাঁদছে তা কি আর মানসী টের পাচ্ছে না?

একবার ভাবল ওকে ডাকে। কিন্তু ডেকে কী হবে? কী বলবে? নতুন আর কী বলবার কথা আছে? কোন আশ্বাস? কোন সান্ত্বনা!

বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজল মানসী। মুখ গুঁজে ভাবতে লাগল। সে ভাবনার যেন ভাষা নেই, শেষ নেই।

তারপর আস্তে আস্তে তার চোখ দুটি কখন যে ঘুমে জড়িয়ে এল মানসী জানতেও পারল না। শুধু কার যেন একটি সস্নেহ আলিঙ্গন এক অস্পষ্ট মধুর অনুভবের মত তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রইল।